ভুবনচরার কালো প‍্যাঁচা

ভুবনচরার কালোপ্যাঁচা

হিমানীশ গোস্বামী

চৈতালী প্রকাশনী
৭, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ
২০শে আষাঢ় গুরু পূর্ণিমা—১৩৬১

প্রকাশক ঃ
শ্রী অজিত কুমার গুপ্ত
চৈতালী প্রকাশনী
৭নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলিকাতা—৭০০০০৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ
রাহুল মজুমদার

মুদ্রক ঃ
শিবশক্তি প্রেস
২৮/জি অবিনাশ ঘোষ লেন
কলিকাতা—৭০০০০৬

পরিবেশক ঃ
অন্নপূর্ণা প্রকাশনী
৩৬, কলেজ রো
কলিকাতা—৭০০০০৯

উৎসর্গ

সুধীর মৈত্র
বন্ধুবরেষু

এই লেখকের

লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায়
কিটু লাহিড়ীর তিন কীর্তি
গোয়েন্দা দে গোয়েন্দা দাঁ ইত্যাদি

১

কিট্রু লাহিড়ির মনে হল ভুল, ভুল করেছে সে। এই কিছুই না করাটা—এই জীবন-যাপন, একঘেয়ে প্রায় সবটাই। অলস জীবনের একটা মজা আছে ঠিকই। কিছুই না করার একটা আনন্দ আছে। দাবা খেলা, বই পড়া, একটু ছবি তোলা, বাবাকাকার সাহচর্য, মাঝে মাঝে আফজল আসে, দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে আকস্মিক দেখাসাক্ষাৎ, কথা। আফজল গণপ্রভাতের রিপোর্টার—তার কাছে রাজনীতির নানা কেচ্ছা কাহিনী শোনা। মানব সমাজের অধঃপতনের কাহিনী শুনে দুঃখ পাওয়া। আফজল যে দৃষ্টিতে জগৎকে দেখে জগৎ যদি তাই হয় তাহলে মনে হয় অন্ধকার, চারিদিকে অন্ধকার। দেশ ভেঙে পড়ছে, প্রতিষ্ঠান ভেঙে পড়ছে, আদর্শ ভেঙে পড়ছে, চরিত্র ভেঙে পড়ছে। তার নিজের অভিজ্ঞতাও তাকে বিমর্ষ করে তোলে। গোয়েন্দা হওয়ার মধ্যে সে ভেবেছিল একটা কিছু সে করতে পারবে, অপরাধী ধরে সে সমাজকে কিছুটা সুস্থ করে তুলবে। সে সমাজের সব সমাধান করতে পারবে না সে জানে। সে এও জানে কেউ তা করতে পারবে না। তবে শেষ পর্যন্ত কাউকেই তো তা করতে হবে। এই রকম অসংখ্য লোক চেষ্টা করলেই সমাজ একটু সুস্থ হবে স্বাভাবিক হবে। অসংখ্য লোক না থাকলে একা এ কাজ সম্ভব নয়, কিন্তু সম্ভব নয় বলে চেষ্টাও করব না, কিছুই করব না সেটাও তো বাঞ্ছনীয় নয়।

এটা ঠিক এই মনোভাব আজই কিট্রুর হয়েছে তা নয়। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরেই তার মনে হচ্ছে তার এই জীবন-যাপন অর্থহীন হয়ে পড়ছে। প্রতিদিন তাকে তার জীবন-ধারণের জন্য প্রায় কিছুই করতে হচ্ছে না। যে সমস্ত অপরাধী সে ধরেছে বা ধরতে সাহায্য করেছে তাতে পৃথিবীর বিন্দুমাত্র উপকার হয়েছে বলে মনে হয় না। সে জানে অনেক বড় বড় অপরাধী তার আশেপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে—তাদের গায়ে একটু হাতও দেওয়া যায় না। তার মনে হয়, এর চাইতে সে যদি কোথাও কেরানিও হত তাহলেও তার এই অদ্ভুত নিঃসঙ্গতা, কেমন একটা অপরাধবোধ এ সব কেটে যেত। আঠাশ বছর বয়স হল, অতঃপর কেরানিগিরিও হয়ত জুটবে না। বয়স বাধা হয়ে দাঁড়াবে। আবার তার মনে হয় একটা স্কুল-টিচার কিংবা হয়ত চেষ্টা করলে কোনও কলেজের অধ্যাপক হলেও সে হতে পারত। না, গোয়েন্দাগিরির কাজ তার ভাল লাগছে না। একটা কিছু, একটা অন্যরকম কিছু করতে ইচ্ছে করছে। অথচ সে এও জানে তা হবে না। তাকে কখনও না কখনও জড়িয়ে পড়তেই হবে কোনও অপরাধের কিনারা করতে। সে না করতে পারবে না। এ পর্যন্ত সে না করেওনি। তার মনটা দুর্বল বলেই সে না করতে পারে না।

তার এই বিষাদময় মনোভাবের সঙ্গে কাল থেকে অবিরাম যে ঝড়ো হাওয়া, বৃষ্টি এবং বজ্রের আওয়াজ চলছে তো চলছেই তার একটা বোধ হয় সম্পর্ক রয়েছে। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে রাস্তা হয়েছে প্লাবিত। জানালা দিয়ে দূরের রাস্তার

যতটুকু দেখা যায় তাতে দেখা যায় মানুষের দুরবস্থার এক করুণ চিত্র। বয়স্ক লোক, দুর্বল লোক—যাদের এই অবস্থাতেও বেরুতে হচ্ছে, তাদের দেখলে কষ্ট হয়। প্রায় কোমর পর্যন্ত জল এর মধ্যেই দাঁড়িয়ে গেছে। বৃষ্টি তো পড়ছেই, জল আরও বাড়বে। এই অঞ্চলটা অবশ্য একটু বেশি নিচু—এখানে সহজেই জল জমে। আর যত সহজে জল জমে তত সহজে জল সরে যায় না। কলকাতায় জল জমবেই। এ সব ব্যবস্থা নাকি ব্রিটিশেরা করে গিয়েছেন, এর আর কোনও উপায় নেই। যত দোষ শেষ পর্যন্ত জোব চার্নকেরই। ওই ভুলটা আর সংশোধন করা যাবে না।

এই জলে খবরের কাগজও দেয়নি। সকাল এখন দশটা বেজে গেছে। বাড়ির সামনে সুরসাথী-র জামাকাপড় ইস্তিরি করার চাকাওলা দোকানটি এখন জলের প্রায় তলায়। তার কাছেই একটা মুদির দোকান। সে দোকানের মধ্যে জল ঢুকে গেছে। নিচের সব জিনিসপত্র উপরের তাকে তুলবার কসরত করছে কয়েকজন। এরই মধ্যে একটা রিকশকে দেখা গেল কিট্টু লাহিড়ির বাড়ির দিকেই আসছে। কিট্টু ভাবল, ঝামেলা বাধাবে মনে হচ্ছে। সিরিয়াস কেস কিছু। যদি তার কাছে আসে তাহলে ভারি বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে। সে ডাকল বাঘাকাকা, দ্যাখো কাণ্ড!

বাঘাকাকা এলেন। দেখলেন। তারপর বললেন, নিশ্চয় টেলিফোনটা গেছে।

কিট্টু তাড়াতাড়ি টেলিফোন রিসিভারটা তুলে বলল, ডেড!

বাঘাকাকা বললেন, অন্তত দেড় মাস।

—দেড় মাস, মানে?

—মানে এটা এখন দেড় মাস অন্তত মরে থাকবে। বৃষ্টি এলে টেলিফোন-ওলারা ভারি খুসি হয়। বৃষ্টি পড়ছে, জল জমেছে, বাস্ টেলিফোন তো খারাপ হবেই।

কিট্টু বলল, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত সেই জোব চার্নক?

দরজায় ধাক্কা। কিট্টুর বুঝতে বিলম্ব হল না যে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ। বাঘাকাকা নিচে নেমে গেলেন। কিট্টু উপর থেকে দেখতে পেল সুপ্রিয়া পিসি। যাক্ বাবা খুব বাঁচা গেল। সুপ্রিয়া পিসি এই রকম করেন। বৃষ্টি হলে তাঁর মাঝে মাঝে অ্যাডভেঞ্চারের ঝোঁক চাপে। এর আগেও কয়েকবার এসেছেন। বিষ্টি হলে তাঁর মনে হয় ভাইয়ের ছেলেটির বোধহয় এই দুর্যোগে খাবার-টাবার জুটবে না। খাবার নিয়ে আসেন। কখনও ডিমের তরকারি, কখনও ডাল বড়া, আর সঙ্গে গাদাখানেক রুটি বা পরোটা।

কিন্তু এবারে নিশ্চয় অন্য ব্যাপার। কিট্টু বেশ বুঝতে পারল ব্যাপারটা কিছু মারাত্মকই হবে, কেননা সুপ্রিয়া পিসি এক কথায় রিকশওলা যা ভাড়া চায় কখনই দেন না। অনেক দরদস্তুর করেন। বেশি কমাতে পারেন না, তবু প্রবল বৃষ্টির দিনে পনের টাকা কুড়ি টাকা চাইলে তিনি দু এক টাকা কমিয়েই বেশ আনন্দ পান। একবার তো একটা পুরো আধুলিই কমিয়েছিলেন দশ টাকা থেকে। সুপ্রিয়া পিসির মনটা আজ নিশ্চয় কিছু গুরুতর চিন্তায় আচ্ছন্ন।

সুপ্রিয়া পিসি দুম দুম করে উপরে উঠে এলেন। একটা টিফিন ক্যারিয়ার রাখলেন টেবিলের উপর। বললেন, কিমার মোগলাই তরকারি। আর পরোটা কুড়িখানা। তারপরই বললেন উল্লুকটা আমাকে জ্বালিয়ে মারল। কাল থেকে ফেরেনি।

এই উল্লুকটা যে মিহির সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অবশ্য মিহিরের পক্ষে এমন কর্ম নতুন কিছু নয়। মিহির হচ্ছে কিট্টু লাহিড়ির পিসতুতো ভাই। সুপ্রিয়া পিসির ছোট ছেলে। সুপ্রিয়া পিসি বলেন, ওটা মানুষ হল না, কবি হয়ে গেছে।

তা কবি সে হয়ে না গেলেও কবি হওয়ার অনেক রকম চেষ্টা করেছে। বড় বড় চুল রেখেছে, দাড়ি রেখেছে, নানারকম নেশা করেছে, ফুটপাথে শুয়ে থেকেছে, কবি সম্মেলন করেছে, বইমেলায় 'আপনারা সব ঘুমোবেন না, আগুনে কবিতা পড়ুন', এমন সব আশ্চর্য পোস্টার গলায় আর পিঠে ঝুলিয়ে কবিতা আন্দোলন করেছে, এমনকি সে কবিতাও লিখেছে কয়েক ডজন।

—বসুন সুপ্রিয়া পিসি, বসুন। কিট্টু বলল, মিহির কাল থেকে ফেরেনি? কোথায় গেছে?

—তুই তো ভারি গোয়েন্দা রে। সুপ্রিয়া পিসি বললেন, সেটা জানলে আমি এই বৃষ্টিতে তোর কাছে আসব কেন? উল্লুকটা কোথায় গেছে সেটাই তো খোঁজা দরকার।

—কিট্টু বলল, কোথায় যেতে পারে বলে মনে হয়?

দু-তিনটে জায়গায় যাবে বলে কাল সকালে বেরিয়েছে। তখন আকাশে কালো মেঘ জমছে, হাওয়া শুরু হয়েছে। বললাম, আজ বাড়ি থেকে বেরুসনে। শুনে সে একটা কথা বলল না। পোশাক-টোশাক পরে বলল, কুড়িটা টাকা দাও তো মা। ভেবে দ্যাখ, ওর এই বয়সে হাত খরচের জন্য টাকা চাইতে একটুও লজ্জা করে না? একটা কিছু করল না। কবি হবেন, রবি ঠাকুর হবেন, নোবেল পুরস্কার পাবেন। আরে কবিতা লেখা সোজা হলেও কবি হওয়া সোজা নয়। আর হয়ওনি, হয়েছে একটা উল্লুক। তা আমি বললাম কোথায় যাচ্ছিস? তা ও বলে কি না তিনটে জায়গায়। বলল তার একটা কবিতা নাকি উজবুগস্তানের একটা কবিতার কাগজে ছাপা হবে। তার কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করে এক বছর আগে পাঠিয়েছিল, ওরা নাকি কিছু টাকাও দেবে। শয়তান সব লোক। উজবুগস্তানের লোক কবিতার বোঝেটা কি? এদিকে উল্লুকটার ল্যাজ ফুলে কলাগাছ হয়ে গেল না? যখন সকলের উচিত ওকে উৎসাহ না দেওয়া তখন ওকে এই রকম উৎসাহ দিয়েই তো ওর বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। এদিকে শক্তি চট্টোপাধ্যায় লোকটাও সুবিধের নন।

কিট্টু হাসল। বলল, কেন পিসি?

সুপ্রিয়া পিসি বললেন, উনি নাকি উল্লুকটার কবিতা পড়ে বলেছেন হবে। আরে হবেটা কি? কি হবে আমি জানি না? ওর বাবার এক বন্ধু তাঁর নাগপুরের অফিসের জন্য একজন অফিসার চাইছিলেন। বাড়িতে এসে বললেন

ঐ চাকরির কথা। আড়াই হাজার থেকে শুরু, তা ছাড়া একটা এক ঘরওলা ফ্ল্যাট ফ্রি। আরও কি-সব সুবিধে টুবিধে দেবে। তা উল্লুকটা বলে কি না, সে কলকাতা ছেড়ে যাবে না, আর রুটিন মতো কোনও কাজ করবে না। এই তো হওয়ার নমুনা। কত লোক কাজ চেয়ে চেয়ে পায় না, আর বাড়িতে এসে কাজ দিতে চাইলেন ভদ্রলোক, তাও নিল না।

কিট্টু বলল, ঐ চাকরিটা আমি পেতে পারি ?

সুপ্রিয়া পিসি কথাটা শুনতেই পেলেন না। তিনি বলে চললেন, এখন ও কোথায় গিয়ে জাবর কাটছে কে জানে। দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুম হয়নি আমার। তা তোর পিসেকে বলাতে উনি বললেন, নো নিউজ ইজ গুড নিউজ। বোঝ ব্যাপারখানা। আমি কি পাগলা গারদে আছি নাকি ? নাকি সব এক একজন দার্শনিক হয়ে আমাকে উদ্ধার করছেন ? উজবুগরাও কি রকম বেআক্কেলে, আচ্ছা দরকার কি একটা কচি ছেলের মাথা খাবার ?

—উজবুগ নয় সুপ্রিয়া পিসি। উজবেক। উজবেকিস্তানের লোক।

সুপ্রিয়া পিসি এ কথারও পাত্তা না দিয়ে বললেন, এখন কি করি বল তো কিট্টু। কিছু একটা করা দরকার।

কিট্টু প্রশ্ন করল, কোথায় কোথায় যাবে বলেছিল মিহির ?

—তা জানলে কি আর তোর কাছে আসি এই জল ঠেলে ? কোথায় লিট্‌ল ম্যাগাজিন বেরুবে, প্রেসের সঙ্গে গোলমাল চলছে, ওর নাকি দুটো অমূল্য রচনা সমেত চোদ্দ পাতা ম্যাটার হারিয়ে ফেলেছে প্রেস। সেখানে কয়েকদিন গেছে, সেখানেও যেতে পারে। তাছাড়া বেহালায় তার এক বন্ধু ভূতেশ ড্রাগের নেশায় বেহুঁশ হয়ে দুদিন পড়ে আছে, তাকেও দেখতে যেতে পারে। ওদিকে বারাসত লাইনের কোথায় একটা কবি সম্মেলন হবে সেই কবে জানুয়ারিতে, তা এখন এই অক্টোবর থেকেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ছুটোছুটি করছে। কোথায় যে যাবে তা কি বলে যায় নাকি ? জিজ্ঞেস করলে বলে কোথায় যাব তা কি বলা যায় নাকি আগে থেকে ? বুঝলি কিট্টু ও একেবারে বয়ে না গেলেও আর ফেরানো যাবে না ওকে।

কিট্টু বলল, আমার মনে হচ্ছে এই বৃষ্টি-বাদলায় সে আসতে পারছে না, কোথাও আটকে টাটকে গেছে।

—বিষ্টিতে আটকে যাবার ছেলে ও ? সুপ্রিয়া পিসি গর্জে উঠলেন, সেবারকার সেই বিচ্ছিরি বিষ্টির কথা তোর মনে নেই, সেই যে রে যেবারে সব ভেসে গিয়েছিল। সেবারে ওঁর কোথায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল বলে বাড়ি থেকে প্রায় সাঁতরে বেরিয়ে গেলেন। সেও এক কবিতা পড়ার ব্যাপার ছিল। ইচ্ছে থাকলে ঠিকই এসে পড়ত সে। এখন কি করা যায় বল তো কিট্টু।

—ঠিক ভেবে উঠতে পারছি না।

—ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করলে তবে তো ভাল করে ভাবতে পারবি। সকালের খাওয়া খাসনি তো, দেখেই মনে হচ্ছে।

এমন সময় একটা বড় ট্রে ভর্তি ওমলেট, টোস্ট, কফি আর মাখনের পাত্র

নিয়ে হাসিমুখে হাজির হলেন বাঘাকাকা। বাঘাকাকা বললেন, পিসিমা, নমস্কার।

সুপ্রিয়া পিসি গোমড়া মুখে একটু হাসি ফোটানোর চেষ্টা করলেন। সুপ্রিয়া পিসির ধারণা কিটুর বিয়ে হচ্ছে না স্রেফ এই উড়ে এসে জুড়ে বসা বাঘাকাকার জন্যে। এই বয়স্ক জেলখাটা ব্যক্তিটি কিটুকে সাহায্য করার নামে তাকে আরও অলস করে দিচ্ছে। বাঘাকাকার অসাধারণ রান্না খেয়ে এবং তাঁর নানা পরামর্শ পেয়ে কিটু ক্রমশ বাঘাকাকার প্রতি এমন নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে যে ভবিষ্যতে কিটু মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে।

বাঘাকাকা ঠিকই বুঝতে পারেন সুপ্রিয়া পিসি তাঁর উপর ঠিক সন্তুষ্ট নন। আর এখন তো আরও অসন্তুষ্ট হবেন কেন না সুপ্রিয়া পিসি চমৎকার সব খাবার এনেছেন, সেগুলোর বদলে কিটু তো এই সবই খাবে।

কিটু বলল, আচ্ছা সুপ্রিয়া পিসি তুমি যে বললে ভাল খাওয়া-দাওয়া করলে তবে ভাল করে ভাবা যায়—আমার কিন্তু ভাল খেলেই ঘুম পায়। আমি তখন আর একদম ভাবতে পারি না।

সুপ্রিয়া পিসি বললেন, আমি কি তোর কাছে এসেছি খাবার-দাবার নিয়ে গপ্পো করতে? উল্লুকটা কোথায় গেল ভেবে ভেবে আমি অস্থির। কোথায় কি বিপদ হল কে জানে।

কিটু বলল, মিহির কোথাও বিপদে পড়েনি সুপ্রিয়া পিসি। আসলে কোথাও গিয়ে বৃষ্টিতে আটকে গিয়েছে।

—তোকে বললাম না? বৃষ্টিতে আটকাবার ছেলে নয়! ওকে তুই চিনিস না।

কিটু তার দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, আমিও ওকে একটু-আধটু চিনি সুপ্রিয়া পিসি—ওকে বৃষ্টিতে আটকানো যায় না জানি, ও যখন বাড়ি থেকে বেরুতে চায় তখন আটকানো যায় না, কিন্তু বাড়িতে ফিরবার সময় এই বৃষ্টি, কিংবা এর অর্ধেক বৃষ্টিতেও সে আটকে যাবে। ও ঠিক কোথাও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে জমে গিয়েছে।

—এ তোর কিছু না করার একটা অজুহাত। সুপ্রিয়া পিসি ক্ষুব্ধ ভাবে বললেন, গোয়েন্দার এ-রকম মন হলে চলবে কেন?

—আমার আর গোয়েন্দাগিরি ভাল লাগে না পিসি। খুব গম্ভীরভাবে কিটু বলল।

—কেন রে? সুপ্রিয়া পিসি বললেন, এই তো তোদের নিয়ে এক ঝামেলা। কোনও কিছুতেই মন দিতে পারিস না। তুই কি ভাবছিস আমি তোকে ফি দেব না?

—সুপ্রিয়া পিসি! কিটু বলল, ঠিক ফি-এর ব্যাপার নয়। ফি দু-একবার পেয়েছি, বেশির ভাগই আমি ইচ্ছে করলেই যেখানে নিতে পারতাম অনেক টাকা, সেখানে একেবারেই নিইনি। লোকেদের সামান্য সাহায্য করে টাকা নিতে আমার কেমন যেন লাগে। আসলে কি মনে হচ্ছে জানো পিসি, আমি যেন এক উদ্দেশ্য-

হীন মানুষ, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। গোয়েন্দাগিরি আমার মনের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। আমি এই পেশা ছেড়েই দেব ভাবছি।

—সেটা ভাল কথা। সুপ্রিয়া পিসি বললেন, তবে এক কাজ কর, কোথাও একটা চাকরি-টাকরি জুটিয়ে নে। তারপর বিয়ে করে সংসারী হ। বাঙালি হয়েছিস তোর কি আজেবাজে কাজ পোষায়? তবে তুই মিহিরকে খুঁজে বার কর।

—ও ঠিকই এসে যাবে দেখো। কিটু বলল, আজই সন্ধেয় এসে বলবে মা আমি আটকে গিয়েছিলাম!

সুপ্রিয়া পিসি উঠলেন। বললেন, আমি চলি আজ। মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠছিল, কাউকে বলে একটু হালকা হব তার উপায় নেই। তোর পিসেকে তো জানিস, এমন উদাসীন ব্যক্তি আর দুটো পাবিনে। আর নিয়তি—উঃ কদিন থেকে তার মুখ গোমড়া হয়ে আছে, কি না ওকে বলেছিলাম পান তৈরির সময় মিষ্টি মসলাই যথেষ্ট, পানের মধ্যে দু চামচ চিনি দেওয়ার দরকার নেই। ব্যাস্ ওতেই তাঁর মন ভেঙে গেছে।

তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন, এই যাঃ একটা মস্ত ভুল করে ফেলেছি রে। রিকশওলাকে তো থাকতে বলিনি, চলে গেছে। এই জলে বাড়ি ফিরব কেমন করে?

বাঘাকাকা বললেন, আমি একটা রিকশ এনে দিচ্ছি। বলে বাঘাকাকা আর বিলম্ব না করে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন একটা ছাতা নিয়ে।

বৃষ্টি তখন একটু কম।

কিন্তু কিটুর কথা মিলল না।

বিকেলেই বৃষ্টি থেমে গেল। জল তবু জমে রইল। সন্ধেবেলা আবার শুরু হল পাওয়ার কাট। বিদ্যুৎ বন্ধ। সমস্ত অঞ্চল অন্ধকার। মনটা যেন এই অবস্থায় গুটিয়ে যায়। ভাবতে ইচ্ছে করে না কিছু। নিজেদের অসহায় অবস্থা ভেবে ভারি কষ্ট হয়। রাত বারোটার পর বিদ্যুৎ এল। কিটু তখন অবশ্য ঘুমিয়ে পড়েছে খাওয়া-দাওয়ার পর।

ভোরবেলাই দরজার বেলটা বাজল। বিদ্যুৎ আছে। ধড়মড় করে উঠে পড়ল কিটু। তার বুকটা ধড়াস করে উঠল। এই ভোরে আবার কে এল? বাঘাকাকা আগেই উঠেছিলেন। রোজই তিনি ভোর পাঁচটার পরই উঠে পড়েন। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলেন বাঘাকাকা। কিটু উপর থেকে নিচে তাকিয়ে দেখল। ঠিক। এই ভয়ই কিটু করছিল। সুপ্রিয়া পিসি! অর্থাৎ মিহির ফেরেনি। এখন কি হবে? কাল সে নিশ্চিন্তভাবে সুপ্রিয়া পিসিকে বলেছিল ভাবনা না করতে, এখন কি করবে সে? কোনও সূত্র নেই। কোথায় যাবে সে, কি করবে সে?

সুপ্রিয়া পিসি গটগট করে উপরে উঠে এলেন বটে, কিন্তু তাঁর চেহারা দেখেই বোঝা যায় তাঁর রাত্রে ঘুম হয়নি। চুল এলোমেলো। কপালের সিঁদুর লেপ্টে রয়েছে। এসে তিনি ধপ্ করে কিটুর বিছানায় বসে পড়ে বললেন, কি হবে রে, এখনও ফিরল না।

কিট্টু বলতে গেল, ভেব না সুপ্রিয়া পিসি, আমি দেখছি কি করা যায়।

সুপ্রিয়া পিসি হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। বললেন, কিট্টু রে একটা কিছু কর।

কিট্টু বলল, মুস্কিল হচ্ছে কি জানো পিসি, টেলিফোনটা খারাপ হয়ে রয়েছে, নইলে একটা কিছু হদিস করা যেত। পুলিশকে ফোন করে জানা যেত তাদের কাছে কোনও খবর আছে কি না। আফজলকেও জিজ্ঞেস করা যেত। রাস্তায় জল কেমন ?

সুপ্রিয়া পিসি বললেন, এখন জল তেমন নেই। কাদায় ভর্তি রাস্তা, কিছু কিছু জায়গায় কয়েক ইঞ্চি জল আছে অবশ্য।

কিট্টু বলল, আমি এক্ষুণি তৈরি হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। প্রথমে আফজলের বাড়িতে। ওকে সঙ্গে নিয়ে দু-একটা জায়গা ঘুরে আসি। ওর বন্ধুদের ঠিকানা দরকার দু একজনের।

সুপ্রিয়া পিসি বললেন, সেটা আমি বলে দিচ্ছি তুই লিখে নে।

কিট্টু তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরুতে যাবে এমন সময় দরজায় ঘণ্টা বাজল।

দরজা খুলতেই রোগা, ফর্সা চেহারার একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি এসে বললেন, আমি একটু আগে শান্তিরঞ্জন মৈত্রর বাড়িতে গিয়েছিলাম, ওখান থেকে এই ঠিকানা পেয়ে আসছি। শুনলাম সুপ্রিয়া দেবী এই ঠিকানায় রয়েছেন।

—কি ব্যাপার ? কিট্টু প্রশ্ন করল।

—তার আগে একটু বসব। অনেকটা পথ হেঁটে আসছি।

উপরের বৈঠকখানায় ভদ্রলোককে বসানো হল। ভদ্রলোক বললেন, একটু জল…।

জল খাওয়ার পর ভদ্রলোক বললেন, আমি ভুবনচরা থেকে আসছি। আমার নাম রামমোহন ধর। ভুবনচরা আমার শ্বশুরবাড়ি। ঐ গ্রামে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। আপনাদের এক আত্মীয় মারা গেছেন পরশু রাত্রে।

—আমাদের আত্মীয় মারা গেছেন ? কিট্টু প্রশ্ন করল, তাঁর নাম কি ?

—আজ্ঞে তাঁর নাম মাধবলাল আচার্য।

কিট্টু বলল, মাধবলাল আচার্য বলে আমাদের কোনও আত্মীয় আছেন বলে তো আমি জানি না।

রামমোহনবাবু একটু যেন থতমত খেয়ে গেলেন কথাটা শুনে। তিনি তারপর একটু সামলে নিলেন। বললেন, আমি মশাই সাতেও থাকি না পাঁচেও থাকি না, ছা-পোষা মানুষ। ডালহৌসি স্কোয়ারের এম এম সিকদার অ্যাণ্ড ব্রাদার্স-এ চব্বিশ বছর কাজ করছি। ফার্মটা বাঙালির নামে হলেও মালিক বদলে গেছে, ভারি কড়া লোক। একদিন অফিসে না গেলে হুজ্জুত করে। তাই ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে কাল রাত এগারোটার পর শেয়ালদা স্টেশনে এসে পৌঁচেছি—কিন্তু অত রাত্রে আর আসতে পারিনি। আসলে হয়েছে কি মাধবলাল আচার্যের মৃত্যুটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। এদিকে আপনাদের এক আত্মীয় মিহির মৈত্র পরশু ঐ অঞ্চলে একটা কবি সম্মেলনে গিয়েছিলেন।

—কি বললেন ? সুপ্রিয়া পিসি বললেন, মিহির মৈত্র ঐ অঞ্চলে কবি সম্মেলনে গিয়েছিলেন ? তারপর ?

—আজ্ঞে সে কবি সম্মেলন হয়নি।

—কেন হয়নি ? সুপ্রিয়া পিসি অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করলেন, মিহির কোথায় এখন ?

রামমোহনবাবু বললেন, আজ্ঞে পরশু বিকেলে যে মাঠে কবি সম্মেলন হবে বলে ঠিক হয়েছিল সে মাঠের উপর দিয়ে বিরাট এক ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিও। সমস্ত অনুষ্ঠান পণ্ড হয়ে যায়। দুটো তাঁবু খাটানো হয়েছিল, সে দুটো তাঁবু উড়ে যে কোথায় চলে গেছে তার পাত্তা নেই। ওই মাঠে এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে গেছে। গাছ-টাছ পড়ে ওদিকে এক বিপর্যয় কাণ্ড ঘটে গেছে। মিহিরবাবু কলকাতায় ফেরার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সম্ভব হয়নি বলে তিনি তাঁর আত্মীয় মাধবলাল আচার্যের বাড়িতে যান।

—তা সে কি এখনও ওখানে আছে, নাকি বাড়িতে ফিরছে ?

রামমোহনবাবু বললেন, আজ্ঞে তিনি বাড়িতে ফেরেননি।

—তাঁর হয়েছেটা কি ? বাড়িতে ফেরেননি কেন ?

—আজ্ঞে তাঁর ফেরার উপায় ছিল না।

—কেন উপায় ছিল না ?

—আজ্ঞে তিনি হাজতে গেলেন কিনা। মানে পুলিশ নিয়ে গেল।

—পুলিশ নিয়ে গেল, তাকে ?

—আজ্ঞে মাধবলাল আচার্যের মৃত্যুটা ঠিক স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল না বলেই পুলিশ মনে করে। মানে এমনিতে কিছু হত না। মাধবলাল আচার্য দীর্ঘ দিনই অসুস্থ ছিলেন, চলে ফিরে বেড়াতেন ঠিকই, কিন্তু ডাক্তার বলেছিলেন তাঁর হৃৎপিণ্ডের অবস্থা ভাল নয়, যে কোনও সময়েই তাঁর মৃত্যু হতে পারে। এ জন্য তিন রকম ওষুধ তাঁকে রোজ খেতে হত। এগুলির মধ্যে একটা ছিল ঘুমের ওষুধ।

তারপর হঠাৎ ঘড়ি দেখে বললেন, এ আমি কি করছি। এক্ষুনি আমাকে বেরুতে হবে, বাড়িতে গিয়ে দাড়ি কামিয়ে চান করে খেয়েদেয়ে আপিসে ছুটতে হবে। বাবা। একটু দেরি হলে নতুন বড়বাবু আস্ত রাখবেন না।

সুপ্রিয়া পিসি বললেন, তা তিনি মারা গেলেন কেমন করে ?

রামমোহনবাবু বললেন, সে আমি জানি না। তবে মিহিরবাবুই মাধবলাল-বাবুকে শেষ দেখেন—রাত সাড়ে দশটা এগারোটা পর্যন্ত তিনি মাধবলালকে কবিতা শোনান, সকালে দেখা যায় উনি মারা গেছেন।

সুপ্রিয়া পিসি বললেন, আপনি যে বলছেন এমনিতে কিছু হত না, তার অর্থটা কি ?

রামমোহনবাবু আবার ঘড়ি দেখলেন, বললেন, আমার তাড়া আছে, আমি চলে যাব এক্ষুনি। আমি আসলে বলতে চাইছিলাম এমনিতে কিছু হত না। ডাক্তার যদি ঠিকঠাক সার্টিফিকেট দিতেন যে মৃত্যুটা স্বাভাবিক তাহলে সকলেই

খুসি হত। তাঁর শরীর কালই পঞ্চভূতে মিশে যেত। কিন্তু ডাক্তার ভারি একটা ইয়ের কাজ করলেন। তিনি সার্টিফিকেটে লিখলেন মনে হয় কোনও অস্বাভাবিক কারণে মাধবলাল আচার্যের মৃত্যু হয়েছে, পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা করুন। যাকগে আমি চললাম। আমার সঙ্গে ওঁদের সম্পর্ক নেই। আমার শ্বশুরবাড়ি ভুবনচরায়, এই আমার অপরাধ। পরশু ওখানে গিয়েছিলাম একটা কাজে। দু ঘণ্টার কাজ, কিন্তু এমন ঝড়বৃষ্টি এল যে রাতে ফিরতে তো পারলামই না, কালও প্রায় না ফেরারই জোগাড় হয়েছিল। আসল কথা হল মিহিরবাবু ভাল আছেন, এই কথাটি বলার জন্যই আমার আসা। মিহিরবাবু ভাল আছেন, তবে পুলিশের হাজতে আছেন। পুলিশের হাজত ভাল কি না তা আমি জানি না, কোনওদিন থাকিনি। ওঁর বিরুদ্ধে পুলিশ দুটো চার্জ দেবে বলে শুনেছি, এক নম্বর হল খুন। অন্যটা তেমন মারাত্মক নয়, দুজন পুলিশের সঙ্গে মারপিট করা। আমি এর বেশি কিছু জানি না। আপনারা এবার যথাস্থানে গিয়ে নিজেরাই সব দেখে আসতে পারেন। আমি চলি। হ্যাঁ, আমার শ্বশুরের নাম বিদ্যাচরণ গুঁই। ওঁর একটা ইয়ে, মানে মদের দোকান আছে ভুবনচরায়। সাত্ত্বিক লোক—সকলেই ওঁকে গণ্যমান্য করেন। আচ্ছা চলি আজ।

রামমোহনবাবু পা বাড়ালেন। তাঁকে আর ঠেকানো গেল না।

সুপ্রিয়া পিসি কয়েক মুহূর্ত গালে হাত দিয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন, এখন উপায় ?

মিহির খামোখা খুন করবে কেন একজন অপরিচিত লোককে ?

কিট্টু বলতে যাচ্ছিল, খুন করার কোনও ইচ্ছে ছিল না বোধ হয়, কিন্তু ওর কবিতা শুনেই মাধবলালবাবুর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। আর তা হলে অপরাধজগতে খুনের অস্ত্র হিসেবে এই প্রথম কবিতাকে পাওয়া যাবে, যদি অবশ্য প্রমাণ হয়।

কিন্তু কথাটা সে বলল না।

সে বলল, সুপ্রিয়া পিসি, তুমি ভেব না। ওর খোঁজ পাওয়া গেছে। নিশ্চয় কোনও ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার ঘটেছে। মিহির খুন করেনি, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। বাড়ি ফিরে যাও, আমি ব্যাপারটা দেখে আসি।

সুপ্রিয়া পিসি বললেন, তোর যা খরচ-টরচ লাগে সব চেয়ে নিবি। আর এই নে আগে কিছু রেখে দে। এই বলে সুপ্রিয়া পিসি কয়েকটা পঞ্চাশ টাকার নোট কিট্টুর হাতে দিলেন।

কিট্টু একটু ইতস্তত করল, কিন্তু কি ভেবে নোটগুলো পকেটে পুরল।

সুপ্রিয়া পিসি উঠবার আগে বললেন, হ্যাঁরে ঐ যে মধুসূদন বলে লোকটি বলে গেল ভুবনচরায় আমাদের আত্মীয় মাধবলাল আচার্য মারা গেছেন তিনি কে ?

কিট্টু লাহিড়ি বলল, তাই তো ভাবছি।

—তোর মনে পড়ছে না কিছু ?

—একদম না।

—অদ্ভুত ব্যাপার! সুপ্রিয়া পিসি বললেন, সব ব্যাপারেই একটা যেন অদম্য রহস্য ফুটে বেরুচ্ছে।

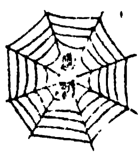
কিট্টু বলল, অদম্য রহস্য আবার কি রকম ভাষা হল?

সুপ্রিয়া পিসি বললেন, কে জানে কি রকম ভাষা হল। মনের ভাবটা বোঝা গেলেই হল।

কিট্টু বলল, তোমার একটা সত্যিকারের ভুল হয়েছে পিসি। যিনি আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন তাঁর নাম মধুসূদন নয়কো মোটেই। ওঁর নাম রামমোহন।

সুপ্রিয়া পিসি বললেন, ও একই কথা হল।

কিট্টু এ-কথার জবাব না দেওয়াই সঙ্গত মনে করল। সুপ্রিয়া পিসিকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না যে মধুসূদন এবং রামমোহনে আকাশ-পাতাল তফাত! সে একটু ভেবে বলল, রামমোহনবাবুকে আর একটু আটকানো উচিত ছিল। অনেক কথাই উনি বলতে পারতেন। কে তাঁকে পাঠিয়েছে—তাঁর নাম কি? অন্যান্য আনুষঙ্গিক বৃত্তান্তও কিছু জানা যেত। ভদ্রলোক আত্মীয় বললেন কেন? কার আত্মীয়? সুপ্রিয়া পিসির নাকি পিসেমশায়ের? ঐ ঠিকানাটা উনি কার কাছ থেকেই বা পেলেন?



২

কিট্টুর নিজের উপরই রাগ হল একটু। ভদ্রলোকের ঠিকানাটাও নিয়ে রাখা হল না, তবে তিনি কথায় কথায় ডালহৌসি স্কোয়ারের এম এম সিকদার অ্যান্ড ব্রাদার্স'-এর কথা বলেছিলেন বটে। দরকার হলে ওখানে যাওয়া যেতে পারে।

সুপ্রিয়া পিসি বললেন, ভারি অদ্ভুত ব্যাপার তো। আমাদেরই আত্মীয় অথচ আমরা তাঁর নাম জানি না! আমাদের সঙ্গে কি সম্পর্ক তা জানি না। অথচ খুন হয়ে গেলেন? ভুবনচরা জায়গাটাই বা কোথায়? সেখানে কেমন করেই বা যেতে হয়? মহা মুশকিল। মিহির হাজতে পড়ে রয়েছে। কি খেতে দিচ্ছে কে জানে। হাজতে নিয়ে গিয়ে পুলিশ আজকাল দারুণ সব অত্যাচার করে। অনেক সময় পিটতে পিটতে মেরেও ফেলে। কিট্টু ভাই রে তুই এক্ষুনি যা একটা কিছু কর।

কিট্টু বলল, ভেব না সুপ্রিয়া পিসি আমি একটা কিছু হিল্লে করবই। তুমি বাড়ি চলে যাও। আমি আজ রাত্রের মধ্যেই কিছু খবর এনে দিতে পারব। সুপ্রিয়া পিসি চলে গেলেন। কিট্টু প্রস্তুত হয়ে বেরুতে যাচ্ছে এমন সময় দরজার তলা দিয়ে দু-খানা খবরের কাগজ দিয়ে গেল। ঘড়িতে সময় দেখল কিট্টু আটটা বেজে দশ মিনিট। আজকাল খবরের কাগজ দিতে ভারি দেরি করছে। কিট্টু দেখল দুটোই গণপ্রভাত। ইংরেজি কাগজটা দেয়নি। ভুল করে দুটো কাগজ দিয়ে গেছে মনে করে কিট্টু দরজা খুলে কাগজওলাকে বলতে যাবে, কিন্তু দরজা খুলতে খুলতেই লোকটির আর পাত্তা পাওয়া গেল না।

কিট্টুর তখন খেয়াল হল একটা গতকালের কাগজ। তার মনে পড়ল তাই তো কাল তো কাগজই দেয়নি কোনও। সে তাড়াতাড়ি দুটো কাগজই তন্ন তন্ন করে খুঁজল, কিন্তু সংবাদটা, অর্থাৎ মাধবলাল আচার্যের মৃত্যুসংবাদ কোথাও চোখে পড়ল না। তবে ঝড়ের নানা কাহিনীতে কাগজ ঠাসা। মনে হল কলকাতায় যা হয়েছে তার চাইতে কলকাতার বাইরে অনেক বেশি ঝড় হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অন্তত কুড়ি জন মারা গেছে। বহু পশুর মৃত্যু হয়েছে। কলকাতায় বৃষ্টির পরিমাণ এক দিনে প্রায় দেড়শো মিলিমিটার, সর্বত্র সমান বৃষ্টি হয়নি আবার। আলিপুরে প্রায় দেড়শো, কিন্তু দমদম বিমানবন্দরে প্রায় দুশো মিলিমিটার।

কাগজে কিছু রাজনীতির খবরও ছাপা হয়েছে। ভারতবর্ষকে কোন দল কত নিচের দিকে নামাতে পারে যেন তার শেষ প্রতিযোগিতা চলছে। হঠাৎ নিচের দিকে চোখে পড়ল একটা ছোট্ট খবর—এম এল এ-র রহস্যজনক মৃত্যু। খবরটা এসেছে উত্তর চব্বিশ পরগনার সংবাদদাতার কাছ থেকে। সংবাদদাতা লিখেছেন ভুবনচরার এম এল এ মাধবলাল আচার্য গত শনিবার রাত্রে ঘুমের মধ্যে পরলোক গমন করেছেন। ডাক্তার এই মৃত্যুকে অস্বাভাবিক মৃত্যু মনে করায় মৃতদেহ শব ব্যবচ্ছেদের জন্য পাঠিয়েছেন। মৃত এম এল এ-র দূর-

সম্পর্কের এক আত্মীয়কে পুলিশ হাজতে প্রেরণ করেছে।

কিট্টু ডাকল, বাঘাকাকা।

বাঘাকাকা এসে খবরের কাগজ পড়ে বললেন, উঁহু।

কিট্টু বলল, উঁহু মানে?

বাঘাকাকা হাসলেন। বললেন উঁহু মানে খবরে ভুল আছে।

—ভুল আছে?

—ভুল তো আছেই। ভুবনচরায় কোনও বিধানসভা কেন্দ্র নেই।

কিট্টু বলল, হয়ত অন্য কোনও কেন্দ্রের এম এল এ, ভুবনচরায় তাঁর বাড়ি?

—না। তাও নয়। বর্তমান বিধানসভায় মাধবলাল আচার্য নামের কোনও সদস্যই নেই।

কিট্টু এ কথায় অবাক হল না। বাঘাকাকার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির প্রমাণ সে বহুবার পেয়েছে। একবার পড়লে তিনি আর ভোলেন না। এমন কি দু বছর আগের কোনও এক তারিখে কি বার ছিল তা বলে দেন নির্ভুলভাবে। কেবল তাই নয়, একটু সময় দিলে তিনি সেই তারিখে চাঁদের অবস্থানও বলে দিতে পারেন।

কিট্টু বলল, বোধহয় মাধবলাল আচার্য আগে কোনও সময় এম এল এ ছিলেন?

—না। বাঘাকাকা বললেন, ছিলেন না। গত পঁচিশ বছরের মধ্যে নয়।

—তাহলে?

—সেইটেই তো ভাবছি।

একটু পরে প্রকৃতিপ্রসাদ এল হাঁফাতে হাঁফাতে। কিট্টুর খুড়তুতো ভাই, প্রকৃতি এখনও স্কুলে পড়ে, তবে কিট্টু দাদার সঙ্গে ভারি ভাব। কিট্টুদাদার সে একজন দারুণ ভক্ত।

—কিরে প্রকৃতি হাঁফাচ্ছিস কেন রে? কিট্টু প্রশ্ন করল, চোখ দুটোও বড় বড় গোল গোল দেখাচ্ছে।

প্রকৃতি বলল, জানো কিট্টুদা এম এল এ দাদু মারা গেছেন!

—এম এল এ দাদু মারা গেছেন? কিট্টু বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করল, এম এল এ দাদু মারা গেছেন? কিন্তু এম এল এ দাদু কে? তাঁর কথা তো কখনো শুনিনি! এম এল এ দাদু!

প্রকৃতি বলল, তোমার জানার কথা তো নয়। ইনি হলেন মায়ের বাবার, মানে আমার দাদুর পিসতুতো ভাই। আমিই মাত্র ওঁকে একবার দেখেছি আমাদের বাড়িতে, সেও অনেকদিন আগেকার কথা।

কিট্টু বলল, উনি কোথায় থাকতেন?

প্রকৃতি বলল, কি যেন নামটা জায়গার ভুলে যাচ্ছি। আজই কাগজে দেখলাম, এরই মধ্যে ভুলে গেলাম। ঐ তো কাগজ রয়েছে, দাও আমি বলছি।

কিট্টু বলল, জায়গাটার নাম কি ভুবনচরা?

প্রকৃতি বলল, তাহলে খবরটা পড়েছ ? হ্যাঁ, মনে পড়ছে এখন। ভুবনচরাই জায়গাটার নাম।

কিট্টু বলল, মাধবলাল আচার্য তো কখনও এম এল এ ছিলেন না।

প্রকৃতি হেসে ফেলল। বলল, না তা ছিলেন না।

—তবে ওঁকে এম এল এ দাদু বলছ কেন ?

প্রকৃতি হাসতে হাসতে বলল, খবরের কাগজেও লিখেছে এম এল এ-র রহস্যজনক মৃত্যু ! আসলে কি জানো কিট্টুদা মাধবলাল আচার্য হলেন গিয়ে দাদুর নাম। ইংরেজিতে লিখলে তাঁর নাম হয় আদ্যাক্ষরে মাধবের এম লালের এল আর আচার্যের এ, সবটা মিলিয়ে এম এল এ ! ভুবনচরার লোকে ও'র নাম দিয়েছে এম এল এ। এককালে প্রচুর ধনী ছিলেন।

কিট্টু বলল, এই খবরের কাগজেই আফজল কাজ করে। ওকে বলতে হবে। এমন ভুল সংবাদ ছেপে লোককে বিভ্রান্ত করার কোনও অর্থ হয় না। যাক্‌গে তা তুই ছুটতে ছুটতে আমার কাছে এসেছিস কেন ?

প্রকৃতি বলল, এই ব্যাপারে বেশ একটা রহস্য আছে কিট্টুদা ! ডাক্তার বলেছেন মৃত্যু অস্বাভাবিক. তুমি যাবে কিট্টুদা ? ভুবনচরা জায়গাটা চমৎকার শুনেছি, কখনও যাইনি যদিও। এম এল এ দাদুর বাড়িটাও বড়। বেশ বাগান-টাগান আছে।

কিট্টু বলল, এম এল এ-র মানে তোর দাদুর মৃত্যু সন্দেহজনক মনে করে কাকে হাজতে পাঠিয়েছে জানিস ?

—না তো। তুমি জানো ?

কিট্টু বলল, মিহিরকে।

প্রকৃতি ভয়ানক আশ্চর্য হল। বলল, তুমি জানলে কেমন করে ?

কিট্টু একটু রহস্যজনক হাসি হাসল। কিন্তু বাঘাকাকা সব ফাঁস করে দিলেন। প্রকৃতি খুব উৎসাহিত হয়ে বলল, তাহলে তুমি ওখানে যাবে ? আমি কিন্তু সঙ্গে যাব।

কিট্টু উদাস এবং বিরসভাবে বলল, হ্যাঁ যেতে হবেই বলে মনে হচ্ছে। মিহিরের একটা গতি করতে হবে। এখানকার পুলিশ এক রকম চিনি—কিছু পরিচয় হয়ে গেছে, কিন্তু ওখানে ওরা কেমন কে জানে। কিন্তু মিহির ওখানে গেল কেন ?

প্রকৃতি একটু ভেবে বলল, মিহিরদা দু-একবার ওখানে গিয়েছে তো। ওখানে ওর একটা ঘাঁটি আছে।

—ঘাঁটি ? কিট্টু বলল, সে আবার কি কথা ? তুই তা জানলি কেমন করে ?

প্রকৃতি বলল, মিহিরদার বাড়িতে গিয়েছিলাম গত বছর। ঐ সময় মিহিরদা টেলিফোন করছিল, আমি যে গিয়েছি সেটা সে টের পায়নি। সে কাকে বলছিল, নিশ্চয়ই কবিতার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি। শোন্‌ মংলুকে নিয়ে তুই চলে যা ভুবনচরায়, ওখানে সেবারকার মতো খুব জমিয়ে দু-দিন কাটানো যাবে। না না বাড়িতে আমিও বলছি না, তুইও বলিস না। ওখানে আমার এক আত্মীয়বাড়ি আছে. সেখানে অবশ্য আমি উঠব না—শেষে সব কথা বাড়িতে

জানাজানি হলে কেলেঙ্কারি…বলে প্রকৃতি থামল।

কিট্টু বলল, তারপর ?

প্রকৃতি বলল, তারপর আমার দিকে চোখ পড়াতে মিহিরদা কি রকম থতমত খেয়ে গেল। হঠাৎ বলল, রাখছি রে পেঁচো, পরে সব বলব। বলে রিসিভার রেখে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কি রে সব শুনেছিস তো? তা আমি বললাম সব কি করে শুনব এই তো সবে এলাম তা তুমি কি সব খাবারের কথা বলছিলে, কিসের কারি যেন। কিসের কারি মিহিরদা ? তা মিহিরদা তখন ভাবল কেলেঙ্কারি কথাটার আমি কেবল শেষের অংশটুকু শুনতে পেয়েছি। মিহিরদা তখন বলল কি জানো কিট্টুদা, মিহিরদা বলল, ঐ আমার এক বন্ধু নাগাল্যান্ডে গিয়েছিল, সেখানে কুকুরের মাংসের কারি হয় তাই বলছিল…তা আমি তখন আর কিছু বলিনি, পরে ভুলেও গিয়েছিলাম। এই এক্ষুনি মনে পড়ল।

কিট্টু মনে মনে নোট করল মংলু আর পেঁচো। মিহিরের ভাবগতিক বোঝা দায়। ওর যে কত বন্ধু আছে তার ঠিক নেই। একবার সে বলছিল তার যদি সারা জীবনে এক পয়সাও রোজগার না হয় তাহলেও কোনও ক্ষতি নেই, সে প্রত্যেক বন্ধুর বাড়িতে বছরে তিন রাত্তির করেও যদি থাকে তাহলেই তার আর ভাবনা নেই। ছেলেমানুষের মতো কথা। কিন্তু এই মংলুই বা কে, পেঁচোই বা কে ?

প্রকৃতি বলল, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে ?

কিট্টু বলল, আমাদের সঙ্গে, মানে ? তোরা যাচ্ছিস নাকি ?

প্রকৃতি বলল, মা ভারি মুষড়ে পড়েছেন। মা তো ওখানে দু একবার গিয়েছেন। এম এল এ দাদু মাকে একটা বেশ দামি হার দিয়েছিলেন। তা ছাড়া মা বলেন ঐ বাড়িতে এমন একটা সম্পদ আছে যা অমূল্য। জাহাঙ্গিরের আমলের একটা স্বর্ণমুদ্রা আছে যেটা বিক্রি করলে নাকি এককালে দু পাঁচজন মহারাজাকে কেনা যেত। মা বলেন এখন তো মহারাজা পাওয়া যায় না, তবে দু পাঁচজন মন্ত্রীকে কেনা যায় !

কিট্টু আগ্রহী হয়ে উঠল। বলল, জাহাঙ্গিরের আমলের স্বর্ণমুদ্রা ?

প্রকৃতি বলল, সে মুদ্রার দাম নাকি কেবল সোনার ওজনের নয়। তাও নাকি সেটা বেশ ভারি ওজনের। কিন্তু ওর উপরের লেখাগুলোরই নাকি দাম। কিন্তু তাতে কি লেখা তা কেউ জানে না। এম এল এ দাদুও জানতেন না। সোনার মুদ্রাটিকে নিরাপদে রাখার জন্য গলা সিসের মধ্যে সেটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তারপর গলা সিসে ঠাণ্ডা হয়ে জমে গেলে সেটাকে দেখতে হয়েছিল ঠিক একটা প্যাঁচার মতো। সেই প্যাঁচার ছাঁচও বেশ সুদক্ষ কারিগরেরই তৈরি ছিল। সিসের উপর কালো কুচকুচে রং করা ছিল। ব্যাপারটা কেউই বিশেষ জানত না। মায়ের ধারণা, যদি এম এল এ দাদু খুন হয়ে থাকেন তাহলে ঐ কালো প্যাঁচারই জন্য।

—ব্যাপারটা আর কে জানত, কাকিমা ছাড়া ?

—বিশেষ কেউ না। দাদুর পরিবারের লোক ছাড়া কারও জানবার কথাও নয়। তা ছাড়া জানাজানি হলে ডাকাতি হতে পারে বলে দাদু সেটি এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলেন যে কেউই জানত না। মা বলেন, ব্যাপারটা লোকে ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু কয়েক বছর আগে নাকি দিল্লির একটি কাগজে এক সাংবাদিক লিখেছিলেন জাহাঙ্গিরের আমলের একটি বড় স্বর্ণমুদ্রা নাকি দাদুর পূর্বপুরুষের হাতে এসেছিল। এর পর দু একজন সাংবাদিক সেই সূত্র ধরে খোঁজ-খবর করতে ভুবনচরায় এসেছিলেন, কিন্তু দাদু কারও সঙ্গে একটি কথা পর্যন্ত না বলে বিদেয় করে দিয়েছিলেন।

—তার মানে, কিট্টু বলল, কোনও বাইরের লোকই তোমার এম এল এ দাদুকে খুন করেছে, অবশ্য যদি উনি খুনই হয়ে থাকেন। অস্বাভাবিক মৃত্যু মানেই খুন নয়।

তারপর একটু ভেবে বলল, তবে এটা ভেতরের কারও কাজ হতে পারে। আর মিহির দুটি শ্রেণীতেই পড়ে। সে একদিক দিয়ে দেখতে গেলে বাইরেরই লোক, সে ঐ বাড়িতে ঐ রাত্রেই গিয়েছিল। আবার সে ভেতরেরও লোক, কেননা এম এল এ দাদু ওর আত্মীয়—যদিও বেশ দূরসম্পর্কেরই।

প্রকৃতি বলল, তোমার চেয়েও দূরসম্পর্কের, কিট্টুদা!

কিট্টু বলল, আমাদের দেশে যেমন আত্মীয়তার বাড়াবাড়ি তেমন বোধহয় অন্য কোনও দেশে হয় না। সায়েবরা তো এই রকম সম্পর্কের কাউকে আত্মীয় বললে দারুণ আশ্চর্য হবে।

এমন সময় আফজল এসে পড়ল। বলল, উঃ কাল কি পরিশ্রমটাই না গেছে। ডায়মন্ড হারবার অঞ্চলে দারুণ ঝড় বয়ে গেছে। সেখানে ভোর থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ছিলাম। আমাদের ফোটোগ্রাফার দাশু একটা গাছ থেকে পড়ে গিয়ে জখম হয়েছে—তাকে নিয়েও কয়েক ঘণ্টা খুব কষ্ট গেল। তাই ভাবছিলাম আজ ছুটি নিয়ে বেশ হাত পা ছড়িয়ে গড়িয়ে নেব, কিন্তু তা আর হল না, রাতের বেলায় নিউজ এডিটর বললেন কোথায় কে খুন হয়েছেন, রহস্যজনক খুন, সেটাকে নিয়ে খেলিয়ে লিখতে হবে। আমাদের কাগজে ঐ খুন নিয়ে একটা ভুল সংবাদও বেরিয়েছে, কেলেঙ্কারি ব্যাপার! মাধবলাল আচার্য, লোকেরা তাঁকে ইয়ার্কি করে এম এল এ বলে ডাকে, ব্যস, আমাদের সংবাদদাতা গাঁজা না ভাং খেয়ে লিখে দিলেন এম এল এ-র মৃত্যু! যাক্‌গে, আমার সঙ্গে যদি ক্যামেরা নিয়ে যাও তো কিছু রোজগারের ব্যবস্থা হবে। দাশুরই যাওয়ার কথা, কিন্তু ওর পা মচকে রয়েছে। তুমি যাবে?

কিট্টু ভাবল চারিদিক থেকে এমন আশ্চর্য সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যাতে ব্যাপারটা সত্যিই এমনিতে অস্বাভাবিকই মনে হবে! কোথায় ভুবনচরা, সেখানে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না কাল রাত্রেও, জায়গাটার নামই শুনিনি কখনও, কিন্তু আজই তিন তিনটে ব্যাপার ঘটে গেল এমনভাবে যে এখন সেই ভুবনচরাতে না যাওয়ার কোনও উপায়ই নেই।

আফজল বলল, কি ব্যাপার?

কিট্টু মোটামুটি সব বলার পর আফজল বলল, তাহলে তো দারুণ সৌভাগ্য আমার। কতকগুলো বাধা যা সাধারণত হয়ে থাকে এই সব ব্যাপারে সে সব আর থাকছে না!

—কি রকম?

—কোনও বাড়িতে খুন টুন হলে কিংবা কোনও রহস্যজনক ব্যাপার ঘটলে সে বাড়ির লোকদের কাছ থেকে কথা বার করা বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। অনেকে কথা বলা দূরের কথা বাড়িতে ঢুকতেই দিতে চায় না। তা সে ব্যাপারে কিছুটা নিশ্চিন্ত। তাহলে তুমি ক্যামেরা সঙ্গে নিচ্ছ।

কিট্টু বলল, নিতেই হবে। দেখছি এ ব্যাপারে আমার কোনও কিছুতেই আপত্তি খাটবে না। আগেই বলেছি, না যাওয়ার কোনও উপায় নেই। এখন তুমি বলছ ক্যামেরা নিতে হবে?—বেশ তাই হবে। কিন্তু জায়গাটা কোথায়?

আফজল বলল, এই তো লিখে এনেছি আমার নোটবইয়ে, দাঁড়াও বার করি।

বাঘাকাকা বললেন, আমি বলে দিচ্ছি—নোট করতে হবে না। জায়গাটা হল গিয়ে চম্পাপুকুর থেকে আন্দাজ সাত আট কিলোমিটার দূরে। চম্পাপুকুর হল গিয়ে বারাসত থেকে বসিরহাট যাওয়ার পথে।

কিট্টু বলল, ওরে বাবা, সে যে অনেক দূর। তা তুমি জানলে কেমন করে জায়গাটা কোথায়?

বাঘাকাকা একটু লজ্জিতভাবে হাসলেন। বললেন, একবার একটা ভাল মানচিত্র পেয়েছিলাম, জিওলজিকাল সার্ভের। সেটা একটু মন দিয়ে দেখেছিলাম। তবে সে মানচিত্র বেশ পুরনো, তাতে জায়গাটার কাছাকাছি যতদূর মনে পড়ে বাস রুট ছিল না। এখন হয়ত হয়েছে।

কিট্টু বলল, একটা গাড়ি পেলে হত।

আফজল বলল, সে ভাবনা নেই। আমি সে ব্যবস্থা করে রেখেছি। ঘণ্টা খানেক পরে গাড়িটা এইখানেই এসে যাবে।

আফজল ঘড়ি দেখল। তারপর প্রকৃতিকে বলল, কাকিমা যাবেন বলছিলেন না।

কিট্টু বলল, প্রকৃতি তুমি বাড়িতে চলে যাও, কাকিমাকে নিয়ে প্রস্তুত হও। আমরা গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। তাহলে কতজন হলাম আমরা, আমি আফজল বাঘাকাকা কাকিমা প্রকৃতি এবং ড্রাইভার সব সমেত ছ'জন।

বাঘাকাকা বললেন, পাঁচজন। আমি না হয় না গেলাম। অনেক কাজকর্ম রয়ে গেছে।

কিট্টু জানে বাঘাকাকাকে আর নড়ানো যাবে না। সে একটু দুঃখিতই হল। এই অসাধারণ মানুষটিকে সে যতই দেখে ততই আশ্চর্য হয়ে যায়। বাঘাকাকাকে সে আর কিছু বলে না।

ভি আই পি রোডের উপর দিয়ে গাড়ি যখন দ্রুত চলছে তখন আফজল বলল, এই রাস্তার নামটা ভি আই পি-ই রয়ে গেল। ওই রাস্তা কাজি নজরুল

ইসলামের নামে হয়েছে পরে কিন্তু সেটা কেউ বোধহয় জানেই না।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর তারা পেঁৗছে গেল ভুবনচরায়। কিট্টু সেখানে পেঁৗছে বলে, কাকিমা তুমি চিনতে পারবে তো বাড়িটা ?

কাকিমা বললেন, পারব কি-না জানি না। তবে বাড়ির ঠিক সামনে নয় একটু দূরে একটা ভাঙা শিবমন্দির ছিল।

কিট্টু বলল, মনে হয় গাড়ি নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না। কতকগুলো রিকশ চলছে দেখছি। তুমি আর প্রকৃতি একটা রিকশ নিয়ে চলে যাও। একসঙ্গে এতগুলো লোক দুম করে যাওয়াটা ঠিক হবে না। কৌতূহলী লোকের অভাব নেই। আমরা বরং গাড়িটাকে একটা নিরাপদ জায়গায় রেখে ঘণ্টাখানেক পর আসছি। ওখানে খাওয়ার ব্যবস্থা কোরনা, আমরা কোথাও খেয়ে নেব যা হোক কিছু। এখানে মিষ্টির দোকান নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

প্রকৃতির এই প্রস্তাবে ঠিক সায় ছিল না, কিন্তু মেনে নিল। তার মুখখানাকে বিরস দেখাল।

একটা জায়গায় ড্রাইভার নন্দগোপাল গাড়ি থামিয়ে বলল, দেখেছেন ?

নতুন কিছু নয়। প্রায় সারা পথই তারা দেখতে দেখতে এসেছে। পরশুর ঝড়ের নানা ধ্বংসলীলা এবং রাস্তায় পড়ে থাকা গাছ সরানোর দৃশ্য। কত চালাঘর উড়ে গেছে। কত মানুষ আবার সেসব ঘরবাড়িকে নিজেরাই মেরামত করার করুণ চেষ্টা করছে, উপায়ই বা কি ! তাও ভাল, বড় রাস্তার উপর বেশি গাছ পড়েনি, তাহলে আর গাড়িতে করে এত দূরে আসতে হত না।

নন্দগোপাল কি দেখতে বলছে তাদের ওরা ঠিক বুঝতে পারল না। সামনে একটা ভাঙা চালাঘর। নন্দগোপাল একটু হেসে বলল, দোকানটা মিষ্টির ছিল। সাইনবোর্ডটা দেখুন। তাই তো। সাইনবোর্ডটা বেঁকে চুরে এমন হয়েছে যে দোকানের নাম আর বোঝা যাচ্ছে না। কেবল পড়া যাচ্ছে মিষ্টা···র। মনে হয় মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মাঝখানের অক্ষরগুলো উড়ে গেছে ঝড়ে। এখন কেবলই মিষ্টার !···

কিট্টু বলল, খবর পেতে হলে এই রকম একটা দোকানই দরকার।

আফজল বলল, খবর এবং খাবার !

নন্দগোপাল বলল, খাবার কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। তবে মালিকের খোঁজ করা যেতে পারে।

বিশেষ খোঁজ করতে হল না অবশ্য। একজন কাঁচাপাকা বড় বড় চুলওয়ালা খোঁচা খোঁচা দাড়ি সমেত লোক এসে বললেন, কি চাই মশাইদের ?

কিট্টু বলল, এদিকে একটু এসেছিলাম কলকাতা থেকে। একটু খবর টবর সংগ্রহ করতে। এই যে ঝড় হয়ে গেল তা নিয়ে একটু লিখবার ইচ্ছে আছে কাগজে।

মিষ্টির দোকানের মালিক তেতো কণ্ঠে বললেন, তা একটুই তো লিখবেন, আমাদের কথা আর বেশি লিখে খবরের কাগজ ভরানোর দরকার কি ? আর একটু লিখবার জন্য এতদূরে আসারই বা কি দায় ছিল। কলকাতায় বসে কি

একটু লেখা যেত না ? মশাই এত বড় কাণ্ড হয়ে গেল, লোকের এত ক্ষতি হয়ে গেল এখনও রিলিফের দেখা নেই। আমার এই দোকানটা দেখুন। ভেঙে চুরে একাকার। এটাকে যে একটু দাঁড় করাব তার উপায় নেই। মজা দেখার লোক আছে, সাহায্য করার লোক একটাও নেই। ডেলি লেবার চার্জ কুড়ি টাকা ছিল, এখন তাল বুঝে তিরিশ টাকা হাঁকছে শালারা। এই দোকানকে ঠিক করতে অন্তত চার হাজার টাকার ধাক্কা। আবার ঝামেলা কি জানেন ? আমি যদি নিজের গরজে আর খরচে এটাকে ঠিকঠাক করেও নিই, তাহলে সরকার সাহায্য দেবে না। সরকারের লোক কবে আসবে, ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট দেবে তবে কিছু টাকা পাওয়া যাবে। তাও নাকি দু-চার হাজারের বেশি নয়, আর পেতে পেতে রাত কাবার হয়ে যাবে।

কিট্টু বলল, আপনার এই কষ্ট দেখে আমাদেরও কষ্ট হচ্ছে। আপনার নামটা কি ?

লোকটি বলল, আমার নাম দিয়ে কি হবে ? আমরা এদিকে নানা ব্যাপারে বিপর্যস্ত। নাম নিয়ে কি একটু ইয়ার্কি হবে ? দেখুন চারদিকে শালার লোকগুলো গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছে—কেউ যদি একটু সাহায্য করে।

আফজল বলল, আমরা কাগজে নাম যদি ছাপি তাহলে হয়ত সরকার… ।

—আপনার কাগজের নাম কি ?

—গণপ্রভাত।

—গণপ্রভাত ! বলেই ভদ্রলোক হাসতে শুরু করলেন। বললেন ঐ কাগজে আমার নাম কি হবে জানেন ? এম পি ! আমার নাম মহেন্দ্র পাল। আপনার কাগজে এখানকার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি মাধবলাল আচার্যের নাম কি না হয়ে গেল এম এল এ ! হা হা হা !! এম এল এ !!! আপনার কাগজ কবে উঠে যাবে ?

আফজল কথাটা হজম করে বলল, আমাদের বেশ খিদে পেয়েছে। আপনার দোকানের সব মালই কি নষ্ট হয়ে গেছে ?

মহেন্দ্র পাল বললেন, না মশাই সব নষ্ট হয়নি। সে দিক দিয়ে আমি ভাগ্যবান বলতে পারেন। দোকানের উপর দিয়ে জোর ঝড় বয়ে গিয়ে এটাকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু মিষ্টিগুলোর বিশেষ ক্ষতি হয়নি। তবে কি জানেন প্রায় সবই বিক্রি হয়ে গেছে। পরশু থেকে কাজ বন্ধ আছে। দুধ নেই, ছানা নেই, ক্ষীর নেই, কারিগর নেই। পরশু থেকেই সে বেপাত্তা। তবে কিছু রসগোল্লা আছে। নষ্ট হয়নি। টাটকা ছিল পরশুদিন, এখনও ভাল আছে।

—ওতেই হবে। কিট্টু বলল, আমাদের দিন গোটা আষ্টেক করে।

মহেন্দ্র পাল বললেন, এখানে তো নেই, সে সব বাড়িতে রেখে আসা হয়েছে। এখানে ভাঙা দোকানে রেখে গেলে রাতের বেলা শেয়ালে মেরে দিত।

—শেয়াল ? শেয়াল আছে এদিকে ?

মহেন্দ্র পাল ভাবলেন একটু। তারপর বললেন, ঠিক কথা বলেছেন, শেয়াল কোথায় ? মনে হচ্ছে বছর পাঁচেক আগেও শেয়ালের ডাক শুনেছি। শেয়ালরা সব নাকি শেষ হয়ে গেছে।

একটু পর ওরা বেশ পরিতৃপ্তি করে রসগোল্লা খেয়ে বলল, এ দিকে চা-টা কোথাও পাওয়া যায় ?

মহেন্দ্র পাল বললেন, এখানেই চায়ের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু এখন তো কিছু নেই। উনুনটা পর্যন্ত জ্বালানো যাবে না। সমস্ত কাঠ ভিজে রয়েছে। কেরোসিন নেই কোথাও। যা কেরোসিন আসে সবই প্রায় পাচার হয়ে যায়। এক লিটার কেরোসিনে তিন টাকা লাভ।

—পাচার হয় যায় কোথায় ?

—কোথায় আবার—ঐ বাংলাদেশে। কেবল কি কেরোসিন, কত রকম মাল যে যায় তার হিসেব কে নেবে। নুন পর্যন্ত চলে যায়। এক এক কেজিতে দু টাকা লাভ। তা ছাড়া বিড়ি সিগারেট সাবান ওষুধ। দিনের বেলা সব গরিব সেজে থাকে। রাতের বেলা ওরাই হয়ে ওঠে ভয়ংকর। খুন খারাবি লেগেই আছে। এ সব কথা কাগজে বেরয় ? বেরয় না। এই দেশটা এই ভাবেই যাবে মশাই এই ভাবেই যাবে, বুঝলেন ?

—কিন্তু চায়ের দোকান এখানে কি একটিও নেই ?

—নেই ঠিক বলা যাবে না। তবে সোজা হাঁটতে থাকুন, মিনিট দশেক গেলে বাঁ হাতে পেয়ে যেতে পারেন নিশীথের দোকান।

চব্বিশটা রসগোল্লার জন্য পঞ্চাশ টাকা পেয়ে মহেন্দ্র পাল অভিভূত হলেন। অভিভূত হবার পর দ্রবীভূতও হলেন। বললেন, আপনাদের যদি কোনও দরকার থাকে বলবেন।

আফজল বলল, আমরা গাড়িটাকে এখানেই রেখে যাচ্ছি আপনার কাছে, অবশ্য সঙ্গে নন্দগোপালও থাকবে। আমরা রাতের দিকে আবার ফিরে যাব কলকাতায়।

মহেন্দ্র পাল কোনও কথা বলতে পারলেন না। কলকাতার মানুষ তাহলে ভালও হয়। খবরের কাগজের লোকেরাও যত খারাপ হয় ভাবতেন তিনি, তত খারাপ সর্বদা হয় না এটা তিনি বুঝতে পেরে মনে মনেই লজ্জিত হলেন আগে কড়া কড়া সব কথা বলছিলেন স্মরণ করে।

নিশীথের দোকানে পৌঁছনোর অনেক আগেই দোকানটির সাইনবোর্ডটি দেখা গেল। দেখা গেল সেটি একটি ঝোপের কাছে পড়ে রয়েছে। ঝড়েরই কীর্তি। দোকানের নাম দি গ্রেট টি কোং, তার তলায় প্রায় একই রকম বড় হরফে লেখা প্রোঃ নিশীথ সাধুরায়।

আফজল বলল, চা আর জুটবে না মনে হচ্ছে কিট্টু।

কিছুক্ষণ চলার পর দেখা গেল একটা চায়ের দোকানের ধ্বংসাবশেষ। তার আশেপাশে আরও কয়েকটা দোকানঘর, সেগুলোও আস্ত নেই। লোকেরা জটলা করছে। নানা বয়সের লোক ওদের দেখে একটু কৌতূহলী হল। কিট্টুর কাঁধে ক্যামেরা ঝুলছে দেখে একটি হাফ প্যান্ট পরা রোগা টিঙটিঙে বছর দশেকের ছেলে বলল, ক্যামেরার লেন্সের পাওয়ারটা কত ?

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন কিট্টু এবং আফজলকে একটু স্তম্ভিতই করল।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। কিট্টু হেসে বলল, ওয়ান পয়েন্ট স্কোর। বুঝলে কিছু?

ছেলেটি বলল, হ্যাঁ।

—কি বুঝলে?

—সাড়ে তিন হাজার টাকা।

এর মধ্যে দু-একজন গ্রামবাসী তাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর আরও দু-একজন।

—আপনারা কোত্থেকে আইতাছেন?

কিট্টু বলল, খবরের কাগজ থেকে। আফজল বলল, ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেল না পরশু আর তার আগের দিন?

—ও বুঝচি। ঐ নিয়ে লিখবেন। তা লিখ্যা দিবেন আমাদের অবর্ণনীয় ক্ষতি হইচে।

—হ্যাঁ তাই লিখব।

—লিখ্যা দিবেন, মানুষের দুঃখ দুর্দশা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। গবাদি পশুর ক্ষতি হইচে। চায়ের দুধ মিলতাছে না। শিশুর দুধ নাই। সরকার যেন অবিলম্বে এই অঞ্চলে তাঁবু কম্বল আলু দুধ সরষের তেল এ সব পাঠান। আর একটা কথা লিখ্যা দিবেন, বড় আচ্চায্যি কথা।

—কি রকম আশ্চর্য?

—পরশু রাত্রের ঝড়ে এখানকার নতুন সাধুর আস্তানা ঝড়ে উড়াই লইয়া গেছে।

—নতুন সাধুর আস্তানা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ কত্তা, নতুন সাধুর আস্তানা। সেটা তেমন আচ্চায্যি নয়, কিন্তু ঐ ঝড়ে সাধুরেও উড়াইয়া লইয়া গেছে।

—সাধুকেও উড়িয়ে নিয়ে গেছে ঝড়ে?

—তবে আর কইতাছি কি। অত ভাল সাধু আজকাল আর পাওয়া যায় না কত্তা। সারা দিন তিনি ধ্যান করতেন।

—সারা দিন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ কত্তা, সারা দিন। কারুরই দর্শন করার উপায় ছিল না। তাঁরে দর্শন করা যাইত রাত্তির কালে। তাও রাত দুই প্রহর হওয়ার পর।

—তা আপনার নামটা কি? আফজল প্রশ্ন করল।

—আমার আবার নাম। লোকটি বিশেষ বিনয়ের সঙ্গে বলল, আমার একটা নাম ছিল বটে, কিন্তু বিশেষ ব্যবহার হয় না। আমাকে জটায়ু কইলা ডাকে হক্কলে। এক কালে আমার মাথায় জটা ছিল, হেই থেকেই ঐ নাম চালু হইয়া যায়।

—তা আপনি করেন কি?

—আজ্ঞা?

—আপনি করেন কি?

—কি আর করমু। কিছু না।

—তা চলে কেমন করে ?

—আজ্ঞা ?

কিট্টু ভাবল লোকটি বোধহয় কম শোনে। সে একটু জোরেই বলল, আপনি সংসার চালান কেমন করে ?

—আজ্ঞে কত্তা গেরেফতার হই আমি মধ্যে মধ্যে।

—গেরেফতার হন ? কেন ?

—তা এসব কথা কাগজে লিখ্যা দিবেন নাকি ? তাইলে কমু না।

—না না, আপনি বলুন না। আমরা এ-সব কথা কাগজে লিখব না।

—আমি গেরেফতার হই টাকার জন্য। আর তো কোনও খ্যামতা নাই। তাই গেরেফতার হই।

—কিন্তু কেন ?

—ধরেন আপনি চালানদার। আপনার টাকা আছে। দশ বিশ হাজার টাকা খাটাতে পারেন—আপনি মহাশয় লোক। সম্মানিত ব্যক্তি। কিন্তু খাওনের লাইগ্যা, সংসার প্রতিপালনের লাইগ্যা আপনি দু-একটা আইন ভঙ্গ করেন। পুলিশ আসে—তাদেরও তো মধ্যে মধ্যে গেরেফতার করা লাগে, না অইলে উয়াদের চলবে ক্যান। তাই সম্মানিত ব্যক্তির বদলে আমি ধরা পড়ি। মাছ হোক আফিং হোক হিরো হোক হিরোইন হোক বাংলাদেশ থেকে কিংবা বাংলাদেশে পাচার করার সময় ধরা পড়ি। বামাল ধরা পড়ি। তবে তখন মাল কমই থাকে। সম্মানিত ব্যক্তিরা আগে থেকে জানতে পারেন কত্তা, তাঁরা সেদিন আমাদের কাছে আসেন। দু-চার হাজার দেন, ধরা পড়ি। এর মধ্যে আমি ছাড়া আরও চারজন আছে এই পাড়াতেই কত্তা। বিশু আছে, শিবু আছে, খালেদ আছে, জুলু আছে। এই দলে নাম লেখার জন্য অনেক উমেদারও আছে।

কিট্টু এবং আফজল বেশ অবাক হল। এমন সহজ সরল স্বীকারোক্তি তারা আশা করেনি।

কিট্টু বলল, আপনি এই গ্রামের মাধবলাল আচার্যকে চিনতেন ?

—ক্যান চিনমু না। ভাল কইরাই চিনতাম। উনি এককালে এই অঞ্চলের একজন কেউকেটা মানুষ ছিলেন। এম এল এ না হইয়াও লোকে এম এল এ কইত তাঁরে, তবে পতনের দশা এখন। কেউ আর থাকবো না ও বাড়িতে। উয়ারে মানুষ ভক্তি করত, শ্রদ্ধা করত, উনি মানুষজনদের দুঃখ দুর্দশা বুঝতেন। তবে অভিশাপ, বুঝলেন কত্তা, অভিশাপ।

—কিসের অভিশাপ ?

—বিধাতার অভিশাপ। নইলে তিনি মৃত্যুদূত পাঠাবেন ক্যান্ ?

—মৃত্যুদূত ?

—আজ্ঞে হ কত্তা, মৃত্যুদূত। ঐ বাড়িতে পরশু, যেদিন ঘূর্ণি ঝড় হয় সেদিন একজন দাড়িওলা মাতাল লোক ঢুক্যা পড়ে, আশ্রয় চায়। তার সঙ্গে এম এল এ মহাশয়ের কথাবার্তা তর্কাতর্কি হয়। সকালে দেখা যায় এম এল এ মইর্যা

আছেন। মাতালটা কী করছিলেন কে জানে। সকালে ডাক্তার আসেন, ডাক্তার বিনায়ক আদিত্য। ঐ তো ডাক্তারবাবু এদিকেই আইতাছেন।

দেখা গেল একজন বেশ মোটাসোটা অল্প চুলওলা প্রায় পঞ্চাশ বছরের এক ব্যক্তি ওদিকেই হেঁটে আসছেন। কিটু আর আফজল এগিয়ে গেল। তিনি কাকে বললেন, গরম জল আর ঠাণ্ডা জল দিতে হবে ক্রমান্বয়ে, ব্যথা বাড়লে একটা অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট দিতে হবে, ব্যস্ আর কিছু না। না না কোনও ইনজেকশন দিতে হবে না।

ভিড় এবং জটলা দেখে ডাক্তার আদিত্য বেশ ক্ষিপ্র পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন। বেশ সপ্রতিভ চেহারা—বেশ চমৎকার পোশাক পরা। গ্রামের সাধারণ ডাক্তারের চেহারা বললে যে রকম একটা চিত্র মনে আসে সে রকম মোটেই নয়। ডাক্তার আদিত্য বললেন, শুনলাম আপনারা খবরের কাগজ থেকে আসছেন ?

এই হচ্ছে গ্রাম। খবর এরই মধ্যে পেঁছে গেছে।

আফজল বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনারা আমার সঙ্গে আসুন। আমার বাড়ি বেশি দূরে না। দুপুরের খাওয়া কি রসগোল্লায় মেটে মশাই ? আমার ওখানে চলুন, ভাত-ডাল দুটো যা হয় খেয়ে নেবেন আপনারা। তারপর আফজলের প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, এ-সব বাজে লোকেদের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না।

কি আর করা যায়। ডাক্তারের কথা বলে কথা, তাও গ্রামের একমাত্র ডাক্তার।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, একটা মচকানোর কেস ছিল। একটা ছেলে পরশু ঝড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য জোরে দৌড়তে গিয়ে একটা ইটে না কিসে পা আটকে পড়ে গিয়ে পা ফুলে গিয়েছিল। এখন অনেক ভাল আছে। এদিকে ঐ কারণেই এসেছিলাম। আপনারা ঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি দেখতে এসেছেন শোনা গেল ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আফজল বলল।

ডাক্তার আদিত্য কিছু বললেন না। তিনজনে প্রায় দশ মিনিট হেঁটে একটা মোটামুটি চমৎকারভাবে তৈরি পাকা বাড়িতে পেঁছে গেল।

আফজল চট করে তার কার্ডটা দিল। কার্ডে তার নাম লেখা আছে। আজকাল অবশ্য হিন্দু মুসলমানের মধ্যেকার সেই পুরনো ছোঁয়াছুঁয়ি তেমন নেই। তবু কারও কারও অবশ্য অভ্যেস এখনও যায়নি। সেই কারণেই আফজল সঙ্গে তার কার্ড রাখে দেওয়ার জন্য। এ ছাড়া তার ছবিওলা পরিচয়পত্রও একটা থাকে।

ডাক্তার আদিত্যর দেখা গেল কোনও ভাবান্তর হল না। তিনি খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কবতে গেলেন মনে হল। একটু পর ফিরে এসে বললেন, এখন একটু যদি গরম লাগেও উপায় নেই। কাল ডিজেল ফুরিয়েছে, বিকেল নাগাদ এসে যাবে তখন আলো পাখা দুই-ই পাবেন। এখন একটু কষ্ট করতে হবে। তারপর বললেন, আফজলবাবু, আসল ব্যাপারটা বলবেন ?

আফজল একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। বলল, কী ব্যাপার বলুন তো ?

আসল ব্যাপার আবার কি ?

ডাক্তার আদিত্য বললেন, ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি দেখার জন্য কলকাতা থেকে এত দূরে এসেছেন বলে তো মনে হয় না। তা ছাড়া খবরের কাগজের গাড়িতে এক মহিলা এবং এক কিশোর এলেন, তাঁরা গেলেন মাধবলাল আচার্যের বাড়িতেই ! আপনারা কি পুলিশের ?

—আজ্ঞে না। কিট্টু বলল। মাধবলাল আচার্য মারা গেলেন। উনি আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন। কাল সকালের আগে ওঁর নামও শুনিনি অবশ্য। সে কারণে আমরা এত দূরে আসিনি। আপনার অনুমান সঠিক। যে মহিলা আমাদের সঙ্গে এসেছেন তিনি আমার নিজের কাকিমা। মাধবলাল আচার্য তাঁরই আত্মীয়। সঙ্গের ছেলেটি আমার খুড়তুতো ভাই। আমার পেশা গোয়েন্দাগিরি। পুলিশের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই, একেবারেই শখের গোয়েন্দা বলতে পারেন। আমার নাম কিট্টু লাহিড়ি।

—কিট্টু লাহিড়ি নামটা যেন শোনা-শোনা মনে হচ্ছে ?

কিট্টু বলল, এই আমার বন্ধু আফজল খবরের কাগজে কাজ করে বলে দু-একবার নাম ছাপা হয়েছে। নইলে হত বলে মনে হয় না।

—তা আপনি ভাবছেন এই খুন রহস্যের সমাধান করবেন ?

—খুন রহস্য ? কিট্টু বলল, এটা যে খুন সেটাই তো আমরা জানি না।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, আমাকে ধোঁকা দেবেন না। আপনারা এই খুন রহস্যের সমাধান করতেই এখানে এসেছেন এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

কিট্টু একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, দেখুন ডাঃ আদিত্য, আমি এখানে আপনাকে মিথ্যে কথা বলার জন্য আসিনি। খুন রহস্যের সমাধান করার কথা আমার মনেই হয়নি, আর কেউ আমাকে নিয়োগও করেনি।

—তবে ?

—আমার পিসতুতো ভাই মিহিরকে পুলিশ বিনা কারণে সন্দেহ করে গ্রেফতার করেছে, হাজতে রেখেছে। আমি ওকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছি।

—মাতাল। ডাক্তার আদিত্য বললেন, তার উপর হত্যাকারী।

আফজল বলল, দেখুন ডাক্তার সাহেব, আপনি বিনা কারণে একজন নিরপরাধ যুবকের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। এটা ঠিক নয়। এটা আপনার পেশার পক্ষে খুব বাহাদুরির কথা নয়।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, সে নিজে স্বীকার করেছে সে হত্যাকারী।

কিট্টু এবং আফজল দুজনই একথায় একেবারে যেন বৈদ্যুতিক শক খেল। বলল, নিজেই সে স্বীকার করেছে ! মিহির স্বীকার করেছে সে তার বৃদ্ধ আত্মীয়কে হত্যা করেছে ?

—আলবত ! ডাক্তার আদিত্য বললেন, এবার ভেতরে আসুন আপনারা। খেয়ে নেবেন।

ওরা হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে চমৎকার সাজানো একটা খাবার ঘরে বসে গেল। ডাক্তার আদিত্যের স্ত্রী চমৎকার যত্ন করে ওদের খেতে দিলেন। ডাক্তারের স্ত্রী

বললেন, তুমি একটা কি যেন। এদের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিলে নেমন্তন্ন করে এনে ?

চমৎকার স্নেহময় কথা। তিনি বললেন, তোমাদের চেয়ে আমার বয়স বেশি, বেশ বেশি। আমাকে তোমরা দিদি বলবে, কেমন ? আমার নাম রানি। এখানে আমরা একা একা থাকি, শিক্ষিত মানুষ পাই না তেমন। এ গ্রামে যারা শিক্ষিত হতে চায় তারা এখানে থাকে না। থাকবে কেন ? এখানে আছেটা কি যে থাকবে ? আমার এক ছেলে এক মেয়ে তারা দুজনেই কলকাতায় পড়ে, হস্টেলে থেকে।

তারপর ডাক্তার আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বললেন, উনি একটু রগচটা মানুষ। একটু অভিমানী। ওঁর ব্যবহারে কিছু মনে কোরো না তোমরা কেমন ? কাল থেকেই আমি ওঁকে বলছি মিহির ছেলেটি ভাল। মিহিরকে এমন করে ফাঁসানো তোমার উচিত হয়নি। নর্মাল ডেথ সার্টিফিকেট দিলেই তো সব চুকে যেত।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, বেশ করেছি ফাঁসিয়েছি। ও-ই মাধবলাল আচার্যকে খুন করেছে। ও নিজে বলেছে।

রানিদেবী বললেন, ও ঠিক খুন করেছে তা বলেনি। যাক্ গে, এখন তোমরা খেয়ে নাও, কথা বাড়িও না। খাওয়ার পর যত তর্ক করতে পার করবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর ডাক্তার আদিত্য কিটুকে বললেন, তাহলে তো বড় ভুল করে ফেলেছি।

কিটু বলল, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না ডাঃ আদিত্য। আপনি মনে করছেন মিহির হত্যাকারী। তা যদি হয় তাহলে মিহিরকে হাজতে পাঠিয়ে আপনি ভুল করেননি। হত্যাকারী বলে সন্দেহই যদি করে থাকেন তাহলে আপনি ঠিক কাজই করেছেন। আপনার কাজ আপনি করেছেন। কিন্তু এখন বলছেন আপনি ভুল করেছেন। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

—না। ডাক্তার আদিত্য বললেন, বুঝতে পারা একটু কঠিন। আসলে ব্যাপার কি জানো, আমি 'তুমি'-ই বলছি। আসলে ব্যাপার হল হত্যা নানা রকম হয়। একটা হচ্ছে ইচ্ছে করে হত্যা। যেটা কিনা ঠাণ্ডা মাথায় করা হয়। আর এক রকম হল হঠাৎ উত্তেজনার বশে হত্যা। কাউকে এমন একটা আঘাত করা হল যার উদ্দেশ্য হত্যা করা নাও হতে পারে, কিন্তু পরে দেখা গেল ঐ আঘাতের ফলেই মৃত্যু হল। আরও এক রকম হত্যা আছে যেটা দুর্ঘটনার পর্যায়ে পড়ে। গাড়ি চালাতে গিয়ে একজন হঠাৎ সামনে এসে পড়ল, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, বা গাড়িকে নিয়ন্ত্রণ না করতে পেরে দুর্ঘটনা ঘটে গেল। এ ধরনের অনেক রকম মৃত্যু হতে পারে যা হত্যাও বটে আবার নাও বটে। মিহির নিশ্চয় ঠাণ্ডা মাথায় জেনে শুনে মাধবলাল আচার্যকে হত্যা করেনি। কিন্তু ও যা করেছিল সেটাই আমার ধারণা ওঁর দাদুকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছিল।

কিটু বলল, মিহির কি করেছিল ?

ডাক্তার আদিত্য বললেন, এই রোগীর ইতিহাস আমি জানি। এঁর ছিল বাত। যখন বাতের ব্যথা চরমে ওঠে তখন ব্যথা কমার জন্য একটা ওষুধ উনি খেতেন। খুব জোরালো ওষুধ বলে কখনও সখনও সেটা খাবার পরামর্শ আমি দিয়েছিলাম। বছর খানেক আগে ওঁর হৃৎপিণ্ডের উপর একটা কমজোরি আক্রমণ

হয়। কোনও মতে সে যাত্রা সেরে ওঠেন। কিন্তু যখন জানতে পারলাম তিনি মদ টানা ছাড়েননি তখন ওঁর বাড়ির লোকদের বললাম, ওঁকে যদি মদ খেতে দেওয়া হয় তাহলে আর বাঁচানো সম্ভব নয়। কিন্তু বাড়ির লোকেরা বললেন, ওঁর মদ খাওয়া বন্ধ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁরা সব সময়ে ওঁকে চোখে চোখে রাখবেন সে উপায় নেই! ওঁর অনেক বন্ধু রয়েছেন যাঁদের বললেই উনি মদ পেয়ে যাবেন। ওঁর কাছে যাঁরা আসেন, তাঁদের পকেট সার্চ করা সম্ভব নয়। বড় জোর বলা যায় আপনারা দয়া করে ওঁকে মদ দেবেন না। এই কারণেই তখন আমি সর্বক্ষণ পাহারা এবং সেবা করার জন্য একজন নার্স রাখতে বলি। নার্স রাখাও হয়। বারাসতে মাধবলালের মেজো ছেলে বিমান, ওঁর শ্বশুর ডাক্তারখানা চালায়। সে সস্ত্রীক ওখানেই থাকে। কালে-ভদ্রে ভুবনচরায় আসে। বাবার সঙ্গে বিশেষ সদ্ভাব নেই, তবে সে সব শুনে রাধা নামের একজন নার্সকে পাঠিয়ে দেয়। ট্রেইনড নার্স এবং কাজকর্ম জানে ভাল, স্বভাবটিও ভাল। তাকে থাকা-খাওয়া ছাড়াও মাসে হাজার টাকা দেওয়া হয়। রাধা মাধবলালবাবুর উপর এমন চোখ রাখে যে তাঁর পক্ষে মদ খাওয়া সম্ভব নয়। এই রকমই চলছিল, ভালই চলছিল, কিন্তু পরশু বিকেলে এখানকার মাদারি মাঠে একটা কবি সম্মেলন হচ্ছিল, কতকগুলো কবি কোত্থেকে এসে জুটেছিল কে জানে? ডজনে ডজনে কবি। এখানে কবি সেখানে কবি। এখানকার কয়েকজন ছোকরা কবি আছে—দেখে মনে হয় ওরা ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না, কিন্তু মনের মধ্যে সব বিষাক্ত সাপের দল! ওরা কি ভাষা যে লেখে তা বোঝা যায় না, কি বলতে চায়, তা জানা যায় না। বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি সব শব্দ ব্যবহার করে। ওরা নিজেদের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আগডুম বাগডুম কত রকম আলোচনা করে। প্রতি বছর এই কবি সম্মেলন উপলক্ষে একটা সুভেনির বার করে। কোত্থেকে যে ওরা সব টাকা রোজগার করে ভগবান জানেন। তোমাদের ঐ রানিদি, উনিও চাঁদা দেন, এ বছর দিয়েছেন দুশো টাকা। বাজে খরচ একেবারে। টাকায় ওরা বোতল কেনে। বোতলের শ্রাদ্ধ হয়।

—এবারে প্রকৃতিদেবী কবিদের উপর প্রসন্ন ছিলেন না, বললেন ডাক্তার আদিত্য। সকাল থেকেই ছিল মেঘের আনাগোনা। দুপুরবেলা এল ঝড়, সঙ্গে বজ্রের গর্জন। তারপর বৃষ্টি। ওদের প্রথম দিকে নাকি খুব ফূর্তি হয়েছিল প্রকৃতির রুদ্র মূর্তি দেখে। তারপর যখন ঝড়ের ঘণ্টায় একশো কিলোমিটার কি তারও বেশি গতির ঝাপটা লাগতে শুরু করল, তখন কবিরা চাচা আপন প্রাণ বাঁচা বলে তিনশো মিটার দূরে থামিয়ে রাখা মিনিবাসে উঠে চম্পট দিল। পরে শুনেছি ওদের তাঁবু নাকি ঝড়ে উড়ে গেছে।

ঐ ঝড়ের মধ্যে মিহির কিন্তু দিশাহারা হয়নি। সে থলিতে দুটো চ্যাপ্টা বোতল নিয়ে সোজা দৌড়তে থাকে মিনিবাসের দিকেই, কিন্তু ও পৌঁছনোর আগেই মিনিবাস ছেড়ে চলে যায়। শ্রোতা এবং স্থানীয় কবিরা যে যেখানে পেরেছে ল্যাজ মাথায় করে দৌড়েছে।

বলে ডাক্তার আদিত্য হা হা করে হাসলেন।

তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, তারপর মিহির ভিজতে ভিজতে গিয়ে উপস্থিত মাধবলাল আচার্যের বাড়ি। গত বছরও ও এসেছিল কবি সম্মেলনের সময়। মাধবলালবাবুকে ও কিছু কবিতার বইও বিক্রি করে গিয়েছিল। একটা বই ওরই লেখা, নাম অর্ধচন্দ্র! মাধবলালবাবু এমনিতে ভারি প্রাচীনপন্থী কিন্তু এই সব অতি আধুনিক কবিদের লেখা যাচ্ছেতাই সব সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি পড়ে তিনি ভারি অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি বোধহয় মিহিরকে ওঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য চিঠিও লিখেছিলেন। আমি সপ্তাহে দুবার ওঁর শরীর পরীক্ষা করতে যেতাম, দেখতাম তাঁর বালিশের কাছে কবিতার বই কয়েকখানা। সে-গুলোর কী সব নাম, অদ্ভুত আর কিম্ভূত নাম! একটার নাম মনে আছে, ইঁদুর তোমার অক্ষাংশ! আর একটার নাম, ফুটো বালতিতে করাঘাত। যাক্ সে কথা। আসল ব্যাপার যা হয়েছিল তা বলি। ঐ রাত্রে মিহির বেশ টং হয়েই আচার্য বাড়িতে ঢুকেছিল। মাধবলালবাবুর কাছেও সে টং হয়েই যায়। সঙ্গে দুটো বোতল থাকায় রাধা আপত্তি করেছিল, কিন্তু সে বাধা দিতে পারেনি। এরপর ঘণ্টা তিনেক মিহির মাধবলালবাবুর সঙ্গে থাকে। রাত প্রায় সাড়ে দশটা পর্যন্ত আরও প্রবল ঝড় এবং বৃষ্টি চলে। ঐ সময়ের মধ্যে দুজনে একটি পুরো বোতল সাবাড় করেন। মিহিরকে খেতে দেওয়া হয় কিন্তু সে বিশেষ কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়ে। তার জন্য আলাদা একটা ঘরও দেওয়া হয়েছিল।

সকাল হয়। বৃষ্টি তখন থেমে গেলেও ঝড়ের প্রকোপ চলতেই থাকে। সাতটা নাগাদ ঝি ঘরে ঝাঁট দিতে মাধবলালবাবুর ঘরে ঢোকে।

ডাক্তার আদিত্য একটু চুপ করে রইলেন। তারপর মাধবলালবাবুর কোনও সাড়া না পেয়ে অভিনব বাবু দেখেন নিঃশ্বাস পড়ছে না। তখন তিনি পরীক্ষা করে দেখেন শরীরে প্রাণ নেই, শরীর ঠাণ্ডা এবং শক্ত। অর্থাৎ মৃত্যু বেশ আগেই হয়েছে। আমি পরে গিয়ে পরীক্ষা করে মনে হল হঠাৎ বেশি মাত্রায় অ্যালকোহল পান করায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এক হিসেবে এই মৃত্যু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আমার সব শুনে মনে হল মিহিরকে একটু শিক্ষা দেওয়া উচিত। এই কারণেই মৃত্যু স্বাভাবিক নয় বলে মনে হয়েছে এই মর্মে সার্টিফিকেট দিই।

মিহিরই জীবিত অবস্থায় ওঁকে শেষ দেখে। মাধবলালবাবুর সঙ্গে ওর কিছু কিছু কথাও হয়। কি কথা হয় তা আমি জানি না। যাই হোক, যে কথাই হোক তার সঙ্গে মাধবলালবাবুর মৃত্যুর কোনও সম্পর্ক কিছু না থাকাই সম্ভব। আসল ব্যাপার কি জানো, আমার কাউকে মদ টানতে দেখলেই রাগ হয়। বিশেষ করে শিক্ষিত সম্প্রদায় যারা সমাজকে নেতৃত্ব দেবে। দেশটা তো এইভাবেই নিচের দিকে যাচ্ছে।

কিটু বলল, কিন্তু এ নেশার বিরুদ্ধে তো অনেক কথাই বলা হয়েছে, করাও হয়েছে কিন্তু কেউ শোনে? উল্টে পৃথিবীতে মদের চেয়েও ভয়ঙ্কর অতি ভয়ঙ্কর সব নেশা বার করে ফেলেছে। না ডাক্তারবাবু, আপনি যা করেছেন তা ঠিক

হয়নি একেবারেই। একজন লোকের মদ টানার অধিকার আছে। সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

ডাক্তার আদিত্য এ কথায় একটু ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন, আমার মনে হয় সেটা সত্যি নয়। মদ টানার কারও অধিকার নেই, অবশ্য মাত্রার ব্যাপার আছে। অল্প মাত্রায় যা প্রায় নিরাপদ, অধিক মাত্রায় তা-ই মারাত্মক। মদ টানার ফলে বহু ব্যক্তির বহু ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু সে ক্ষতি তো সমাজেরও ক্ষতি। কত ড্রাইভার মদ খেয়ে গাড়ি চালাতে গিয়ে কত দুর্ঘটনা রোজ করে চলেছে সমস্ত পৃথিবীতেই, মারছে আহত করছে কত নিরীহ মানুষকে, তাই ব্যাপারটি ব্যক্তিগত নয়। মিহির যদি পরশু সন্ধ্যায় মাধবলালবাবুকে মদ না খাওয়াত— এটা তার পক্ষে ঘোরতর অন্যায় হয়েছে—সে যদি মদ না খাওয়াত, তাহলে আজ মাধবলালবাবু জীবিত থাকতেন, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

—কিন্তু সে তো খুন করার উদ্দেশ্য নিয়ে মাধবলালবাবুকে মদ খাওয়ায়নি। আফজল বলল।

—ঠিক কথা। ডাক্তার আদিত্য বললেন, খুন নানা রকম হয়। এটা হয়তো অত মারাত্মক খুন নয়। মিহির যদি না জেনে মদ খাওয়াত তাহলে না হয় একটা কথা ছিল, কিন্তু তাকে পই পই করে বারণ করা হয়েছিল। নার্স তাকে বলেছিল মাধবলালবাবুর মদ খাওয়া ডাক্তারের নিষেধ, কিন্তু সে বলেছিল ডাক্তার ছাই জানে। মদ হচ্ছে অমৃত। ডাক্তার অমৃত খাওয়ার বিরুদ্ধে কথা বলার কে?

—এ সত্যি ভারি অন্যায় হয়েছে মিহিরের। কিটু বলল, কি রকম যেন স্বভাব ওর। ও নিজেও বিশেষ মদ খায় না। আমি জানি ও মদ খায় কখনও সখনও। বেসামাল অবস্থা তার দেখিনি আমি। সুপ্রিয়া পিসি, অর্থাৎ মিহিরের মা দু-একবার ওর মুখ থেকে মদের গন্ধ পেয়েছেন, কিন্তু মিহির কখনও মাতলামো করেনি বলেই আমরা জানি। বোধহয় কবি সম্মেলনে একটু বাড়াবাড়ি করে থাকবে।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, আমি নিজেই হয়তো একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। ম্যাজিস্ট্রেট নিশ্চয় মিহিরকে ছেড়ে দেবেন। একেবারে ছেড়ে না দিলেও জামিন দিতে নিশ্চয় আপত্তি করবেন না। তবে মদ খেলে যে সব সময় পার পাওয়া যায় না এটা অতঃপর তার খেয়াল থাকবে বলে মনে হয়। তোমরা যদি মনে করো আমার এই ব্যাপারে কিছু করণীয় আছে জানিও। আমি একটা চিঠিও দিতে পারি ম্যাজিস্ট্রেটকে যদি দরকার মনে করো।

রানিদেবী বললেন, এই তো তোমাকে নিয়ে মুশকিল, তোমার কি দরকার ছিল পৃথিবী মেরামত করার ব্রত গ্রহণ করার। পৃথিবীর সব অন্যায় তুমি কি দূর করতে পারবে? দেখ তো মিহির ভদ্রলোকের ঘরের ছেলে, নিরপরাধ। তাকে তুমি খুনের মধ্যে জড়িয়ে ফেললে। সে ছাড়া হয়তো পাবে কিন্তু তার মনের উপর কি রকম প্রতিক্রিয়া হবে বুঝতে পারছ? এই প্রতিক্রিয়ায় তার সমস্ত জীবনটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। একজন যদি নিরপরাধ প্রমাণ হওয়ার পর

ছাড়াও পায় তাহলেও সে কি স্বাভাবিক থাকতে পারবে কখনও ? পদে পদে বাধা পাবে না সে এই সমাজে ? এ তোমার ভারি অন্যায় হয়েছে ।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, তা এখন মনে তাই হচ্ছে বটে । আগে তো এমন করে ভাবিনি । ঠিক বলেছ রানি, আমার ঘোর অন্যায় হয়ে গেছে ।

৩

কিছুক্ষণ পর কিটু ঘড়ি দেখল। দুপুর গড়িয়ে এখন বিকেল হয়েছে বলা যায়। বলল, এবারে উঠতে হচ্ছে আমাদের। আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। দুপুরে বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া গেল। এতটা আমরা আশা করিনি। এখন না গেলে কাকিমা উদ্বিগ্ন হবেন।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, নিশ্চয় যাবে। আমরা তোমাদের তো সারা জীবন আটক রাখতে পারব না। উইশ ইউ বেস্ট অব লাক্। আমার যত দূর মনে হয় মিহির এতক্ষণে ছাড়া পেয়ে গেছে। যেন তাই হয়। আজই তো বারাসত কোর্টে হাজিরা দেওয়ার কথা। তোমরা ফেরার সময় একবার খোঁজ নিয়ো। একেবারে মুক্তি হবে না, তবে জামিন দেবেই মনে হয়।

—বারাসত? কিটু বলল, বারাসত হয়েই তো আমরা এলাম। আগে জানলে ওর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করা যেত। বেচারা মিহির।

আফজল বলল, জামিনটা দেবে কে? বাড়িতে খবর পাঠাতে হবে তবে না কেউ তদ্বির করবে? ওর কবি বন্ধুরা তো সব সুসময়ের বন্ধু। ওদের আমার খুব চেনা আছে।

—না আফজল, সেটা ঠিক নয়। কিটু বলল, ওদের মধ্যে এক ধরনের ঐক্য আছে। ওদের মধ্যে অনেকেরই পয়সা নেই, কিন্তু হৃদয় আছে। তারা দুরবস্থা মেনেই নিয়েছে। চাকরি পেলেও তারা কবিতা লেখা বন্ধ হয়ে যাবে কিংবা বাধা পাবে ভেবে তারা চাকরি পর্যন্ত পেয়ে ছেড়ে দেয়। মিহিরও তো সেদিন একটা বড় চাকরি ইচ্ছে করেই নিল না। তারা বিপথে চলছে হয়ত, কিন্তু তাদের মন সরল, তারা সৎ। তারা যা করতে চায় তার জন্য যে কোনও রকম কষ্ট স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত।

এমন সময় কয়েকটি ছেলে দৌড়তে দৌড়তে এল উত্তেজিতভাবে। ডাক্তার আদিত্য বললেন, কী ব্যাপার হে তোমাদের?

একটি ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, একটা কালো প্যাঁচা আহত হয়ে ছটফট করছে, ঐ জঙ্গলে, হয়ত ঝড়ে আহত হয়েছিল।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, চলো দেখে আসি। যদি বাঁচানো যায়। একটা গামছা নিলেন সঙ্গে। কিটু ক্যামেরটাকে বার করে দেখে নিল সব ঠিক আছে কি না।

জঙ্গলের দিকে যেতে যেতে কিটুর হঠাৎ মনে হল কথাটা। কালো প্যাঁচা। কালো প্যাঁচা যার মধ্যে আছে এমন এক স্বর্ণমুদ্রা যা মহামূল্য। জাহাঙ্গিরের আমলের সেই মুদ্রার খোঁজ করতে হবে।

ডাক্তার আদিত্য প্যাঁচাটিকে পরীক্ষা করলেন। একটা বড়সড় প্যাঁচা, কালো রং ঠিক নয়। ধূসর রং, তবে একটু গাঢ়। প্যাঁচাটি ছটফট করছিল। ডাক্তার আদিত্য প্যাঁচাটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে যেতেই প্যাঁচাটা কর্কশভাবে ডাকল।

আবার ঠোকর দিতেও চেষ্টা করল। ডাক্তার আদিত্য গামছাটা দিয়ে প্যাঁচাটিকে ঢেকে দিলেন, তারপর কৌশলে আস্তে আস্তে কিন্তু দৃঢ়ভাবে একটা প্যাকেটের মতো করলেন। হেসে বললেন, প্যাঁচা যখন ঠোকরাতে চেষ্টা করছে তাতে মনে হয় বেঁচে যাবে। সম্ভবত পায়ে কিছু একটা আঘাত লেগেছে। যত্ন করলে সেরে যেতে পারে। কিট্টু প্যাঁচটার কয়েকটা ছবি তুলে নিল।

কিট্টু বলল, ডাক্তার আদিত্য, আমরা তাহলে আসি আজ ? খুবই উপকৃত আপনার কাছে।

কিট্টু জাহাঙ্গিরের সোনার মুদ্রার কথাটা তুলবে ভেবেও চুপ করে গেল। আগে দেখা দরকার ব্যাপারটা সবাই জানে কি না। ডাক্তার আদিত্য বললেন, যাচ্ছ—তা তোমাদের তো যেতেই হবে। কিছু দরকার হলে আমাকে বলবে, কেমন ? তারপর একটু চাপা গলায় বললেন, মাধবলালবাবুর বাড়ির সব মানুষই কেমন যেন অদ্ভুত। তাদের মতিগতি সব সময়ে বোঝা যায় না।

কিট্টু চলতে চলতে ভাবতে লাগল, ডাক্তার আদিত্য এ কথা কেন বললেন ? এ জগতে মতিগতি কারই বা বোঝা যায় ? সবাইকেই তো অদ্ভুত বলা যায় এক হিসেবে।

কিট্টু ভাবল এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বারাসতে গিয়ে জেনে আসতে হবে ব্যাপারটা। আশা মিহিরকে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ, কিংবা জামিনের ব্যবস্থা হয়েছে।

আফজল কিছু কিছু নোট নিচ্ছিল তার ছোট খাতায়। গণপ্রভাতের পাঠকদের জন্য উত্তেজক কোনও বিষয় এখন পর্যন্ত পায়নি বলে তার মনটা উসখুস করছিল। বেশি তো সময় নেই। এর মধ্যে কিছু তথ্য পাওয়া দরকার যার উপর ভিত্তি করে চমকপ্রদ কিছু একটা লেখা যায়। ব্যাপারটা খুন নয়। মাধবলাল আচার্যকে কেউ খুন করেনি। এক হিসেবে এটাকে আত্মহত্যা বলা যায়। তবে সজ্ঞানে নয়। আফজল কথাটা নিয়ে ভাবতে লাগল। আত্মহত্যা কখনো সজ্ঞানে নাও হতে পারে ? যিনি নিজের জীবন নিজেই শেষ করেন তিনি কি তা জানেন না ? তা কেমন করে হয় ?

—এইবার বোধহয় পৌঁছে গেছি। ঐটেই মাধবলাল আচার্যের বাড়ি বলে মনে হচ্ছে। বাড়িটা দোতলা, তবে একতলাটা বিরাট, দোতলায় মনে হয় খান দুয়েক ঘর। বাড়ির সংস্কার হয়নি বহুদিন। চারদিকে কালো এবং সবুজ শ্যাওলা। বাড়ির চারদিকে নারকেল সুপুরি গাছ, আম কাঁঠালেরও কিছু গাছ দেখা গেল। ওদের দেখতে পেয়ে প্রকৃতি ছুটে এল। বলল, এত দেরি কেন হল কিট্টুদা ? আমি এতক্ষণ খালি ভাবছি তোমাদের কথা।

কিট্টু বলল, বাড়ির অবস্থা কেমন ? কাকিমা কোথায় ?

প্রকৃতি বলল, নানা ঝামেলা চলছে বাড়িতে। মর্গ থেকে মৃতদেহ আনতে গেছেন মামারা। মামারা, মানে বড় মামা এবং মেজো মামা। বড় মামার নাম অভিনব, মেজো মামার নাম বিমান। মেজো মামা এখানে থাকেন না। মেজো মামা মামিকে নিয়ে এসেছেন কাল। কাল থেকে চেষ্টা চলছে মৃতদেহ পাওয়ার

জন্য। মর্গের ডাক্তার কাল আসেননি বলে কিছুই হয়নি। বোধহয় মৃতদেহ আজ পাওয়া যাবে।

—তাহলে বাড়িতে মেয়েরাই রয়েছে কেবল ?

—না তা নয়। প্রকৃতি বলল, কিছু আত্মীয় এসেছেন, তাঁরা রয়েছেন। কিন্তু কিট্‌দা, বাড়িতে খুব শোক দেখতে পাচ্ছি না। দুই মামিরই বেশ খুশি খুশি ভাব। আর একটা কথা কিট্‌দা, রাত্তিরে যে ঘরে মিহিরদা ঘুমিয়েছিলেন সে ঘরের কোণে একটা বড় গর্ত দেখা গেছে। একটা সদ্য খোঁড়া গর্ত।

—সদ্য খোঁড়া গর্ত ? কিট্টু বলল। তারপর বলল, না থাক। এর মধ্যে আর জড়াব না নিজেকে। মিহিরকে ছাড়ানো আমার প্রধান কাজ। সুপ্রিয়া পিসি আশা করে আছেন আমি মিহিরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। কে কোথায় মরলেন কি বাঁচলেন, কে খুন হলেন কি হলেন না তা দেখবার আমার দরকার নেই।

আফজল বলল, আমার উদ্দেশ্য কিন্তু অন্য। আমি চাই গণপ্রভাতের সম্পাদককে সন্তুষ্ট করা। তিনি চাইবেন এমন একটা স্টোরি যা লোকে খুব আগ্রহ করে পড়ে।

প্রকৃতি বলল, তুমি এই হত্যা রহস্যের তদন্ত করবে না ? কে মেঝেতে গর্ত খুঁড়ল তা বার করতে চেষ্টা করবে না ? কেন গর্ত খুঁড়ল তা জানতে চাইবে না ? কেন নার্সকে পাওয়া যাচ্ছে না—ওহো, বলতেই ভুলে গেছি, পরশু রাত থেকে নার্সকে পাওয়া যাচ্ছে না।

—নার্সকে পাওয়া যাচ্ছে না ?

—না কিট্‌দা, পাওয়া যাচ্ছে না।

কিট্টু বলল, আমরা আর বাড়িতে ঢুকব না। প্রকৃতি, তুমি কাকিমাকে ডেকে আনো, আমাদের এক্ষুনি যেতে হবে বারাসতে, ওখানে মিহিরদার অবস্থাটা কি জানতে হবে। নার্স কোথায় গেল, কিংবা মেঝেতে কে গর্ত খুঁড়ল, কেন খুঁড়ল ওসব ব্যাপারে আমরা কিছু করব না। আমাদের প্রথম কাজ মিহিরকে দেখা।

কাকিমা নেমে এলেন। বললেন, উঃ বাবা এত দেরি করলি তোরা ? আমি তো তখন থেকেই রেডি হয়ে বসে আছি।

—হ্যাঁ কাকিমা, বড্ড দেরি করে ফেলেছি। আদিত্য ডাক্তারের পাল্লায় পড়ে দেরি হয়ে গেল। ভদ্রলোক কিন্তু বেশ চমৎকার।

—চমৎকার ? কাকিমা বললেন, তা ডাক্তার ভাল হলে কি হবে, লোকটি সুবিধের নয়। প্রতি সপ্তাহে দুবার আসেন, কত নেন জানিস ? এক একবার পঞ্চাশ টাকা।

—তা ভাল ডাক্তারের জন্য ভাল ফি দিতে হবে না ? কিট্টু বলল, ওঁর ফি বেশি নেওয়া ছাড়া আর কোনও ত্রুটি আছে ?

—আছে। কাকিমা বললেন, উনি একেবারেই আধুনিক নন। মিহির মদ টেনেছিল বলে উনি ডেথ সার্টিফিকেটে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। দ্যাখ তো দেখি এদের কত বিপদে ফেলে দিয়েছেন ? কেবল এঁদের ? মিহিরকে আটকে রেখেছে পুলিশ।

—সেটা পুলিশের বাড়াবাড়ি হয়েছে, কাকিমা। একজন বয়স্ক, মানসিক দিক থেকে সুস্থ ব্যক্তিকে মদ দেওয়াটা একটা অপরাধ নয়।

—আর পুলিশের সঙ্গে ঝামেলা করা, ঘুষি দিয়ে পুলিশের নাক দিয়ে রক্ত বার করা, দাঁত নড়িয়ে দেওয়া এ-সব বুঝি অপরাধ নয়?

—তাই করেছে বুঝি মিহির? কিট্টু ভাবল, তাহলেই তো জামিনটামিন পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। মিছিমিছি পুলিশকে মারতে গেল কেন?

কাকিমা বললেন, মিছিমিছি ঠিক নয়। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে গিয়েছিল কোনও ওয়ারেন্ট না নিয়েই। কেউ বাড়িতে থাকলেই তাকে গ্রেফতার করা কি যায়? কে জানে বাবা। তা যদি হয় তাহলে বাড়িসুদ্ধ সবাইকে গ্রেফতার করা হল না কেন? কেউ মদ খেলেই তাকে কি গ্রেফতার করা যায়? ডাক্তার আদিত্য তো তাঁর রিপোর্টে মিহিরকে গ্রেফতার করার কথা বলেননি। ওটা পুলিশ নিজের মাথা খাটিয়ে করেছে। একজন সন্দেহজনকভাবে মারা গেলে যে কোনও একজনকে ধরলেই যেন হল।

কিট্টুরা আর বাড়িতে ঢুকল না। এ ব্যাপারে আফজলের একটু আপত্তি ছিল। ওর যে উদ্দেশ্য ছিল সে ব্যাপারে কিছুই এগনো যায়নি। ভাসা ভাসা একটা রিপোর্ট হতে পারে এই পর্যন্ত। কিন্তু কিছুই তেমন নয়। বাড়ির মধ্যে গর্ত কে খুঁড়ল কেন খুঁড়ল সে ব্যাপারেও তার কৌতূহল হচ্ছিল। হয়ত বাড়িতে ঢুকলে ক্লু পাওয়া যেত কিছু। কিন্তু কিট্টুর কাকিমাও তাগাদা দিচ্ছিলেন, কিট্টুরও ইচ্ছে তাড়াতাড়ি বারাসতে গিয়ে মিহিরকে দেখা। দরকার হলে জামিনের ব্যবস্থা করা।

প্রকৃতি যেখানে গাড়ি থেমে ছিল সেখানে গিয়ে গাড়ি নিয়ে এল। তারপর ওরা সবাই গাড়িতে গিয়ে উঠল।

বারাসতে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই পুলিশের বড়কর্তা একেবারে ফোঁস করে উঠলেন, বললেন, কী সাংঘাতিক কাণ্ড রে বাবা। একজন গুণ্ডাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে যে অত বড় কবি এবং তার যে অত সমর্থক তা কেমন করে জানব? উঃ মশাই, আজ থানায় সে কি দৃশ্য! প্রায় দেড়শো সমর্থক মিহির মৈত্রকে ছাড়তে হবে, কেন কবিকে ধরা হয়েছে অপদার্থ পুলিশ জবাব দাও জবাব দাও! আরে বাবা ওকে কি আমরা শখ করে ধরেছি নাকি? ও আমাদের দুজন কনস্টেবলকে আঁচড়ে কামড়ে ঘুষি দিয়ে যা ক্ষতবিক্ষত করেছে তা দেখলে সোঁদরবনের বাঘও লজ্জায় মাথা নিচু করে গুরু বলে সেলাম করে চলে যাবে। আচ্ছা মশাই, কবিরা এত হিংস্র হয় কেমন করে বুঝিয়ে বলবেন?

কিট্টু বলল, ও তো কোনও অপরাধ করেনি। ও তার আত্মীয়ের বাড়িতে ঝড়ের জন্য রাত্রিবাস করতে গিয়েছিল, এইটেই তার অপরাধ। ঐ একই রাতে মাধবলালবাবুর মৃত্যু হয়।

—মৃত্যু সন্দেহজনক। পুলিশকর্তা বললেন, ডাক্তারের রিপোর্ট আছে।

—হ্যাঁ তা আছে। কিট্টু বলল, কিন্তু তাতে কোথাও কি বলা হয়েছে মিহির

মৈত্রই সন্দেহজনক ব্যক্তি ?

—না। তা নেই। পুলিশ কর্তা বললেন, কিন্তু উনিই মাধবলালবাবুকে তাঁর জীবিত অবস্থায় শেষ দেখেছিলেন, সেই কারণেই পুলিশ ধরেছিল। কিছু অন্যায় হয়েছে, আপনারা বলুন ?

আফজল বলল, আসল কথাটা তো জানা গেল না। মিহিরবাবু এখন কোথায় ?

—তাঁকে ব্যক্তিগত মুচলেকায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এতক্ষণে তিনি বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছেন মনে হয়। ওঁকে মুক্ত করবার ব্যাপারে শ'খানেক গ্যারান্টারও থানায় বসেছিলেন।

—থানায় কেন ?

—আদালত বন্ধ। এই ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেটকে বিশেষ করে আনানো হয়েছিল।

—তাহলে মিহির বাড়ি গেছে ?

—বাড়ি গেছেই এ কথা আমার বলা ঠিক হবে না। তবে ওঁকে বাড়িতে যেতেই বলা হয়েছে। যতদিন না পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া যাবে ততদিন ওঁকে সপ্তাহে দুবার স্থানীয় থানায় রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। কলকাতার কুড়ি কিলোমিটারের বেশি কোথাও যাওয়া বারণ করা হয়েছে, বাড়িতে ছাড়া কোথাও রাত্রিযাপনও করতে বারণ করা হয়েছে।

—তার মানে মাধবলালবাবুর দেহ পাওয়া যায়নি সৎকারের জন্য ?

—তাঁর শরীর মোটামুটি পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে পুরো সন্দেহ কাটেনি বলে ভিসেরা বার করে রাখা হয়েছে। সেটি ফোরেনসিক ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে। সেই রিপোর্ট এলেই রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আফজল বলল, ননসেন্স ! একটা সাধারণ মৃত্যুকে জটিল করে তোলার কোনও অর্থ হয় ?

পুলিশ কর্তা অসহায়ভঙ্গিতে বললেন, এ ব্যাপারে আমিও আপনার সঙ্গে একমত মশাই, কিন্তু এ ব্যাপারে আমার হাত-পা বাঁধা। কিছু করার নেই। আপনাদের ঐ ডাঃ আদিত্য ব্যাপারটাকে নিয়ে অযথা জটিল করে তুললেন। যাক আপনাদের পরিচয় তো দিলেন না ? আপনারা বেশ ভদ্রলোকের মতো কথা কইছেন, তাই ধরে নিচ্ছি মিহিরবাবুর দলের কবি নন। কি, ঠিক বলিনি ?

—ঠিকই বলেছেন। কিট্টু বলল, আমি ওর আত্মীয়, আমার নাম কিট্টু লাহিড়ি। মাঝে মাঝে অপরাধ নিয়ে একটু আধটু মাথা ঘামাই।

পুলিশ কর্তা বললেন, আপনার পেশায় মালের অভাব হবে না, দারুণ দারুণ সব অপরাধ কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে আপনার নাম কোথাও পড়েছি সম্প্রতি। কোনও কেসে আপন সাফল্যের কথাই। ভেবেছিলাম বয়স বেশি। তবে ঐ বিশ্রী নামটা কেন রেখেছেন—কিট্টু কি বাঙালির নাম নাকি ? খালি মনে হয় কুট্টি।

এরপর আফজলের দিকে তাকাতেই আফজল তার কার্ড বার করে পুলিশ

কর্তার দিকে বাড়িয়ে দিল। পুলিশ কর্তা বললেন, অ্যাঁ, সাংবাদিক? গণপ্রভাত। উঃ মশাই আপনারা করতে পারেন বটে অনেক কিছু।

—কি রকম?

—আপনারা তিলকে তো তাল করেনই, তালকেও তিল করেন।

আফজল হেসে বলল, আমার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাবেন না। দোষ সবটা আমার নয়।

—দোষ? পুলিশ কর্তা বললেন, দোষ কোথায় দিলাম। এ তো দারুণ ক্রেডিট। দারুণ ক্ষমতা।

বাইরে বেরিয়ে আফজল বলল, বড় ক্লান্ত লাগছে। আজ বাড়ি ফিরেই টানটান হতে হবে।

কিট্টু বলল, তোমার স্টোরির কি হবে?

আফজল বলল, কি আবার হবে। কাল-টাল আবার আসতে হবে। তবে প্রথমে দেখতে হবে মিহির বাড়িতে ফিরেছে কিনা। ফিরলেও কি অবস্থায় আছে। যদি ওকে নিয়ে ছোট্ট একটা স্টোরি করা যায় পুলিশের বিরুদ্ধে মন্দ হয় না, তবে প্রথমেই পুলিশের বিরুদ্ধে লিখলে ওরা ঝামেলাও করতে পারে। দেখা যাক।

প্রকৃতি আর কাকিমাকে বাড়িতে পেঁছে দিয়ে ওরা যখন মিহিরের বাড়িতে পেঁছিল তখন সন্ধে হয়ে গেছে। সুপ্রিয়া পিসি বললেন মিহির বিকেল থেকে ঘুমুচ্ছে। তোর পিসেমশাই ভয়ঙ্কর রেগে গেছেন ওর এই ব্যাপারে। তা ওর কোনও দোষ নেই, ওকে মিথ্যে মিথ্যে ধরতে গিয়েছিল পুলিশ।

একটু পর মিহির চোখ মুছতে মুছতে উঠে এল। বলল, কিট্টুদা, উঃ কি সাংঘাতিক পুলিশ, আর কি সাংঘাতিক হাজতের মশা। এক-একটা প্রজাপতির মতো বড়। সারারাত ঘুমুতে দেয়নি, এক লিটার রক্ত খেয়ে নিয়েছে। তার উপর পুলিশের সে কি হম্বিতম্বি। বলে মিহির হাসতে লাগল।

কিট্টু বলল, হাসির ব্যাপার নয় মোটেই। তোর বিরুদ্ধে যেটা বড় চার্জ, সেটা করতে পারবে না। করলেও কিছু হবে না। কিন্তু তুই মদ খেতে গেলি কেন? ওই চার্জ থেকে বেরিয়ে আসা শক্ত।

সুপ্রিয়া পিসি বললেন, কবি হতে গেলে নাকি মদ খেতেই হয় উনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। তুই একটু ওকে বকে দে তো।

মিহির বলল, আমি তো এইটুকুনি মদ খাই। বলে সে আঙুলের সাহায্যে ইঙ্গিতে যা বোঝাল সে পরিমাণ খেলে একটা ইঁদুরেরও নেশা হওয়ার কথা নয়।

মিহির বলল, তাও বছরে দু-চারবারের বেশি নয়। এমনিতে মদ আমার ভারি বিচ্ছিরি লাগে, সত্যি কথা বলছি মা, খুব বিচ্ছিরি লাগে, কিন্তু সকলেই যেখানে মদ খাচ্ছে সেখানে এইটুকুনি কেবল মুখে দিই। আবার সে আঙুল দিয়ে পরিমাণ দেখাল।

আফজল বলল, আর তুমি দুজন পুলিশকেও এইটুকুনি মেরেছ, তাই না?

মিহির বলল, ওরা কেন আমাকে গ্রেফতার করতে এল? ওরা কেন আমাকে

ঘুম থেকে তুলল, ওরা কেন আমার হাত মুচড়ে দিল, আমার রাগ হবে না? রাগ হল বলেই তো আমি ফাইট দিলাম। আচ্ছা কিট্টুদা মদ খেয়ে পুলিশকে পিটলে কি শাস্তি হতে পারে?

কিট্টু বলল, কে জানে। তবে জরিমানা এবং কারাদণ্ড দুই-ই হতে পারে।

মিহির বলল, বিচারপতিকে যদি বুঝিয়ে বলি সব?

কিট্টু বলল, আমি জানি না।

সুপ্রিয়া পিসি বললেন, তোরা সব কথা বল, আমি কিছু খাবারের ব্যবস্থা দেখিগে। এদিকে নিয়তি চলে গেছে বাড়ি। পরশু আসবে। সব একাই করতে হচ্ছে।

সুপ্রিয়া পিসি চলে গেলে কিট্টু বলল, তুই ও বাড়িতে গেলি কেন?

মিহির বলল, উনি যে আমার আত্মীয় তা আমি জানতাম না। গত বছর পেঁচো আর মংলা যখন বলল ভুবনচরায় প্রচুর কবি আছে এবং একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার কবিতা পছন্দ করেন তখন আমি ভারি আশ্চর্য হয়ে যাই। তারপর গত বছর ভুবনচরায় যাই, সেদিন ছোটখাটো একটা কবি সম্মেলন হয়। সেই সময় ওখানে গিয়ে শুনতে পাই তিনি ভুবনচরায় নেই, দু-দিনের জন্য কলকাতা গিয়েছেন ডাক্তার দেখাতে। তাই এ বছর যখন ভুবনচরায় যাই—এ বছরে একটা কবি সম্মেলন ছিল—তখন আগেই স্থির করেছিলাম ওঁর সঙ্গে দেখা করব। এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নাম মাধবলাল আচার্য। উনি যে প্রকৃতির মায়ের বাবার পিসতুতো ভাই হন তা জানতাম না। যাই হোক ওখানে পেঁছিনোর আগে থেকেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরু হয়। আমরা একটা মিনিবাস ভাড়া করে গিয়েছিলাম, এক রাত্তির ওখানে থাকারও প্রোগ্রাম ছিল, কিন্তু ঝড়ে সব তোলপাড় করে দেওয়ায় যে যার পারল দৌড়ে গিয়ে মিনিবাসে উঠল, আমিও দৌড়ুলে মিনিবাসটা ধরতে পারতাম, কিন্তু কিছুটা দৌড়িয়ে পরে ইচ্ছে করেই গেলাম না। ওখানে আমার এক বন্ধুও ছিল—সে আমাকে প্রথমে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। পরে সন্ধে সাতটা নাগাদ মাধবলাল আচার্যের বাড়িটা দেখিয়ে দিল। আমিও ঝড়ের মধ্যে ঐ বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। শুনলাম উনি অসুস্থ, কারু সঙ্গে দেখা করেন না। আমার কি দরকার প্রশ্ন করলে ওঁর ছেলে বললেন, আপনি বসুন আমি জিজ্ঞেস করে আসছি। আমি তখন তাঁকে আমার একখানা বই ওঁকে দেওয়ার জন্য দিলাম। প্রায় ভিজেই গিয়েছিল বইটা। আমার থলের মধ্যে ছিল দুটো বোতল। বড় নয় হাফ। ঝড়ের মধ্যে সকলে তখন ছুটছে, তাঁবু প্রায় উড়ে যায় যায় তখন আমি বুদ্ধি করে দুটো বোতল থলের ভরেছিলাম। এখন দেখছি ঐ দুই বোতলের জন্য ঝামেলায় পড়েছি পরে। কিন্তু তখন কেমন করে বুঝব যে…।

—তারপর? কিট্টু প্রশ্ন করল।

—তারপর অদ্ভুত ব্যাপার। মাধবলালবাবু নিজেই এসে পড়লেন আমি যেখানে বসে ছিলাম সেখানে। বললেন, এসো এসো ভাই মিহির। আমি তোমার কবি প্রতিভায় মুগ্ধ। সং ও সংজ্ঞা বলে একটা কাগজে তোমার কটা কবিতা

আমার যে কি ভাল লেগেছে বলে বোঝাতে পারব না। তুমি যে আমার বাড়িতে অতিথি হবে সে আমার সৌভাগ্য। অতীব সৌভাগ্য। এখানে কোথায় এসেছিলে? ও বুঝেছি, এখানকার কবি সম্মেলনে! তা বেশ তো বেশ। ভালই হল। একা একা আমার ভারি খারাপ লাগে। কেউ আসে না এদিকে বুঝলে? শিক্ষিত লোক বেশি থাকে না এই অঞ্চলে। আর থাকবেই বা কেন! এখানে আছেটা কি? ভাই মিহির তুমি যখন এসেই পড়লে তখন রাত্তিরটা থেকে যাও। রাতভর আমরা গপ্পো করব। আহা, এদিকে একটা ভদ্রলোক পাই না। আমি বললাম একটু পরে আমার বন্ধু এসে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাবে, তাই শুনে ভদ্রলোকের সে কি আফশোস—তিনি বললেন, তাঁর বাড়িতে থাকা কি একেবারেই সম্ভব নয়? আমি আমার বন্ধুকে বলেছিলাম তার বাড়িতেই থাকব, তাই বললাম মাধবলালবাবুকে। তিনি বললেন, আমি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি ওর কাছে। আমি ওকে চিনি। কাল সকালেই ওর কাছে চলে যেয়ো। আজ তোমাকে ছাড়ছি না।

কি আর করি। বুড়ো মানুষ, তার উপর তিনি আমার কবিতা পছন্দ করেন। আমারও ওঁকে ভারি ভাল লেগে গেল। জানতে পারলাম অনেক বছর আগে তিনিও কিছু কিছু কবিতা লিখেছেন, তবে কখনও ছাপানো হয়নি। এই সময় আমার ব্যাগের দুটো বোতলে ঠোকাঠুকি হয়ে আওয়াজ হতেই মাধবলাল-বাবু বললেন, ও কি হে তোমার ঝোলায়? আমি বললাম, ও আমার ওষুধ। উনি বললেন, দেখি দেখি কি ওষুধ।

আমি দেখালাম। দুটো চ্যাপটা বোতল দেখে বললেন, শয়তানরা আমাকে এই ওষুধ খেতে দেয় না। এর মধ্যে ওঁর নার্স রাধাময়ী দুটো বোতল টেবিলে দেখে সে কি তাঁর মর্মভেদী কথাবার্তা, আর সে কি আবেদন। তিনি বললেন, ডাক্তার পই পই করে বারণ করেছেন মদ খেতে। মদ ওঁর পক্ষে বিষ। আমি বললাম, তা হলে আমি ওঁকে মদ দেব না। আমি থলেটায় দুটো বোতল ভরে চেয়ারের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখলাম। তারপর কয়েক মিনিট পর খাওয়ার ডাক এল। আমাকে বেশ যত্ন করেই খাওয়ালেন মাধবলালবাবুর বড় ছেলে অভিনববাবুর স্ত্রী হরিপ্রিয়া দেবী। খেয়ে-টেয়ে ঘরে ঢুকে দেখি একটি বোতল খুলে তার অর্ধেকটাই তিনি সাবাড় করেছেন, তিনি অর্থাৎ মাধবলালবাবু। তিনি বললেন, ও হে দেবদূত, এই চমৎকার অমৃত তুমি এনেছ। এসো বাকিটা তুমি পান করো।

আমি আর কি করি। উনি গুরুজন, তাই তাঁর কথা অমান্য করলাম না। ওঁর সঙ্গে তারপর কাব্য আলোচনা শুরু হল। দেখলাম পুরনো আমলের বহু কবিতা তাঁর মুখস্থ। এ ছাড়া নতুন কবিদের কিছু কবিতাও তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করেছে দেখলাম। তিনি আমার ঐ ভিজে বইটা নিয়ে খুলতে গিয়ে কয়েকটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ফেলে বললেন, আহা—কি মুশকিল। আমি তখন আমার ঝোলা থেকে একটা লিট্‌ল ম্যাগাজিন বার করলাম, সং ও সংজ্ঞা-র কবি সম্মেলন সংখ্যা। তাতে আমার ছটা কবিতা ছিল। ভাগ্যিস ম্যাগাজিনটা বৃষ্টিতে তেমন ভেজেনি। সেটি পেয়ে তিনি উল্টে-পাল্টে দেখে পড়তে লাগলেন আমার কবিতা।

দাঁড়াও আমি পড়ে শোনাচ্ছি কবিতাটা, ঠিক যেমনভাবে তিনি পড়েছিলেন। এই বলে মিহির তার ঘর থেকে একটা চমৎকার মলাটওলা ম্যাগাজিন নিয়ে এসে কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টে তার কবিতাটা বার করে পড়তে লাগল :

হে কবি কবিবর কবিবরবর
বর্বর এ বিশ্বে শোন হে তোমরা
চ চ্চ চ্চচ ক্ক-ক-চ্চ
সোনার খাটেতে বসেছে ভোমরা

কিট্টু আর আফজল বলল, কি যা তা পড়ছ। ঠিক মতো পড়। চ চ্চ চ্চ চ চ্চ চ ক্ক-ক-চ্চটা আবার কি বস্তু ?

মিহির বলল, ওটা কোনও বস্তুই নয়। যে প্রেসে ম্যাগাজিন ছাপা হয়েছিল তাদের নতুন কম্পোজিং মেশিন একটু বিগড়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি ছাপানো হয়েছে বলে প্রুফ দেখার সময় পাওয়া যায়নি। সমস্ত ইস্যুটাই ঐ রকম কিম্ভূত ছাপার ভুলে ভর্তি। কিন্তু মাধবলালবাবুর ঐ সবই ভাল লেগে গেল। তিনি ঐ রকম সব ছাপার ভুল পড়েন আর বলেন আহা কী ভাব। কী ব্যঞ্জনা। আধ বোতল টেনেই তাঁর কথা জড়িয়ে গিয়েছিল।

—আর তোমার কী হয়েছিল ?

—কিট্টুদা, সে কি বলব কি হয়েছিল। অত কড়া জিনিস একেবারে সোডাটোডা না দিয়ে খেয়ে আমারও মনে হতে লাগল আই অ্যাম দি মনার্ক অব অল আই সার্ভে। আমারও মজা এসে গিয়েছিল। আমি ওঁর হাত থেকে ম্যাগাজিনটা নিয়ে পড়লাম আমার আর একটা :

টংকা মোর হাতে নেই আকাশেতে ফুটে ওঠে ধনুকের অশেষ টংকার / লাংকার ডাল ভাত, পেটে মোর ঘংং চকরকররর

এই শুনে মাধবলালবাবু বললেন, এই না হলে কবিতা। আহা, কী ভাব, কী ব্যঞ্জনা। আর আমারও মনে হল সত্যি যেন আমি আকাশের মেঘের ভেতর দিয়ে উড়ে চলেছি।

এরপর কিছুক্ষণ গেল। মনে হল বাইরে ঝড় কিছু কমেছে, বৃষ্টিও। এই সময়ে যে গরম হয় তার চিহ্ন কোথাও নেই। শোঁ শোঁ আওয়াজ হচ্ছে। আমি ক্লান্ত হয়ে বললাম, মাধবলালবাবু, আমি শুতে যাই, বড় ঘুম পাচ্ছে।

পাশের ঘরেই আমার জায়গা করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে শুতে গেলাম। দ্বিতীয় বোতলও তখন প্রায় শেষ। এর পরই সুপ্রিয়া পিসি ডাকলেন, ওরে তোরা খাবি আয় সব'।

৪

এর পর পনেরো দিন কেটে গেছে। কোনওদিকে বিশেষ কিছু এগোয়নি। আফজল একটা মামুলি রিপোর্ট লিখেছিল তাতে গণপ্রভাতের চিফ রিপোর্টার শৈলেনবাবু খুব খুশি হননি। সেটি তিনি ফাইলবন্দি করে বলেছিলেন, তোমার দোষ নেই। আসলে এর মধ্যে এমন কিছু নেই যা নিয়ে কিছু উত্তেজনা সৃষ্টি করা যায়। যাক্‌গে, কি আর করা যায়। আফজলের শরীরও বিশেষ ভাল যাচ্ছিল না। পায়ের একটা আঙুলে কি একটা কাঁটা ফুটে গিয়েছিল ভুবনচরায়। সামান্য একটা কাঁটা, সেটা সে তখুনি তুলে ফেলেছিল, কিন্তু পরে আঙুলটা ফুলে যায়। ওষুধ খেয়ে ফোলাটা কমে যায় কিন্তু জায়গাটা এখনও হঠাৎ হঠাৎ খচ খচ করে ওঠে। কিটুর সঙ্গেও তার আর দেখা হয়নি, তবে দু দিন আগে কিটু জানিয়েছিল তার টেলিফোন আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে। মিহিরকে সে ফোন করে জিজ্ঞেস করেছে নতুন কিছু ঘটনা ঘটেছে কি না। মিহির বিরক্তির সঙ্গেই জবাব দিয়েছে, আবার নতুন কি ঘটবে আফজলদা। সপ্তাহে দু দিন থানায় গিয়ে হাজিরা দিতে হচ্ছে। মহা বিরক্তিকর ব্যাপার। কবে আমার এই শাস্তি মকুব হবে বলো তো। একটা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাঠাতে কত দেরি হয়? আফজল বলেছে, সেটা নির্ভর করে ডাক্তারের উপর, তার উপর কি ধরনের কেস্‌ সেটার উপরও অনেকটা। কখনও দু তিন মাসও লেগে যেতে পারে স্রেফ গাফিলতির জন্য। কিংবা ধরো টাইপ রাইটারটি খারাপ, টাইপিস্ট ছুটিতে, অনেক রকম কারণ থাকতে পারে। তা তুমি উদ্বিগ্ন হচ্ছ কেন মিহির, এই সুবাদে দু পাঁচ জন পুলিশের সঙ্গে তোমার চেনা পরিচয় হয়ে যাচ্ছে, সেটাই বা মন্দ কি। মিহির বলল, সেটা হচ্ছে, কিন্তু আমার স্বাধীনতা বলে কিছু থাকছে না। এই তো নভেম্বরের গোড়ায় পুরুলিয়ায় আমাদের একটা জমায়েতের কথা আছে। সেখানে চার দিনের একটা ওয়ার্কশপ মতো হবে। আমেরিকার এক কবি আসছেন সেখানে, তা ছাড়া গুজরাট আর তামিলনাড়ু থেকেও জনা ছয়েক কবি আসছেন। ভারি একটা চমৎকার আয়োজন, কিন্তু আমি যেতে পারব না। মানে আমাকে কলকাতার মধ্যেই থাকতে হবে। কলকাতার কুড়ি কিলোমিটারের মধ্যে আমাকে আটকে থাকতে হবে। এটা কি ভাল ব্যাপার?

আফজল বলল, পুলিশ এ-সব কেসে অনুমতি দেয় বোধ হয়। তুমি একটা আবেদন করো, হয়ে যাবে।

এরও দু দিন পর একটা খবর পেয়ে আফজল স্তম্ভিত হয়ে গেল। সেদিন অফিসে বসে সে বড়বাজারে বিরাট এক ভেজাল কারখানা আবিষ্কার নিয়ে ছোট একটা খবর লিখছে। রাত তখন প্রায় এগারোটা। এইটে লিখেই সে একটু গড়িয়ে নেবে বলে ভাবছে। আজই আবার তার পায়ের ওই ব্যথা আঙুলের উপরই বাসে একজন মাড়িয়ে দিয়েছে। একটা মলম লাগিয়েছে বটে কিন্তু বেশ টন টন করছে। এমন সময় টেলিফোন বাজল। আফজল টেলিফোনের

রিসিভারটি কানে লাগিয়ে ক্লান্তভাবে বলল, হ্যালো।

—কে আফজল? কিট্টুর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আজ বিকেলে মিহিরকে অ্যারেস্ট করেছে। খবর আসেনি তোমাদের কাছে?

—নাঃ খবর এখনও আসেনি। ব্যাপার কি?

—ব্যাপার সাংঘাতিক। মাধবলালবাবুর পোস্টমর্টেম রিপোর্টে পেটে বিষের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

—অ্যাঁ বলো কি? আফজল বলল, এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার?

কিট্টু বলল, আমি আজ বিকেলে বাড়িতে ছিলাম না, তাই জানতে পারিনি। একটু আগে জানতে পারলাম। দুপুর নাগাদ রিপোর্ট বেরয়। বিকেলেই মিহিরকে ধরেছে।

আফজল বলল, স্ট্রেঞ্জ।

কিট্টু বলল, ব্যাপার তাহলে ভারি ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল। এখন আমাদের কি কর্তব্য?

আফজল বলল, একজন নিরপরাধ ছেলে এ ভাবে জড়িয়ে পড়বে ভাবা যায় না। পুলিশ তো এখন ওকে সহজে ছাড়বে বলে মনে হয় না। জামিন পাওয়া শক্ত হবে।

কিট্টু বলল, কি হবে আফজল? সুপ্রিয়া পিসি তো কান্নাকাটি শুরু করেছেন। পুলিশের ধারণা মাধবলালবাবুকে হত্যার উদ্দেশ্যেই মিহির মদের বোতলে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। সেই বিষ খেয়েই মাধবলালবাবুর মৃত্যু হয়েছিল। ওঁর হৃৎপিণ্ড দুর্বল ছিল ঠিকই, কিন্তু কেবল মদ খেয়ে তাঁর মৃত্যু হয়নি, সঙ্গে বিষও ছিল।

—বিষ। আফজল বলল, কি বিষ?

—সায়ানাইড অব পটাসিয়াম।

—সাংঘাতিক ব্যাপার তো। আফজল বলল, কিন্তু এ কাজ কে করল? কিট্টু বিষাদকণ্ঠে বলল, সেটাই তো···। তারপর বলল, কিচ্ছু ভাল লাগছে না।

আফজল বলল, মনে ফুর্তি আনো—এখনই তো কাজটা করতে হবে। মিহিরকে বাঁচাতে হবে। বাঘাকাকা কি বলেন?

কিট্টু বলল, বাঘাকাকা সব শুনেছেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছেন না। তবে একটা আশার কথা আছে।

—আশার কথা? বলো বলো।

কিট্টু বলল, ওই রাত, অর্থাৎ অক্টোবরের ছ তারিখ, মনে আছে তো তোমার —সেই প্রলয়ংকর ঝড়ের রাতে ওই বাড়িতে আরও একটা নাটকীয় অন্তর্ধান হয়ে গেছে। ওই রাত থেকেই, কিংবা বলতে গেলে তারপর দিন সকাল থেকেই নার্স রাধাময়ী ও বাড়ি থেকে উধাও।

আফজল বলল, সেটা একটা আশার কথা। অর্থাৎ নার্স রাধাময়ীও এই কাজটা করে থাকতে পারে। এই কাজটা করে সে পালিয়ে গিয়েছে। ঠিকই বলেছ কিট্টু। তবে বাঘাকাকার সঙ্গে পরামর্শ করো, উনি নিশ্চয় কিছু একটা

পথ বাতলাতে পারবেন।

কিট্টু বলল, সকাল হলেই তুমি একবার চলে আসবে এখানে। দু জনে মিলে কিছু ঠিক করতে হবে। আবার জামিনের জন্য চেষ্টা করতে হবে, করতেই হবে। এক রাত হাজতবাস করেই যে অভিজ্ঞতা তার হয়েছে তা অতি ভয়াবহ। হাজতঘরে বিচ্ছিরি বদ গন্ধ, মশা মাছি ছারপোকা, তার উপর সারারাত পুলিশের লোকদের হই-হল্লা আর তাস খেলা, বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি সব গালা-গাল।

আফজল ভাবল হাজতঘর নিয়ে একটা জ্বালাময়ী কিছু লেখা যায় কি না। সে বলল, ঠিক আছে কিট্টু সকাল হলেই যাব। কিছু ভেবো না, দুশ্চিন্তা একদম নয়। এখন পরিষ্কার চিন্তা করার সময়। একটা জিনিস জেনে রেখো, মিহির সম্পূর্ণ নিরাপরাধ, তা হলেই দেখবে অনেক কিছু সহজ হয়ে আসছে।

কিট্টু বলল, কাকিমার ধারণা···। কিন্তু সরাসরি লাইনের টেলিফোন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। আফজল দশবার রিসিভার দিয়ে টেলিফোনটা ঠুকল। কিন্তু তাতেও টেলিফোন প্রাণ ফিরে পেল না। তখন সে অন্য একটা টেলিফোনে অপারেটরকে বলল কিট্টুর নম্বরটা চেষ্টা করতে। কিন্তু কয়েক মিনিট চেষ্টা করেও কোনও লাভ হল না। আফজল তখন পুলিশকে ফোন করল কোনও বিশেষ খবর আছে কি না জানার জন্য। পুলিশ থেকে গোটা তিনেক দুর্ঘটনার খবর দিল, আফজল সেগুলিকে লিখে ফেলে হাই তুলল। এবার নিদ্রা দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

পরদিন সকাল সাতটার আগেই আফজল কিট্টুর বাড়িতে গিয়ে হাজির। কিট্টু অনেক আগেই উঠে পড়েছে। ও বাড়িতে এখনও কাগজ দিয়ে যায়নি। আফজল তার ঝোলা থেকে গণপ্রভাত-এর কপি একখানা কিট্টুকে দিয়ে বলল, এক কাপ চা পেলে ভাল হত। কিট্টু খবরের কাগজটিতে একবার চোখ বোলাল। আফজল বলল, বাঘকাকাকে ঘুম থেকে তুলে দিই।

কিট্টু বলল, ঘুম থেকে তুমি ওঁকে তুলবে কি ? সেই কোন্ সকালে উঠেছেন এখন বাজারে গেছেন। এলেই চায়ের ব্যবস্থা হবে।

আফজল বলল, কাল ফোনটা কেটে গেল। কাকিমা কি বলছিলেন ?

কিট্টু বলল, কাকিমা বলছিলেন এই রহস্যের মূলে রয়েছে কালো—প্যাঁচা। এবং তিনি এও বলেছেন ওই বাড়িতে যাঁরা যাঁরা ছিলেন সে রাতে, এক মিহির ছাড়া প্রত্যেকেরই এই খুনে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা।

—মাধবলালবাবুর কোনও উইল ছিল কি ?

—ওঁর একটা আলমারিতে তিনি তাঁর যাবতীয় দরকারি জিনিসপত্র রাখতেন। সেই আলমারিটা খোলা যায়নি।

—কেন খোলা যায়নি ?

—প্রথমে চাবিই পাওয়া যায়নি তার। পরে সেটি পাওয়া যায় তোশকের তলায় খাটের কাঠ কেটে একটা ছোট বাক্স বসানো ছিল। চাবিটা সেখানেই ছিল।

—চাবিটা কে আবিষ্কার করেছিল ?

—পুলিশ।

আফজল বলল, পুলিশ আলমারি খোলেনি ?

—না।

—কেন ?

—পুলিশের সে অধিকার ছিল না বলে। পুলিশ বিশেষ আদেশ ছাড়া সেটা করতে পারে না।

আফজল বলল, তাহলে চাবিটা পুলিশ কার হাতে তুলে দিল ?

—কারু হাতেই না। যেহেতু ব্যাপারটা সন্দেহজনক সে জন্য যেখানকার চাবি সেখানেই রয়ে গেছে।

—তার মানে বাড়ির যে কেউই এখন ওই আলমারি খুলতে পারে ?

—না তাও পারে না। কিট্টু বলল, পুলিশ দরজাতেই তালা দিয়ে রেখেছে।

—কিন্তু কেন ?

কিট্টু বলল, যে পুলিশ অফিসারই এটা করে থাকুন না কেন এটা ভাল কাজই হয়েছে নিঃসন্দেহে। পুলিশ খুন ছাড়াও আর একটা সম্ভাবনার কথা খতিয়ে দেখছে।

আফজল বলল, আত্মহত্যা ?

কিট্টু বলল, হ্যাঁ। এটা আমাদের কারুই খেয়াল হয়নি। ভেবে দ্যাখো মাধবলাল আচার্যের অবস্থা। বৃদ্ধ বয়স, অসুস্থ শরীর। ছেলেদের সঙ্গে সদ্ভাব নেই। তিন ছেলে থাকলেও তিনি প্রায় একাই। এই অবস্থায় তিনি নিজের জীবন নিজের হাতে নেবেন এটা খুব স্বাভাবিক।

আফজল বলল, খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু একটা ব্যাপার আছে। মাধবলালবাবু তো কোনও চিঠি লেখেননি সে বাবদ ?

—না।

—সেটা কি সম্ভব ? মনের দিক দিয়ে সুস্থ কোনও ব্যক্তি চিঠি না লিখেই কি নিজের জীবন শেষ করবেন ?

কিট্টু বলল, একটা কথা আফজল ভাবতেই হচ্ছে, তা হল কোনও শারীরিক অসুস্থ, বাতে প্রায় শয্যাশায়ী ব্যক্তির মন সুস্থ থাকতে পারে কি না। তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে—কোনও লোক সুস্থ মন নিয়ে আত্মহত্যা করতে পারে কি না।

আফজল বলল, তা ঠিক। নিজেকে শেষ করার আগে চিঠি কেউ লেখে, কেউ লেখে না। কিন্তু আমার ধারণা তিনি চিঠি লিখে গেছেন। সেটা আলমারিতে থাকতে পারে।

কিট্টু বলল, আলমারিতে তাঁর উইলও পাওয়া যেতে পারে। পুলিশ এই কারণেই ঘরের দরজায় তালা দিয়ে সিল করে দিয়েছে।

আফজল বলল, আত্মহত্যা করুন বা না করুন তিনি উইল করেছেন বলেই

মনে হয়। আফজল হাসল। বলল, কারু সম্পত্তি দেওয়ার জন্য উইল না করে ইনি হয়ত না দেওয়ার উইলও করতে পারেন। মাধবলালবাবুর সম্পত্তি কি রকম ছিল ?

কিট্টু বলল, তা মোটামুটি মন্দ ছিল না। বাঘাকাকা যা জানতে পেরেছেন তাতে মনে হয় ব্যাঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিট থেকে মাসে তিন হাজার টাকার উপর আয় হত। এ ছাড়া কয়েকটা বড় কোম্পানির শেয়ারও ছিল, তারও আয় বছরে কুড়ি পঁচিশ হাজার টাকা ছিল।

আফজল বলল, বাঘাকাকা জানতে পেরেছেন ? মানে এই ব্যাপারে বাঘাকাকা তা হলে লেগে পড়েছেন ?

কিট্টু বলল, প্রথম থেকেই বাঘাকাকা ভয়ঙ্কর মুষড়ে পড়েছিলেন মিহিরের ব্যাপারে। তিনি এর মধ্যে দু বার ভুবনচরায় গিয়ে কিছু কিছু খোঁজ খবর নিয়েছেন।

আফজল বলল, ব্যস। তাহলে নিশ্চিন্ত।

কিট্টু বলল, বাঘাকাকা কিন্তু নিশ্চিন্ত নন। বাঘাকাকা মনে করেন ব্যাপারটা ভারি গোলমেলে। আগে অবশ্য জানতেন না বিষই, মারাত্মক সায়া-নাইড অব পটাসিয়ামই মাধবলালবাবুর মৃত্যুর কারণ। সেটা জানতে পেরে তিনি ভারী গোলমালে পড়ে গেছেন।

এমন সময় বাঘাকাকা একটা ট্রেতে করে চমৎকার সব খাদ্য এবং চা এনে ঘরের টেবিলেই রেখে দিলেন। আফজল বলল, বাঘাকাকা, ব্যাপারটা ভারি জটিলই হয়ে দাঁড়াল। মাধবলালবাবুর ব্যাপারটা এ রকম দাঁড়াবে তুমি কি ভেবেছিলে আগে ?

বাঘাকাকা বললেন, না, আফজলবাবু !

—তোমার কি মনে হচ্ছে ?

বাঘাকাকা বললেন, আলমারি খোলার আগে অনেক কিছুই রহস্যময় হয়ে থাকবে। সবচেয়ে যেটা বড় কথা, সেটা হল কালো প্যাঁচা। সেটা কিন্তু কেউ দেখেনি এ যাবত। আলমারিতে কালো প্যাঁচা থাকার সম্ভাবনাই বেশি, যদি সেটা ওই বাড়িতেই থাকে অবশ্য। আরও একটা জায়গায় কালো প্যাঁচা থাকতে পারত।

—কোথায় ?

বাঘাকাকা জবাব দিলেন না। চায়ের কাপ দুটো টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখলেন। ক্যাপসিকাম দেওয়া ওমলেট আর টোস্টও সঙ্গে। এ ছাড়া রয়েছে বাঘাকাকার নিজের ফর্মুলায় তৈরি রসগোল্লা-কেক। এ তাঁর আশ্চর্য উদ্ভাবন। ইন্দোইউরোপীয় ডিশ। এর নাম কিট্টু দিয়েছে জিরোপিঠে! জিরো হচ্ছে গোল্লা।

বাঘাকাকা আপন মনেই বললেন, মিহিরবাবুকে মিছিমিছি কষ্ট পেতে হচ্ছে। কাল আদালতে একজন ভাল উকিল দিতে হবে যাতে এবারেও জামিন মঞ্জুর হয়।

—আচ্ছা বাঘাকাকা। কিট্টু প্রশ্ন করল, মাধবলালবাবুকে মেরে কার লাভ বেশি?

বাঘাকাকা বললেন, এই একটা অতি আশ্চর্য ব্যাপার কিট্টুবাবু। এই খুন, যদি এটা খুনই হয়ে থাকে অবশ্য, তাহলে লাভ কার নয়? ভেবে দেখ ওই বাড়ির প্রত্যেকেরই মোটিভ আছে। ওঁর টাকা এবং সম্পত্তির পরিমাণ কম ছিল না। আমাদের দেশে যে পরিমাণ টাকার জন্য মানুষ খুন হয় সে হিসেবে একজন কেন পনেরো জন লোককে খুন করাও সম্ভব। মাধবলালবাবুর মৃত্যুতে যা দেখা যাচ্ছে একমাত্র মিহিরবাবুরই লাভ হয়নি। অথচ বেচারা তিনিই ধরা পড়লেন। একেই বলে ভাগ্য।

—এখানে একটু বসবে বাঘাকাকা? কিট্টু বলল।

বাঘাকাকা একটা চেয়ার টেনে নিলেন।

—আচ্ছা বাঘাকাকা তুমি একটু ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবে?

বাঘাকাকা বললেন, কিছু বোঝা গেলে তবেই তো বোঝানো যায়। তবু কি জানতে চাইছ বল?

কিট্টু বলল, ওঁর অর্থাৎ মাধবলালবাবুর তিন ছেলের মধ্যে কাকে সবচেয়ে বেশি সন্দেহ করা যায়, যদি এটা খুনই হয়?

বাঘাকাকা বললেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল ওটাই। অর্থাৎ এটা খুন কি না। এটা খুন না হলে আত্মহত্যা। দুর্ঘটনা নয় ধরেই নেওয়া যায়। কেউ হঠাৎ সিঁড়িতে নামবার সময় পড়ে যেতে পারে, কেউ একটা ওষুধ খাওয়ার বদলে ভুল করে অন্য কোনও ওষুধ খেয়ে ফেলতে পারে এবং তাতে জীবন সংশয় হতে পারে, মৃত্যুও হতে পারে। কিন্তু কেউ ভুল করে সায়ানাইড অব পটাসিয়াম খেয়ে ফেলবে না। কোনও ল্যাবরেটরিতেও এমন ভুল হয় না, একজন গৃহস্থের বাড়িতে ওই মারাত্মক বিষ আসতেই পারে না, বিশেষ করে ভুবনচরার মতো জায়গায়। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি মাধবলালবাবুর জনাতিনেক বিশেষ বন্ধু ছিলেন. এঁরা এককালে দারুণ তাস খেলার নেশায় মেতেছিলেন। বছর দশেক আগে মাধবলালবাবুর পুরনো বন্ধুদের অনেকেই তাস খেলতেন। ওই সময় থেকেই মাধবলালবাবুর বৈঠকখানায় রোজই দশ বারো জন জুটে যেতেন সকালে এক প্রস্ত আর বিকেলে এক প্রস্ত। এঁদের অনেকেই কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন, অনেকেই কর্ম কখনই করেননি। এঁদের মধ্যে অক্ষয় বসু, চিরকুমার সাহা এবং হরিপদ কর এখনও মাঝে মাঝেই আসেন। আসেন মানে এই সেদিন পর্যন্তও আসতেন। সব সময় যে তাস খেলা হয়, তা নয়, এমনি সময় কাটানোর জন্যও আসেন। এঁদের মধ্যে আবার চিরকুমার সাহার সঙ্গে মাধবলালবাবুর ঘনিষ্ঠতা ছিল সবচেয়ে বেশি। এখন, মাধবলালবাবুর উইল করেছিলেন কি না, করলেও উইলে কি ছিল তা এঁদের এক বা একাধিক ব্যক্তি নিশ্চয় জানতেন, কেননা উইলের অন্তত একজন সাক্ষী থাকা চাই। অতএব উইল আদৌ করা হয়েছিল কি না সেটা জানতে হলে এঁদের প্রশ্ন করা যেতে পারে। উইল যদি করা হয়ে থাকে অথচ বাড়িতে না পাওয়া যায় তাহলেও এঁদের কাছে বা অন্য

কোথাও, অন্য কোনও ব্যক্তির কাছে উইলের কপি থাকা সম্ভব। বাঘাকাকা বললেন, এ ছাড়া কলকাতার ব্যাঙ্কে মাধবলালবাবুর একটি সেফটি ভল্ট ছিল, বছরে একবার কি দুবার তিনি ডাক্তার আদিত্যর গাড়িতে করে কলকাতায় যেতেন। উইল থাকলে ভল্টেও থাকতে পারে। বাঘাকাকা একটু থামলেন। তারপর বললেন, এবারে দেখা যাক ওই বাড়িতে কে ছিল ওই রাত্তিরে। কিন্তু তার আগে জানা দরকার মাধবলালবাবুর পরিবারের কথা।

বাঘাকাকা বলে চললেন, আমি জানতে পেরেছি মাধবলালবাবুদের প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত পরিবার যাঁদের কয়েকশো বছরের ছেঁড়া ছেঁড়া ইতিহাস পাওয়া যায়, তাঁরা মোটেই শান্তশিষ্ট ছিলেন না। তাঁদের প্রভূত পরিমাণ সম্পত্তি তাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন বাহুবলে। কখনও ডাকাতি, কখনও লাঠিয়াল দিয়ে এক জমিদারের বিরুদ্ধে অন্য জমিদারের হয়ে লড়ে, কখনও মোগলের কখনও ব্রিটিশের হয়ে কাজ করে, কখনও টাকা নিয়ে নরহত্যা করে তাঁরা তাঁদের ধন সম্পত্তি বাড়িয়েছিলেন। মাধবলাল আচার্যের ঠাকুর্দা অঘোরলাল অবশ্য শান্ত মেজাজের ছিলেন। তিনি প্রচুর দানধ্যান করতে শুরু করলে তাঁর ছেলে সতীশলাল তাঁকে বাড়ির পুকুরে জলে ডুবিয়ে হত্যা করেন। সেও প্রায় ষাট বছর আগেকার কথা। সে কথা তখন সকলেই জানতেন, কিন্তু প্রমাণ করা যায়নি বলে সতীশলাল বেঁচে যান। যত দূর জানা যায় মাধবলালবাবু লোকটির মধ্যে বিশেষ বদগুণ ছিল না, কিন্তু কখনও কখনও তিনি অসম্ভব রেগে যেতেন। তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের উপর চাইতেন সর্বময় কর্তৃত্ব। একটা কথার প্রতিবাদ সহ্য করতে পারতেন না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে অবশ্য খুবই ভালবাসতেন। বছর পনেরো আগে তিনি টাইফয়েডে মারা যান। যে ডাক্তার তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসা করেছিলেন— তিনি ভুল চিকিৎসা করেছিলেন বলে তাঁকে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করেন। তারপর ডাঃ আদিত্যকে তিনিই এই গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর তাসের বন্ধুদের একজনের আত্মীয় হলেন এই ডাক্তার বিনায়ক আদিত্য। ডাক্তার বিনায়ক আদিত্য এসেই প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন নিজেকে। মাধবলালের দু রকমের ব্যক্তিত্ব ছিল। অধিকাংশ সময়ই তিনি ছিলেন শান্তশিষ্ট, কিছুটা পরোপকারী, হাসিখুশি, সাহিত্যরসিক। বাড়িতে প্রচুর বই রয়েছে। তাতে তাঁর রুচি এবং কুরুচি এই দুই-ই প্রমাণ করা যায়। আধুনিক কবিতাও তাঁর বোধহয় পছন্দ ছিল। কিছু কিছু কবিতা তিনি নিজেও লিখবার চেষ্টা করেছিলেন, কবিতা লেখার অক্ষম প্রচেষ্টা রয়েছে তাঁর খাতায় এবং কিছু ছাপানো পত্রপত্রিকায়। সে সব পত্রপত্রিকার নামও কেউ জানে না এখন। যখন বেরিয়েছিল তখনও কয়েক-জনের বেশি কেউ জানত না।

—এত সব জানলে কেমন করে বাঘাকাকা ? আফজল বলল।

বাঘাকাকা বললেন, তোমরা তো জানো আমি জেলখাটা লোক। জেলে আমার সঙ্গে এমন সব চরিত্রের পরিচয় হয়েছিল যাঁরা নানাকর্মে পটু। তাঁদের কয়েকজন মাঝে মাঝে জেলে ঢোকেন বটে, কিন্তু ছাড়াও পান। তাঁদের দুজন লোক আমাকে সাহায্য করছেন এখন।

কিট্টু বলল, বাঘাকাকা ও কথা এখন থাক পরে কখনও সুযোগ পেলে আফজলকে আমি বলে দেব। তুমি বলো ওই বাড়ির ব্যাপার-স্যাপার।

বাঘাকাকা বললেন, কারু বাড়ির ব্যাপার-স্যাপার জানার আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। ভালই লাগে না ও সব। কিন্তু জানতে হচ্ছে। মিহিরবাবুর বিপদ বলেই আমার রোখ চেপে যাচ্ছে। আর যতই রোখ চেপে যাচ্ছে ততই কেমন যেন মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে মানুষকে দেখে কিছু বোঝা যায় না। দেখে মনে হয় ভাজা মাছটি কেউ উল্টে খেতে জানে না!

—মাধবলালবাবু লোকটি সম্পর্কে ভেবে দ্যাখো। বাঘাকাকা বললেন, ওঁর সম্পর্কে ভুবনচরার লোকের ধারণা, চমৎকার লোক। পুজোয় চাঁদা দেন ভাল, গ্রামে কোনও জলসা হলে দুশো টাকার কমে দেন না কখনও। গরিব কেউ সাহায্য চাইলে তিনি কখনও ফেরান না। বই পড়েন, খবরের কাগজ পড়েন, রেডিও শোনেন, টিভি দেখেন, বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলেন। কিন্তু অন্যদিকে দ্যাখো, তাঁর মেজাজ তেরিয়া। একটা ছেলেকেও কখনও বোধহয় ভালবাসেননি। নিজের মেয়ে অবশ্য স্বতন্ত্র, তিনি এখন ওই বাড়িতেই রয়েছেন।

বাঘাকাকা বললেন, মাধবলালবাবুর বড় ছেলে অভিনব। তিনিই একমাত্র ওই বাড়িতে রয়েছেন, বা থাকেন। খোঁড়া, ছোটবেলা থেকেই। পড়াশুনায় ভাল ছিলেন। একটু বুনো প্রকৃতির ছিলেন ছোটবেলায়। স্পোর্টসে ছিল দারুণ উৎসাহ। কিন্তু বাবার তাতে মত ছিল না। তিনি মনে করতেন খেলাধুলো করে কাটালে আর লেখাপড়া হবে না। কিন্তু ছেলে বাপের কথা না শুনে খেলাধুলো নিয়েই বেশি মেতে থাকতেন। একবার কোথায় খেলতে গিয়ে ফিরতে রাত দশটা বেজে গিয়েছিল বলে এমন আঘাত করেছিলেন এবং করতে গিয়েছিলেন যে অভিনব দৌড়ে পালাতে গিয়ে দরজার সঙ্গে পা বেধে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে পা ভেঙে যায়। কয়েক মাস ভুগে সুস্থ হন বটে, কিন্তু পা আর সোজা হয় না। মাধবলালবাবুর পরে দুঃখ হয়েছিল ঠিকই, অনেক টাকা খরচ করে দু বার অস্ত্রোপচারও করানো হয়েছিল, কিন্তু সামান্য উন্নতি হলেও পা স্বাভাবিক হয়নি। অভিনবকে অনেক টাকা খরচ করে তিনি লেখাপড়ারও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। করে দিয়েছিলেন গানবাজনা শেখারও বন্দোবস্ত। এম এ পাস করেছিলেন অভিনব। ওস্তাদের কাছ থেকে গানেরও তালিম নিয়েছিলেন কিন্তু বাবার উপর কখনই রাগ যায়নি। চিরকালই তিনি বাবাকে করেছেন ঘৃণা। ওঁর স্ত্রী হরিপ্রিয়া ভারি নম্র স্বভাবের মেয়ে। মাধবলালবাবুর পর হরিপ্রিয়াই সংসারের হাল ধরেছিলেন। মাধবলালবাবু ওঁকে খুবই পছন্দ করতেন। তবে কয়েক বছর হল ওঁদের সঙ্গে একটা যান্ত্রিক সম্পর্ক। হরিপ্রিয়া নিজে কখনও শ্বশুরের সঙ্গে কথা বলেন না। না ডাকলে কথার উত্তর দেন না। এমনকি ওঁর ঘরেও হরিপ্রিয়া কালেভদ্রে যান।

—ভারি অদ্ভুত তো! কিট্টু বলল।

—মেজোছেলে বিমানও বাবাকে খুব ভালবাসেন বলে মনে হয় না। বিমান ভাল করেই লেখাপড়া শিখেছিলেন। বি এসসি পাস করার পর তিনি এম এসসি

পড়তে পড়তে বিয়ে করেন সহপাঠিনী নিলয়া দাসকে। গোপনে বিয়ে করেন, কিন্তু জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর মাধবলাল আচার্য ভয়ানক রেগে যান। একবার ত্যাজ্যপুত্র করবেন ভেবেছিলেন। নিলয়ার বাবা ডাক্তার। সরকারি ডাক্তার। কয়েক বছর আগে রিটায়ার করে নিজের বাড়ি বারাসতে প্র্যাকটিস করতে শুরু করেছিলেন, সঙ্গে ছিল এক ওষুধের দোকান। দুটোই বেশ চলছিল, কিন্তু হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় একজন ডাক্তারকে ওখানে বসতে দেন, আর দোকান দেখাশোনার ভার দেন বিমানের উপর। বিমান সস্ত্রীক ওখানেই বসবাস করছেন। তবে মাঝে মাঝে ভুবনচরায় আসেন। বাবাকে দেখাশোনার ব্যবস্থা ঠিক মতো চলছে কি না দেখেন। তাতে অবশ্য হরিপ্রিয়া নম্র স্বভাবের হলেও উষ্মা প্রকাশ করেন। হরিপ্রিয়ার ধারণা বাপের সম্পত্তির উপর বিমানের লোভ। সেই কারণেই তিনি পিতৃভক্তি দেখাতে আসেন। এ বাড়িতে নিলয়া আসেন না, কেননা নিলয়াকে মাধবলালবাবু পুত্রবধূ হিসেবে কখনই মেনে নিতে পারেননি। পুরনো জমিদারি মেজাজ তিনি আমৃত্যু অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

এরপর হচ্ছে তৃতীয় পুত্র বিশ্বলাল। কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলেন। ছাত্র মন্দ ছিলেন না, কিন্তু মন সব সময়েই উৎক্ষিপ্ত হয়ে থাকত। তবে বন্ধুবৎসল এবং অমায়িক স্বভাবের ফলে লেখাপড়া বিশেষ হয়নি। দ্বিতীয় বছর থেকেই মদ টানতে শুরু করেন, এবং আনুষঙ্গিক আরও দু একটা দোষও তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করেন। ভাল স্বাস্থ্য, খেলাধুলায় ভাল ছিলেন, এই সময় সার্কাসের শান্তা বলে একটি মেয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। তাঁর জাতি বা পরিচয় না জেনেই বিশ্বলাল তাঁর রূপে এবং গুণে মুগ্ধ হয়ে প্রেমে পড়ে যান, এবং শেষ পর্যন্ত বাড়ির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে সার্কাসে যোগ দেন। সার্কাসে খেলা দেখানো, দড়ির উপর দিয়ে হাঁটা-চলা করা, ডিগবাজি খাওয়া, বাঘের মুখে মাথা ঢোকানো, ভালুকের সঙ্গে লড়াই, এ সব ছাড়াও অনেক রকম কাজ থাকে। তিনি সামান্য মাইনেয় সেই রকম একটা উটকো কাজে যোগ দিয়ে সারা ভারত ঘুরে ঘুরে বেড়ান। কখনও সখনও বাড়িতে এসে দু একদিন থাকেন। তারপর চলে যেতেন। তিনিও তাঁর স্ত্রীকে বাড়িতে কখনও আনেননি। বিশ্বলাল মাস চারেক আগে একবার এসেছিলেন। সে সময় ওঁর বাবার ঘরে তিনি কয়েকবার গেলেও মাধবলাল তাঁর সঙ্গে কথাই বলেননি। তাঁর বড়দা অভিনবও বিশ্বলালকে পাত্তা দেননি। আসলে প্রত্যেকবারই বিশ্বলালের বাড়িতে আসার আসল উদ্দেশ্য থাকত ভুলিয়ে ভালিয়ে হাজার কয়েক টাকা নিয়ে চলে যাওয়া। শোনা যায় শান্তার দুটি সন্তান হওয়ার পর থেকে তিনি সার্কাসের কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। বয়সও হয়ে যাচ্ছিল। দু জনের আয়ে এক রকম চলে যাচ্ছিল, তা ছাড়া বছরের সব সময়েই দলের সঙ্গে থাকার অসুবিধে যেমন ছিল সুবিধেও তেমনি ছিল। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে খরচও হত যৎসামান্য, কিছু টাকা জমেও যেত। শান্তা কাজ ছেড়ে দেওয়ার পর মাদ্রাজের উপকণ্ঠে একটা একঘরওলা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকতেন। যাই হোক শেষবার তিনি এসে হাজার খানেক টাকা মাত্র পেয়েছিলেন, তাও বাবার কাছ থেকে নয়, পেয়েছিলেন বড়দা

অভিনবর কাছ থেকে। বিশ্বলাল নাকি বলেছিলেন, বাবার সম্পত্তি একাংশ আমার। বাবার মৃত্যুর পর আমার সে দাবি আমি ছাড়ব না। অভিনব বলেছিলেন সে গুড়ে বালি। উইলে তিনি আর যাই করুন না কেন তোকে একটি পয়সা দেবেন বলে তো মনে হয় না। বিশ্বলাল তখন উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন, আমি কেস্ করব, মামলা মকর্দমা করব, খুন করব। বাড়িতে দুটো সাপ ছেড়ে রেখে চলে যাব তোরা সব সাপের কামড় খাবি আর ঢলে পড়বি। অভিনবর ছোট ছেলে দাশুর বয়স সাত। সে বলেছিল, কাকামণি, কবে সাপ আনবে, আমি সাপ দেখব। দু'শো সাপ দেখব। সাপের কামড়ে ঢলে পড়ব। যাই হোক বিশ্বলাল এর পরও দু দিন ও বাড়িতে ছিলেন, সম্পত্তির একটা অংশ পাওয়ার জন্য নানা তদ্বির এবং অনুরোধও করেছিলেন কিন্তু বাবা কিংবা বড়দা কেউই তাঁর কথায় কর্ণপাত করেননি। তবে বাবা নাকি বলেছিলেন, আমি তো বেশিদিন বাঁচব না —কিছুদিন অপেক্ষা করলেই তো তোর মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, তা এখন একটু ধৈর্য ধর না কেন ?

বাঘাকাকা বললেন, বাড়ির ছোট মেয়ে বিনতা দেবী। দু বছর হল বিয়ে হয়েছে। বিয়ের বছর খানেক পরই স্বামী ডাক্তার অশ্বিনী রায়চৌধুরী কানাডায় এক বছরের হাসপাতাল ট্রেনিং নিতে চলে যান। দু এক সপ্তাহের মধ্যে ফেরার কথা। এলে বিনতা দেবী চলে যাবেন স্বামীর কর্মস্থল দিল্লিতে, এই রকমই কথা। এই বিনতা দেবীর সঙ্গেই মাধবলালবাবুর ছিল সবচেয়ে ভাল সম্পর্ক।

এ ছাড়া বাড়িতে কাজের লোক আছে অন্নদা। বহু পুরনো লোক। আত্মীয় স্বজন দূরে দূরে। এখন যোগাযোগ নেই। সকালে বিকেলে দুজন কাজের লোক। একজন রান্নার লোক একজন ঘর পরিষ্কার করে। একটা কুকুর।

কিটু বলল, সেদিন তো বাড়িতে কুকুর দেখিনি ?

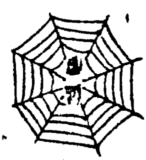
বাঘাকাকা বললেন, কুকুরটা দারুণ ভিতু। ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ দেখলেই সে ভয়ে খাটের তলায় বা কোথায় লুকিয়ে পড়ে।

—কুকুরটার নাম কি ?

—কুকুরটার জাত দিশি, কিন্তু নামটা বলব না। বললে তোমরা হাসবে।

—হাসব ? তাহলে তো শুনতেই হবে। বলো কি নাম ?

—বাঘা। বাঘাকাকা বললেন।



৫

হাজত থেকে দ্বিতীয়বার ছাড়া পেয়ে মিহির কেমন যেন অস্থির বোধ করতে লাগল। মুখে হাসি নেই, আত্মবিশ্বাস নেই। কেমন উদাস ভাব। ম্যাজিস্ট্রেট রায় দিলেন মিহির বিনা শর্তে মুক্ত। পুলিশ যে সব কথা বলে একজন তরুণ কবিকে আটকে রাখার চেষ্টা করেছে তার মধ্যে যুক্তি নেই। পুলিশ ভাসা ভাসা ভাবে বলেছে মৃত ব্যক্তি তাঁর দূরসম্পর্কের আত্মীয় এবং তিনি নেশাগ্রস্ত ছিলেন। মৃত ব্যাক্তির সঙ্গে মিহিরবাবুর শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল, মিহিরবাবু প্রচণ্ড ঝড় এবং বৃষ্টির মধ্যে আশ্রয় নেওয়ার জন্যই মাধবলাল আচার্যের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তিনি বৃদ্ধ মাধবলালবাবুকে খুন করবার জন্য পকেটে সায়া-নাইড অব পটাসিয়াম নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং তাঁকে খাইয়ে হত্যা করেছিলেন এটি সম্পূর্ণ উম্মাদের কল্পনা। পুলিশ বলেছে মিহিরবাবু মত্ত অবস্থায় ছিলেন। এটা ঠিকই, মিহিরবাবু মদ পান করেছিলেন, কিন্তু সেটা রাত্রে। পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করতে যায় সকালে। ঐ সময় মিহিরবাবু ক্লান্ত এবং অবসন্ন হতে পারেন কিন্তু মত্ত হতে পারেন না। এটি পুলিশের কল্পনাশক্তির পরিচয় দেয়। এই কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। পুলিশ বলেছে মিহিরবাবু তাদের মারধর করেছেন বিনা প্ররোচনায়। এটি সম্পূর্ণ সত্য হতে পারে না। মিহিরবাবু সম্পূর্ণ নিরপরাধ ছিলেন এবং তাঁকে গ্রেফতার করতে পুলিশই গিয়েছিল, ফলে মিহিরবাবু স্বভাবতই তাতে আপত্তি জানান। মিহিরবাবু তাই বলেছেন এই আদালতে। আপত্তির পরও পুলিশ মিহিরবাবুকে বিশ্রী ভাষায় গালাগাল করেন, সে সব গালাগাল এমনই যে আধুনিক কবি হয়েও মিহিরবাবু সে কথা আদালতে বলতে ইতস্তত করেছেন, লজ্জাবোধ করেছেন। প্রথমে পুলিশ মিহিরবাবুকে ধরেছিল মদ পান করিয়ে মাধবলাল আচার্যের মৃত্যু ঘটানোর অভিযোগে। একজন পূর্ণবয়স্ক সজ্ঞান ব্যক্তিকে মদ খাওয়ানোর লোভ জাগিয়ে তোলা যায় কিন্তু তাঁকে জোর করে মদ গেলানো যায় না। বলা হয়েছে মিহিরবাবুকে বলা হয়েছিল মাধবলালবাবুর পক্ষে মদপান বিপজ্জনক। তা সত্ত্বেও মিহিরবাবু তাঁকে মদ সরবরাহ করেন, আমার মতে এটা অপরাধ কিন্তু অতি সামান্য অপরাধ। এই অপরাধে যদি সকলকে গ্রেফতার করা যেত তাহলে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে যেত। সরকার অনুমোদিত মদের দোকান থেকে যে-কেউ মদ কিনতে পারে। আঠারো বছর বয়স হলেই যে কেউ ডজন-ডজন বোতল মদ কিনতে পারে। মদ বিক্রির আগে মদের দোকানদার কি মদ পান যিনি করবেন তাঁর স্বাস্থ্য কেমন জানতে চান, কিংবা ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখতে চান? সরকার জানেন মদপান শত-করা নব্বুইভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর। ক্রমাগত কেউ মদ টানলে যে কোনও ব্যক্তির স্বাস্থ্যহানি হতে পারে, এবং স্বাস্থ্যহানি মানেই মৃত্যুর দরজার দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাওয়া। তা সত্ত্বেও সরকার এই মদ বিক্রি বন্ধ করেন না। করেন না,

কেন না দেখা গেছে সরকারের এতে দিনে কোটি কোটি টাকা লাভ হয়। টাকার লোভে যেখানে সরকার হাজার হাজার ব্যক্তিকে মদ্যপান করতে উৎসাহ দেন অথচ সরকারকে দোষী করা হয় না, সেখানে কোনওরকম আর্থিক বা লাভের আশা না থাকা সত্ত্বেও মিহিরবাবুকে কেন সন্দেহ করা হল ?

ম্যাজিস্ট্রেট বলেছিলেন, স্পষ্টতই পুলিশ প্রথমবারে ভুল করেছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে যখন দেখা গেল মাধবলালবাবুর মদ্যপানে মৃত্যু হয়নি মৃত্যু হয়েছিল আরও সাংঘাতিক এক অব্যর্থ বিষে, অর্থাৎ সায়ানাইড অব পটাসিয়ামে। এবারেও পুলিশ সেই একই ভুল করেছে। এটা স্পষ্ট যে মাধবলালবাবুকে খুন করার ব্যাপারে মিহিরবাবুর কোনও স্বার্থ ছিল না। আকস্মিকভাবে উত্তেজিত হয়ে হত্যা এটা নয়, এটা ঠাণ্ডা মাথায় খুন, কিংবা হয়তো এটা আত্মহত্যা। মিহিরবাবু ঠাণ্ডা মাথায় প্রায় অপরিচিত এক ব্যক্তির বাড়িতে অকস্মাৎ উপস্থিত হয়ে তাঁকে হত্যা করবেন এটা বিশ্বাস করা যায় না। প্রকৃত খুনী কে সেটা পুলিশ অনুসন্ধান করার বদলে সহজ সমাধান করে ফেলেছে এই তরুণ কবিকে গ্রেফতার করে। এটা আত্মহত্যা না খুন সেটা বলার এক্তিয়ার আমার নেই, তবে এটা ঠিকই এই ব্যাপারে আপাতদৃষ্টিতে মিহিরবাবু নির্দোষ। অতএব আমি অবিলম্বে এই কবিকে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে পুলিশকে আদেশ দিচ্ছি।

—পুলিশ খেপে যাবে। উৎসাহের সঙ্গে বলেছিল কিটু মিহিরকে, মিহির জবাব দেয়নি। সে কেবল উদাসভাবে তাকিয়ে রইল।

সুপ্রিয়া পিসি বললেন, দ্যাখ তো কিটুও কাল রাত্রে ভাল করে খায়নি, ঘুমোয়নি—কেবলই ছটফট করেছে। ভাল করে কথা বলছে না। আমি ওকে বার-বার বলছি তোর তো কিছু হয়নি, তুই তো খুন করিসনি। কেউ বিশ্বাসই করবে না তুই খুন করেছিস। ম্যাজিস্ট্রেটও সেটা বুঝতে পেরেছেন। বড় সাহসী ম্যাজিস্ট্রেট, উনি বলছিলেন। সাধারণত ম্যাজিস্ট্রেটরা নাকি এত স্পষ্টভাবে পুলিশের বিরুদ্ধে বলেন না। পুলিশ যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াবে কেউ কিছু বলতে পারবে না ? কিটু তুই একটু ওকে বোঝা তো ?

একটু একটু চা খেতে খেতে মিহির বিষাদকণ্ঠে বলল, কিটুদা এ কি হয়ে গেল।

কিটু বলল, যা হবার তা তো হয়ে গেছে, আর কি ? এখন মনে ফুর্তি আন।

মিহির বলল. এ খুনটা কে করেছে বল তো ? কিটু বলল, তোর কি মনে হয় ? তুই তো ঐ বাড়িতে বেশ কিছু সময় ছিলি। এটা কি আত্মহত্যা হতে পারে ? মিহির বলল, মোটেই নয়। আমার সঙ্গে কত উৎসাহের সঙ্গে কথা বলছিলেন। প্রায় ঘণ্টা তিনেক তো হবেই। ভদ্রলোক রুচিমান, শিক্ষিত। আমাকে পরে আবার আসার নিমন্ত্রণও করেছিলেন।

—তবু অসুখী। কিটু বলল, এ নিয়ে তিনি কিছু বলেছিলেন ?

—মোটেই না। তাঁকে আমার অসুখী বলেই মনে হয়নি। প্রাণখোলা হাসি হাসছিলেন। কত কথা বলছিলেন। পুরনো যুগের কত কথা। যিনি আত্মহত্যা করবেন তিনি কি ওইভাবে কথা বলতে পারেন ?

—সেটা ঠিক। কিন্তু বাড়ির লোকদের মধ্যে কে এই কাজ করল ?

মিহির বলল, বাড়ির লোক বলতে তো অভিনববাবু, তাঁর স্ত্রী, দুই ছেলে—তা ছেলেরা ছোট, তাদের সম্ভাব্য খুনের ভূমিকায় ভাবা যায় না।

কিটুু বলল, বিনতা দেবী ?

মিহির বলল, চমৎকার ব্যবহার। বাবার খুব প্রিয়। তিন ছেলেই মাধব-লালবাবুকে হতাশ করেছে। তিনজনের মধ্যে দু'জনকে বাদ দেওয়া যায়।

—কেন ?

—কেন না মৃত্যুর সময় তাঁরা তো বাড়িতেই ছিলেন না।

কিটুু বলল, ভুলে যাস না মিহির, এ তো বন্দুকের গুলি নয় কিংবা লাঠি পেটা করে মারা নয়, বিষ। এ অতি মারাত্মক অস্ত্র। যিনি বিষ প্রয়োগ করবেন তাঁকে যে কাছেই থাকতে হবে এমন কোনও নিয়ম নেই। এ বিষ খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে যে সে দিনই দিতে হবে তার কোনও ব্যাপার নেই। যে-কোনও সময় এই মারাত্মক বিষ, ধরো একটা ওষুধের শিশিতে ট্যাবলেট বা ক্যাপসুলের মধ্যে রেখে দেওয়া হল রোগীর ওষুধের তাকে বা আলমারিতে। রোজ রোগী একটা দু'টো কিংবা তিনটে করে ক্যাপসুল কিংবা ট্যাবলেট খান। তিনি প্রথম দিনেই যে বিষ ট্যাবলেট কিংবা ক্যাপসুল খাবেন তা নাও হতে পারে। কোনও শিশি থেকে বিষ ট্যাবলেট খাওয়ার সম্ভাবনা সর্বদাই থাকে, তবে প্রথম দিনের সেই ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল খাওয়া হতে পারে কিংবা খেতে খেতে দু-মাস কি তিন মাসও দেরি হতে পারে। সুতরাং বিষ প্রয়োগের সময় প্রয়োগকারীকে বাড়িতে বা কাছাকাছি থাকতেই হবে এমন কথা নেই।

—কি সাংঘাতিক। মিহির বলল, কিট্‌দা ও বাড়ির সকলেই কিন্তু এই হত্যাকারী হতে পারে। কেউই বাবাকে ভালবাসত না, তবে এটাও ঠিক মাধব-লালবাবুও তাঁর ছেলেদের প্রত্যেকের প্রতি বিরূপ ছিলেন।

—তুই কেমন করে জানলি ?

—উনি নিজেই বললেন যে।

—উনি নিজেই বললেন ?

—হ্যাঁ উনি দু-এক চুমুক হুইস্কি খেয়েই বেশ দিলখোলা হয়ে পড়লেন। কত যে কথা বলে গেলেন তার ইয়ত্তা নেই। বুঝতে পারলাম তিনি অনেক কথা বলতে চাইতেন, কিন্তু বিশ্বাস করে কাউকে বলতে পারতেন না। তাঁর ধারণা ছিল কেউ তাঁকে ভালবাসে না, সকলেরই তাঁর সম্পত্তির উপর নজর। তিনি আমাকে বলেছিলেন কাউকে কখনও বিশ্বাস কোরো না, সব সময় সতর্ক থাকবে। আমি মরলে এখানে ভূতের নাচ শুরু হবে। তারপর এও বললেন যে তাঁর সম্পত্তি তিনি ভূতদের হাতে কখনই যেতে দেবেন না।

—অর্থাৎ উইলের কথাটা এসে যাচ্ছে, তাই না ? কিটুু বলল।

মিহির বলল, অমনভাবে আমি ভেবে দেখিনি। হ্যাঁ ওঁর কথায় তা মনে হতে পারে।

—কথাটা আর কেউ শুনেছিল ?

মিহির বলল, না বোধহয়। আমরা যখন কথা বলি তখন ঐ ঘরে আর কেউ তো ছিল না। তবে দরজার বাইরে থেকে কেউ শুনতেও পারে।

তারপর একটু ভেবে মিহির বলল, না কেউ শোনেনি।

—কেন বলছ ?

—এখন মনে হল ঐ সময় প্রবল ঝড়ে নানারকম আওয়াজ হচ্ছিল। বৃষ্টির আওয়াজও ছিল। বোধহয় কাছেই কোনও টিনের ঘর ছিল তার উপর বৃষ্টি পড়ার ঝমঝম আওয়াজ হচ্ছিল।

—নার্স রাধাময়ী কোথায় ছিল ?

—রাধাময়ী খাবার নিয়ে রাত ন'টা নাগাদ এসেছিল ঘরে। ঐ সময় আমিও খাবার ঘরে যাই খেতে। রাধাময়ী অবশ্য খাদ্যের মধ্যে বিষ দিতে পারে।

—না দেয়নি। কিট্টু বলল, এ এমনই বিষ যে তা মুখে দেওয়ার দু-এক মিনিটের মধ্যে তার মৃত্যু হবেই। খাবারে বিষ সে দেয়নি।

—তাহলে ওষুধে ?

—আমিও তাই ভাবছি মিহির। ওষুধে বিষ দিয়েই মারা হয়েছে। কিন্তু সে ওষুধ দিলেন কে ?

—বাড়িরই কেউ। কিট্টু উত্তেজিত হয়ে বলল, ভেবে দেখ মিহির এই যে আমরা গ্রামে গেলাম, ভুবনচরা যার নাম। কি চমৎকার গাছের ছায়ায় ঢাকা নারকেল সুপুরি কাঁঠাল গাছের মধ্যে সহজ সরল লোক সব। কেউ কি সেখানে সায়ানাইড অব পটাসিয়ামের কথা ভাবতে পারে ?

মিহির বলল, গ্রামের লোক সহজ-সরল ? গ্রামের প্রত্যেকটা লোক এক একটা শয়তান! তোমার কি গ্রামের অভিজ্ঞতা আছে, কিট্টুদা ?

—তোর আছে ?

—আছেই তো! মিহির বলল, আমি তো গ্রামে-গ্রামে কত ঘুরে বেড়াই। উঃ এক একটা গ্রামের লোক এমন বিচ্ছিরি হতে পারে সে তুমি ভাবতেও পারবে না। আর ঐ ভুবনচরা গ্রাম তো চোরাকারবারিদের স্বর্গরাজ্য।

কিট্টুর মনে পড়ল সেই প্রথম দিনের কথা। সত্যি একটি ছোট ছেলে পর্যন্ত ক্যামেরার লেন্স-এর পাওয়ার কত জানে, ক্যামেরার দাম জানে। মনে পড়ল মহেন্দ্র পালের কথা, যিনি বলেছিলেন ভুবনচরা হল গিয়ে চোরাকারবারিদের জায়গা। এক এক কেজি নুন বাংলাদেশে চালান দিলে দু'টাকা করে লাভ।

কিট্টু বলল, গ্রামের সব লোক খারাপ এটা মানা যায় না মিহির। ওটা ঠিক কথা নয়। ভাল মানুষ সব জায়গাতেই থাকে। থাক সে সব তত্ত্বকথা। সেদিন রাত্রে কি হয়েছিল ? রাত্রে তোর ঘুম হয়েছিল ?

—পুরো ঘুম হয়নি। কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো পড়ে ছিলাম। বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ, ঠিক রেডিওতে যেমন ঝড়ের আওয়াজ শোনা যায় সেই রকম। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল কে যেন মাটি খুঁড়ছে।

—মাটি খুঁড়ছে ?

—হ্যাঁ কিট্টুদা মাটি খোঁড়ার আওয়াজ আমি পেয়েছি, ঠিক যেন কেউ খন্তা

দিয়ে মাটি খ‌ুঁড়ছে বলে মনে হচ্ছিল।

—আর কিছ‌ু আওয়াজ পেয়েছিলি, রাত্রে ?

—হ্যাঁ, শেয়ালের ডাক। ঘ‌ুমের ঘোরে আমি যেন আবছা-আবছা ভাবে শেয়ালের ডাক শ‌ুনতে পেয়েছিলাম। সেটা অবশ্য পরে ভুলে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া কুকুরের ডাকও শ‌ুনতে পেয়েছিলাম। সেটা খ‌ুব কাছ থেকেই।

—বাঘা ?

—তুমি কুকুরের নামটা জানো ? হ্যাঁ ও-বাড়ির কুকুর—মাধবলালবাব‌ুর প্রিয় কুকুর।

—শেয়ালের ডাক ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত মনে হচ্ছে রে মিহির।

—কেন শেয়াল কি ডাকে না ?

কিট্‌ু বলল, শেয়াল আজকাল আর নেই। কয়েক বছর আগেও তারা ভয়ে ভয়ে নিজেদের অস্তিত্ব কোনও মতে টিকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু এখন তাদের আর পাত্তা পাওয়া যায় না। অতএব ধরে নিতে হবে যে শেয়াল নেই, সে শেয়াল ডাকতে পারে না। অতএব সে রাত্রে তুই শেয়ালের ডাক শ‌ুনিসনি।

—হ্যাঁ কিট্‌দা শ‌ুনেছি।

কিট্‌ু বলল, সেটা পরে ভাবা যাবে। আর কি হয়েছিল সে রাত্রে, মনে পড়ে ?

মিহির বলল, বিশেষ কিছ‌ুই মনে পড়ে না কিট্‌দা। তবে তুমি প্রশ্ন করলে ঠিক মনে করতে পারব।

কিট্‌ু বলল, মাধবলালবাব‌ুর দরজা কি বন্ধ করা ছিল ভেতর থেকে ?

মিহির বলল, ব্যাপারটা এইরকম। মাধবলালবাব‌ুর ঘর আর আমার ঘর ছিল পাশাপাশি। দ‌ু'টো ঘরের মধ্যে একটা দরজা। দ‌ু'টো ঘরেরই বারান্দা আছে। সেদিকে বাগান। আগে খোলা বারান্দা ছিল, এখন গ্রিল দেওয়া। দ‌ু'টো ঘরের মাঝখানের দরজা খোলা ছিল, অর্থাৎ আমি ইচ্ছে করলে মাধবলাল-বাব‌ুর ঘরে ঢ‌ুকতে পারতাম, আবার তিনি ইচ্ছে করলে আমার ঘরে আসতে পারতেন। বারান্দা অবশ্য প‌ুরো ছিল না, বছর কয়েক আগে মাধবলালবাব‌ু বারান্দা ঘিরে একটা বাথর‌ুম করিয়ে নেন। এই দ‌ুই ঘরের লোকেই সে বাথর‌ুম ব্যবহার করতে পারবে এমনভাবে তৈরি করিয়েছিলেন তিনি।

—এটা তুই জানলি কেমন করে ?

—এটা উনিই আমাকে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন বাড়ির লোকদের সঙ্গে যত কম দেখা হয় ততই ভাল। বারান্দার গ্রিলের দরজায় চাবি লাগানো থাকত, তাঁর সব বন্ধ‌ু-বান্ধব ঐ পথ দিয়েই বেশির ভাগ আসা যাওয়া করতেন।

—বারান্দার তালার চাবিটা কোথায় থাকত ?

—আমি জানি না কিট্‌দা।

—তুই কোন্‌ দিক দিয়ে ঐ বাড়িতে ঢ‌ুকেছিলি ?

—সদর দরজা দিয়ে। আমি তো বারান্দার ব্যাপারটা জানতাম না। ঐ বাড়িতে তো আগে কখনই যাইনি।

—তা বটে। যাক্‌গে এ নিয়ে আর আমাদের চর্চা করে লাভ কি। তুই ছাড়া

পেয়ে গিয়েছিস এটাই বড় কথা।

মিহির গম্ভীর হয়েই রইল।

কিট্টু বলল, কেন রে এত গম্ভীরভাবে থাকলে কি করে চলবে?

মিহির বলল, কিট্‌দা এই ব্যাপারে তাহলে খোঁজখবর কিছু করবে না? সাধুর ব্যাপারটা একটু দেখবে না?

—সাধুর ব্যাপার? বলেই কিট্টুর মনে পড়ল সাধুর ব্যাপার। সে সাধু সেই ঝড়ের রাতে উধাও হয়েছিলেন।

কিট্টু বলল, ও সেই সাধু। তা উনি এ ব্যাপারে কি জড়িত?

মিহির বলল, কিট্‌দা, বুঝতে পারছ না? বাড়িতে রয়েছে অমূল্য এক সম্পদ যার নাম কালো প্যাঁচা। যার দাম হিসেব করে বার করা যায় না। সেই বাড়িতে একটি নার্স এল। এক বছর পর সে উধাও হল। সে রাত্রেই উধাও হল সেই সাধু যিনি দিনের বেলা সাক্ষাৎ করেন না, সাক্ষাৎ করেন রাত্রে। এতে তোমার সন্দেহ হয়নি?

—ঠিক বলেছিস তো রে মিহির। কিট্টু বলল, ব্যাপারটা সেভাবে তো খেয়াল করিনি। তোর কি মনে হয় নার্স রাধাময়ী এই কর্মটি করেছে?

—তাই তো মনে হয়। তোমার মনে হয় না?

—তুই যখন বলছিস মাটি খোঁড়ার ব্যাপার। কালো প্যাঁচা কোথায় লুকিয়ে রাখা ছিল বোধহয় রাধাময়ীর জানা ছিল।

—না কিট্‌দা জানা ছিল না।

—ছিল না, তুই কেমন করে জানলি?

মিহির বলল, জানা থাকলে কি কেউ এক বছর ধরে সুযোগের অপেক্ষা করে? জানা থাকলে সেটা নিয়ে চটপট সরে পড়াই তো স্বাভাবিক ছিল।

কিট্টু একটু ভেবে বলল, তা ওই গর্তেই যে কালো প্যাঁচাটিকে পুঁতে রাখা হয়েছিল তা রাধাময়ী জানল কেমন করে?

মিহির বলল, ব্যাপারটা ভারি রহস্যময়। কিন্তু আমি শুনেছি ঐ কালো প্যাঁচার জন্য নাকি ছেলেরা বাড়ির যেখানে পেরেছে সেখানে খুঁড়েছে। অভিনব-বাবু প্রায়ই এ-ঘর সে-ঘর নানা অজুহাতে খুঁড়ে বাড়িটাকে নষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি নিজেই আবার নাকি গর্তগুলোকে বুজিয়ে সিমেন্ট করে দিতেন। উনি নিজে খোঁড়া—ওঁর পায়ে জোর নেই, আবার তিনিই খোঁড়া শুরু করাতে কেউ কেউ ওঁকে অভিনব খোঁড়া বলে ডাকত।

—এটাও কি মাধবলালবাবু বলেছিলেন তোকে?

—হ্যাঁ। তিনি বলেছিলেন কালো প্যাঁচার কথা। তিনি বলেছিলেন কালো প্যাঁচার গল্পটি উপকথা রূপকথা নয়। তবে তিনি যা বলেছিলেন তা অদ্ভুত। তিনি তাঁর ছেলে অভিনবর খোঁড়াখুঁড়ির কথাও বলেছিলেন।

—কী বলেছিলেন?

—তিনি বলেছিলেন কালো প্যাঁচা ঠিক কোথায় তা তিনিও জানেন না। তাঁরও অনুমান সেটি ঐ বাড়িরই কোথাও আছে, তবে তিনিও নানাভাবে

খুঁজেছেন বহুদিন থেকে, খুঁজেছেন কিন্তু কখনও তার সন্ধান পাননি।

—অদ্ভুত ব্যাপার। কিটু বলল, তাহলে তোর কথা মেনে নিলে ধরে নিতে হয় নার্স রাধাময়ী শেষ পর্যন্ত কালো প্যাঁচা খুঁজে পেয়েছিল?

মিহির বলল, তোমারও কি তা মনে হয় না?

কিটু বলল, না।

মিহির বলল, তুমি কেমন করে সহজেই না বলে দিলে?

কিটু বলল, তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে নার্স রাধাময়ী ওই বাড়িতে গিয়েছিল কালো প্যাঁচার সন্ধানে?

মিহির বলল, একটা কথা ভেবে দ্যাখো কিটুদা। আজকালকার বাজারে ট্রেইনড নার্স পাওয়া কত শক্ত। সেরকম একজন নার্স বারাসতে কিংবা কলকাতায় যে কোনও সরকারি কিংবা বেসরকারি হাসপাতালে কাজ করলে কমপক্ষে দেড় হাজার কি দু' হাজার টাকা রোজগার করতে পারে। তাহলে সে কেন মাত্র এক হাজার টাকার বিনিময়ে গ্রামে কাজ করতে গেল?

কিটু বলল, তাই তো, এমন চিন্তা তো আমার মাথায় আসেনি।

মিহির বলল, আরও একটা কথা ভেবে দ্যাখো কিটুদা। একজন নার্সের পক্ষে বিষ প্রয়োগ করা সবচেয়ে সহজ। যে সারাদিন রোগীর তত্ত্বাবধান করছে, খাদ্য খেতে দিচ্ছে, ওষুধ খেতে দিচ্ছে সে সুযোগ বুঝে রোগীকে বিষ খাইয়ে সহজেই মেরে ফেলতে পারে।

কিটু বলল, সায়ানাইড অব পটাসিয়াম? না রে মিহির না।

মিহির বলল, কেন না?

কিটু বলল, কেন না সায়ানাইড অব পটাসিয়াম এমনই এক জাতের বিষ যা একজন ট্রেইনড নার্সের অস্ত্র নয়। একজন নার্স অনেক সহজে, কখনও কোনও ওষুধ না দিয়ে কখনও কোনও ওষুধ বেশি দিয়ে রোগীকে মারতে পারে। মাধবলালবাবু ছিলেন ওষুধনির্ভর রোগী। রোজ তাঁকে ওষুধ খেয়ে বাঁচতে হত। এই ওষুধগুলোর মধ্যে কড়া ওষুধও ছিল—সে ওষুধের ডোজ বাড়িয়ে দিয়ে বা কোনও জীবনদায়ী ওষুধের বদলে সাধারণ সোডামিন্ট ট্যাবলেট দিলেই মেরে ফেলা সম্ভব। সে সুযোগ যার হাতের মুঠোয় সে কেন সায়ানাইড অব পটাসিয়ামের মতো বিষ দিয়ে মারতে যাবে মাধবলালবাবুকে?

—আরও একটা কথা ভেবে দ্যাখ। কিটু বলল, রোগীকে বিষ খাইয়ে মারার ব্যবস্থা করেই সে পালাল কেন? যে সত্যি খুন করার ব্যবস্থা করেছে বিষ দিয়ে সে কি এইভাবে তার উপর সন্দেহ সৃষ্টি করবে? কোনও বুদ্ধিমতী মেয়ে তা করবে কি? ভেবে দ্যাখ।

মিহির বলল, তাই তো কিটুদা। ব্যাপারটা তো ভেবে দেখিনি!

কিটু বলল, তবু তুই যেটা বলছিস সেটাও ভেবে দেখতে হবে। একজন ট্রেইনড নার্স কেন মাসে মাত্র এক হাজার টাকায় অজ পাড়াগাঁয়ে যেতে রাজি হল? এবং আরও একটা কথা—ঐ ঝড়ের রাত্রে সে পালালই বা কেন? পালিয়ে সে গেলই বা কোথায়? আরও প্রশ্ন—তুই সে রাত্রে শেয়ালের ডাকই বা শুনতে

পেলি কেমন করে ?

কিটু লাহিড়ির ঘরে কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় দরজার ঘণ্টা বাজল দু'বার। এই দু'বার ঘণ্টা বাজানোর কায়দা থেকেই বোঝা গেল প্রকৃতি। বাঘাকাকা উপর থেকেই সুইচ টিপে দরজা খুলে দিলেন। প্রকৃতি একটা প্যাকেট নিয়ে ঘরে ঢুকে বলল, দারুণ হয়েছে কিট্‌দা, দারুণ হয়েছে।

—কি দারুণ হয়েছে রে ?

—ঐ যে তুমি আমাকে একটা ফিল্মের রোল দিয়েছিলে না ? ডেভলপমেণ্ট আর এনলার্জ করা হয়ে গেছে। আহা প্যাঁচাটা যা ছবিতে এসেছে না। আহা, বড় চমৎকার।

—কই দেখি দেখি ?

প্যাঁচার একটা ছবি বড় করেই করেছে। সেরকমই বলা ছিল ল্যাবরেটরিকে। আহত ধূসর রঙের প্যাঁচা ডানা ঝাপটাচ্ছে। করুণ দৃষ্টি তার—

কিটু বলল, ভাল কথা মনে পড়ে গেল। ডাক্তার আদিত্যকে জিজ্ঞেস করে জানতে হবে প্যাঁচাটা আছে কেমন ?

কিন্তু অন্য ছবিগুলোও দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে ডাকল, বাঘাকাকা, এসে দেখে যাও বাঘাকাকা। বাঘাকাকা তাঁর ঘরে শুয়ে ছিলেন। বিকেল হয়ে আসছে। তিনিও কালো প্যাঁচার কথাই ভাবছিলেন। তিনি এসে বললেন, কি ব্যাপার, তিন ভাই একসঙ্গে কি শলা-পরামর্শ হচ্ছে ?

কিটু বাঘাকাকাকে প্যাঁচার ছবিটি দেখাল।

বাঘাকাকা ছবিটা দেখলেন। বললেন, ভারি আশ্চর্য, আমি এক্ষুনি কালো প্যাঁচার কথাই ভাবছিলাম। তারপর মিহিরকে বললেন, কিছু ভেবো না মিহিরবাবু একদম মন খারাপ কোরো না।

হঠাৎ প্রকৃতি বলল, কিট্‌দা মা একবার তোমাকে দেখা করতে বলেছেন। কালই বলেছিলেন কিন্তু বলতেই ভুলে গিয়েছিলাম। ফোন করে তোমাকে পাইনি। বেজেই গেল ফোন, কেউ ধরল না।

কিটু বলল, কেন ডেকেছেন রে ?

প্রকৃতি বলল, মাঝে মাঝে মায়ের অনেক কথা ভুল হয়ে যায়। কি একটা কথা তোমাকে বলতে চান।

কিটু বলল, দেখি একবার চেষ্টা করে ফোনটা লাগে কি না।

আট দশবার চেষ্টা করতেই ফোন বাজল। তারপর শোনা গেল, কে কাকিমা ? আমি কিটু। কি যেন বলবে আমাকে ?

—একটা কথা মনে পড়ল কিটু। বলতেও খারাপ লাগছে তোকে। তবু বলতেই হবে। ভুবনচরার ব্যাপারে এখনও লেগে আছিস তো ?

—কোনও মতে। কিটু বলল।

—মন দিয়ে লেগে যা। খুনেটাকে ধরতেই হবে। হ্যাঁ একটা কথা যেটা বলব ভাবছিলাম। এম এল এ-র বাড়িতে ঝি টেকে না।

—কি বললে, ঠিক যেন শুনিনি মনে হচ্ছে। তুমি কি বললে এম এল এ-র

বাড়িতে ঝি টেকে না ?

—তাই বলেছি তো আমি। তুই ঠিকই শুনেছিস।

কিট্টু বলল, কি ব্যাপার বলো তো ?

কাকিমা বললেন, অতশত জানি না, তবে ঐ বাড়ির ব্যাপার। তুই খুনের তদন্ত করছিস। যদি কাজে লেগে যায় খবরটা সেটা ভেবেই তোকে জানালাম।

—এ খবর আর কি কাজে লাগবে আমার। আজকাল ঝি কোন্ বাড়িতেই বা টেকে? ঝিয়ের সংখ্যাই তো এখন কমতির দিকে। কেউ কারু বাড়িতে আজকাল কাজ করতে চায় না। ভারি ঝামেলা চলছে। তবু কাকিমা, খবরটার জন্য ধন্যবাদ।

কাকিমা বললেন, প্রকৃতি ওখানে গেছে তো ?

—হ্যাঁ কাকিমা, ভয় নেই ও আমার কাছেই আছে।

—দেখিস ও যেন বেশি দাবা না খেলে। নভেম্বরের শেষে ক্লাসে পরীক্ষা আছে।

—না কাকিমা, ও দাবা খেলছে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। এক্ষুনি ও বাড়িতে চলে যাবে।

কিট্টু রিসিভার রেখে দিয়ে বলল, নো চেস্, বাই অর্ডার।

প্রকৃতি বলল, সেটা আমি বুঝতে পেরেছি মায়ের সঙ্গে তোমার কথা শুনেই।

কিট্টু বাঘাকাকাকে বলল, ভুবনচরার মাধবলালবাবুর বাড়িতে ঝি টেকে না, কাকিমা বললেন। কারণটা বের করতে পারবে বাঘাকাকা ?

বাঘাকাকা বললেন, সেটা কিছু শক্ত হবে না। আমার লোক এখন ঐ বাড়িতে কাজ করছে ঝি হিসেবেই।

—কে বাঘাকাকা ?

—সুরজপ্রসাদের বৌ সরযু।

—তোমার আউটফিটের একটা অংশ, তাই না ?

—হ্যাঁ তাই। সুরজপ্রসাদ দারুণ পকেট মারতে পারে। তার বৌও কম যায় না। সঙ্গে একটা ছেলে এবং মেয়ে রয়েছে। তবে সুরজপ্রসাদের বৌ সরযুর আসল কাজ বাড়িতে কাজ নিয়ে সেই বাড়ির খবর বার করা। এই কাজটি অবশ্য বিরিঞ্চিও করতে পারত, কিন্তু সে এখন ওর একটা কাজে মোগলসরাইতে গেছে।

কিট্টু উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, তুমি গ্রেট বাঘাকাকা। তুমি গ্রেট। তুমি ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছ ?

—কেন যাব না কিট্টুবাবু ? মিহিরবাবু ছাড়া পেয়েছেন ঠিক, কিন্তু তাতে যেখানকার সমস্যা সেখানেই রয়ে গেল। জানা তো গেল না খুনটা করল কে ?

মিহিরের মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটল।

কিট্টু বলল, তুমি তোমার মতো করে কাজ চালিয়ে যাও বাঘাকাকা, আর দেখি আমরা কি করতে প্যারি। তবে যে যা জানতে পারব পরস্পরকে জানাব—এটা তো একজনের কাজ নয়, এ হল গিয়ে টিম-ওয়ার্ক।

৬

কয়েক দিন পর সুরেষপ্রসাদ আর সরযু এল রাত্রে। বাঘাকাকা তাদের সাদরে বৈঠকখানায় নিয়ে এলেন। ডাকলেন, কিট্টুবাবু। কিট্টু তখন টিভি-তে একটা বিচ্ছিরি প্রোগ্রাম দেখছিল। খট করে টিভি-র সুইচটা বন্ধ করে বৈঠকখানায় এল। বাঘাকাকা পরিচয় করিয়ে দিলেন। সুরেষপ্রসাদ নামটা শুনে কিট্টু ভেবেছিল তার বয়স নিশ্চয় পঞ্চাশ-টঞ্চাশ হবে, কিন্তু দেখল তার বয়স খুব বেশি নয়, বড় জোর ত্রিশ।

কিট্টু একটা নমস্কার করল। একটু অদ্ভুত ধরনের হাসল। জিজ্ঞেস করল, কিছু জানা গেল ?

সুরেষপ্রসাদ বলল, কি জানতে চান বাবু ?

কিট্টু বলল, ঐ বাড়িতে ঝি হতে আপনার স্ত্রীর অসুবিধে হয়নি ?

সুরেষপ্রসাদ একগাল হেসে বলল, আজকাল বাবু ওটাই সবচেয়ে সহজ কাজ। যে কোনও বাড়িতে গিয়ে কেবল একবার বললেই হল, ব্যস। তার উপর সরযু কাজ জানে ভালো। বাসন ঝকঝকে তকতকে করে পরিষ্কার করতে পারে, আসবাবপত্রের ধুলো ঝাড়তে পারে, বই থাকলে যত্ন করে ধুলো ঝাড়তে পারে। স্বভাবটাও ভালো, কোনও বাড়িতে গেলে তারা ভারি খুশি হয়।

কিট্টু বাঘাকাকাকে বলল, একটু চা আর কিছু খাবার আনবে না বাঘা-কাকা ?

বাঘাকাকা বললেন, কেন আনব না ?

কিট্টু সরযুকে কি যে জিজ্ঞেস করবে ভেবে পেল না। সে কি তুমি বলবে, না আপনি ? সরযুকে সুন্দরীই বলা যায়, বেশ একটা লক্ষ্মীশ্রী আছে। তাঁতের শাড়িতে তাকে বেশ মানিয়েছে।

একটু পরে কিট্টু প্রায় হঠাৎই জিজ্ঞাসা করল, বাড়িটা কেমন ?

সরযু চমৎকার বাংলা উচ্চারণে বলল, পুরনো বাড়ি। বাগান আছে, বাগানের মধ্যে ভাঙা দালান আছে, সেখানে কেউ থাকে না।

—বাড়ির মানুষজন কেমন ?

—খুবই ভাল। সরযু বলল, ভদ্র পরিবার।

—ও বাড়িতে না কি ঝি টিকত না আগে। সেটা কেন, বাড়িতে কি খুব বেশি বেশি কাজ ?

—বেশি কাজ, কাজ শেষই করা যায় না, পাঁচ হাজার স্কোয়ার ফুটের চাইতেও বেশি, তাও সব ঘর ধরিনি।

সরযুর মুখে স্কোয়ার-ফুট কথাটা শুনে কিট্টু অবাকই হল। সেটা বুঝতে পেরে সুরেষ বলল, বাবু আজকাল সব ঝি-ই স্কোয়ার ফুট বুঝে নিয়েছে।

—তা হলে বড় বাড়ি দেখেই কি ঝিয়েরা চলে যায় ?

সরযু বলল, সে একটা কারণ বটে। মেঝেগুলোও ঠিক সব জায়গায় মসৃণ

নয়। নানা জায়গায় গর্ত খুঁড়ে যেমন-তেমন করে বুজিয়ে রাখা। মুছতে ভারি মেহনত হয়। তবে আসল কারণ আলাদা।

—কি সেটা ?

সরযু বলল, সে আমি বলতে পারব না।

সরযু সহজ-সরল ভাবে বাংলা বলে। কলকাতাতেই ওর জন্ম, ছোটবেলা থেকেই বাঙালি ভদ্র পরিবারে মানুষ। লেখাপড়াও কতক দূর করেছে। রুচি-বোধও আছে। কতক প্রসঙ্গ বলতে সে লজ্জা পায়।

সুরেয বলল, আমি বলছি। ঐ বাড়ির বুড়ো—নামটা কি যেন সরযু, মধুলাল ?

—মাধবলাল। কিটু বলল।

—হ্যাঁ, ঐ মাধবলালবাবু—ওঁর স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকেই উনি যাকে বলে মেয়েদের উপর নেক্‌নজর দিতেন। যুবতী ঝি-দের নিজের ঘরে ডেকে পাঠাতেন। পা টিপিয়ে নিতেন। তারপর কি বলব, সরযু পাড়া থেকে জানতে পেরেছে তাদের টাকার, গয়নার লোভ দেখাতেন। আর ঝি যদি বেশি বয়সের হত, তাহলে এমন খিটখিট করতেন আর মেজাজ দেখাতেন যে তা সে বাড়িতে আর কাজ করত না। তাদের ভারি বয়ে গেছে ও-বাড়িতে কাজ করতে। আজকাল কি ঝিয়ের কাজের অভাব আছে এদেশে ?

এ কথা শুনে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। কথাটা নতুন বলেও আর মাধব-লালবাবুর মতো বৃদ্ধ সম্পর্কে কথাটা অপ্রত্যাশিত বলেও।

সরযু বলল, ভালই হয়েছে বুড়োটা মরেছে। যেই খুন করুক কাজটা ভালই করেছে।

সুরেয হাসতে লাগল। সরযু বলল, তুমি আবার হাসছ কেন ? ভুল কী বলেছি আমি ?

সুরেয বলল, এই অপরাধে যদি লোক মারতে হয় তাহলে তো…।

বাঘাকাকা বললেন, ও-সব কথা এখন থাক। সরযু আর কিছু বলবে নাকি ?

সরযু বলল, কেন বলব না ? ও বাড়িতে থাকলে মনেই হয় না কেউ মারা গেছে। মনে হয় বুড়ো মরাতে সকলেই বেশ খুশি।

—কেন ? কিটু প্রশ্ন করল।

—সম্পত্তি। সরযু বলল, লাখ লাখ টাকার ব্যাপার। নগদ ছাড়াও গয়না, ঘড়ি, কোম্পানির কাগজ, কালোপ্যাঁচা। এই নিয়ে যেমন হাসি, তেমনি আবার কে কি নেবে, কে কি পাবে তা নিয়ে উত্তেজনা, তর্কাতর্কি, ঝগড়া।

—কাদের মধ্যে তর্কাতর্কি আর ঝগড়া ?

—সকলেই ঝগড়ায় ওস্তাদ। অভিনববাবুর সঙ্গে বিমানবাবুর। মাধবলাল-বাবুর মৃত্যুর পর থেকে বিমানবাবু তো ভুবনচরায় গিয়ে বাস করছেন। সঙ্গে স্ত্রী নিলয়া, তাঁদের দশ বছরের মেয়ে ছন্দা। নিলয়ার সঙ্গে অভিনববাবুর তর্ক হচ্ছে। অভিনববাবুর স্ত্রীর সঙ্গে বিমানবাবুর নানা কটুবাক্য চলেছে। ছোটদের মধ্যেও ভারি একটা অস্বাভাবিক ভাব। বিমানবাবু বলেছেন, ঘড়িটা তাঁর চাই।

—ঘড়িটা ? কিটু প্রশ্ন করল, কোন্ ঘড়ির কথা হচ্ছে ?

সরযূ বলল, একটা পুরনো ঘড়ি নাকি আছে ও বাড়িতে। সোনার ট্যাক ঘড়ি। পুরনো আমলের। মাধবলালবাবুর ঠাকুর্দার বিয়ের সময়কার। ম্যাক কোম্পানির ঘড়ি। খুবই দুষ্প্রাপ্য।

—ম্যাক কোম্পানি ? কিটু প্রশ্ন করল, ম্যাক, না ম্যাক-এব !

—ম্যাক-এব। হ্যাঁ ঠিকই। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। সরযূ বলল, তা ঘড়িটার দাম একশো ত্রিশ টাকা ছিল সেকালে। এখন নাকি অনেক দাম—লাখ লাখ টাকাও নাকি কেউ দাম দিতে পারে। নিলয়া বলেছেন, ও বাড়ির কোনও সম্পত্তি তাঁর চাই না, চাই ঐ ঘড়িটা। তিনি বলেছেন কালো প্যাঁচা-ফ্যাচাও তাঁর দরকার নেই। অবশ্য তিনি বলেছেন, শ্বশুরের সম্পত্তি তাঁর স্বামী যা পাবার পাবেন, তাতে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, তা ছাড়া ঘড়িটা তিনি পাবার অধিকারী কেন না তাঁর শ্বশুর ঘড়িটা ওঁকে দেবেন বলেছিলেন। বিয়ের পর ঘড়িটা নাকি নিলয়াকে দেবেন বলেছিলেন। আবার অভিনবাবুর স্ত্রী হরিপ্রিয়া দেবী বলেন, ইয়ার্কি নাকি, মরে যাই আর কি। যে বৌকে শ্বশুরমশাই বাড়িতে ঢুকতে দিতে চাইতেন না, তিনি তাকে সোনার ঘড়ি দেবার প্রতিশ্রুতি দেবেন ? সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। হেসে বাঁচিনে। ও ঘড়ি শ্বশুরমশাই হরিপ্রিয়াকেই দেবেন বলেছিলেন।

সরযূ একটু থামল। তারপর বলল, দু-জনের একজন মিথ্যেবাদী।

বাঘাকাকা এতক্ষণে চা তৈরি করে এনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, তা কেন সরযূ, হয়তো দু-জনেই সত্যি কথা বলেছেন। মানুষের মতি-গতি সময়ে-সময়ে পালটেও যায়।

কিটু বলল, আবার দু-জনেই মিথ্যে কথা বলতে পারেন ম্যাক-এব ঘড়িটা বাগানোর জন্য ?

বাঘাকাকা বললেন, হ্যাঁ তাও হতে পারে বটে। কিন্তু গয়না ? ওঁর কাছে গয়না ছিল নাকি ?

—মায়ের গয়না ছিল, সে অনেক। কিছু কিছু দিয়েছেনও। স্ত্রীর গয়নাও ছিল ভালই। বড় বৌকে কিছু দিয়েছেন, মেজো বৌকে একটা হার দিয়েছিলেন, মেজো বৌয়ের মেয়ে ছন্দাকে দিয়েছিলেন আটটা চুড়ি। পুরনো গয়না থেকে গড়িয়ে দিয়েছিলেন, তবে ছোট ছেলের স্ত্রীকে কিছু দেননি।

—তা হলে বাড়িটা ডাকাতদের পক্ষে ভারি চমৎকার ছিল বলতে হয় ?

সরযূ বলল, বাড়িতে কিছু থাকত না মনে হয়। কলকাতার ব্যাঙ্কের ভল্টে অনেক কিছু রাখতেন তিনি। অন্তত ডাকাতরা তাই মনে করেই ও বাড়িতে ডাকাতি করেনি, নইলে ঐ অঞ্চলে ডাকাতি কম হয়েছে নাকি ?

কিটু ভাবল, কত সম্পত্তি ছিল মাধববাবুর। বহু টাকার ব্যাপার। এর জন্য ওঁকে খুন যে-কেউই করতে পারে।

সরযূ বলল, মাধবলালবাবুর সঙ্গে এক সাধুর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। বছর খানেক আগে ভুবনচরায় এক সাধু আসেন। দারুণ সাধু। বড় বড় দাড়ি-গোঁফ,

গায়ে গাঁজার গন্ধ। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে ত্রিশূল। অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর। কত রোগ তিনি ছাই খাইয়েই সারিয়ে দিতে পারতেন। কখনও আবার ছাই মাখিয়েই অসুখ সারিয়ে দিতেন। অবশ্য মন্ত্রও পড়তেন ওষুধ দেবার সময়।

—বুজরুকি। বলল মিহির, আমি বিশ্বাস করি না।

সরযু বলল, মাধবলালবাবুর সিল করা ঘর কাল খোলা হবে। আদালত নির্দেশ দিয়েছে ঘর খুলবে পুলিশ। সাক্ষী থাকবেন অন্তত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। প্রথমে পুলিশ দেখবে হত্যাকারী কোনও প্রমাণ রেখে গেছে কি না। তার পর বড় ছেলে আর মেজো ছেলে হাতে পাবেন চাবি। পুলিশ অবশ্য আলমারির ভেতর কি আছে প্রয়োজনে দেখতে পারে।

—এ ভারি অন্যায় কথা। এ তো একজনের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো। একজন নাগরিকের অধিকার এতে লঙ্ঘিত হয়, বোধ হয়। আফজল বলল।

কিটু বলল, এটা অবশ্য নির্ভর করে ঘটনার গুরুত্বের উপর। এটা নিশ্চয় তোমার জানা আছে আফজল, আদালত যদি মনে করে পুলিশকে এই ক্ষমতা না না দিলে তদন্তে ব্যাঘাত জন্মাবে, খুনিকে ধরা যাবে না, তা হলে আদালত সে ক্ষমতা দিতে পারে—তবে অন্তত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে পুলিশ আলমারি খুলতে পারবে এ-ক্ষেত্রে।

বাঘাকাকা বললেন, কাল একবার ভুবনচরায় যেতে পারলে ভালো হত।

কিটু মাথা চুলকে বলল, ভুবনচরায় গেলে তো কেবল হবে না, ঐ বাড়িতে ঐ সময় উপস্থিতও থাকতে হবে। তাতে পুলিশ রাজি হবে কি? তা ছাড়া অভিনববাবু বিমানবাবু এঁরা ও বাড়িতে বাইরের লোককে ঢুকতে দেবেন কেন? ওটা ওঁদের পারিবারিক ব্যাপার—এতে ওঁরা আমাদের সাহায্যও চাননি। আমরা হলাম গিয়ে যাকে বলে স্ব-নিযুক্ত গোয়েন্দা! এতে আমাদের যতই উৎসাহ, স্বার্থ কিংবা আগ্রহ থাক ওঁদের ভারি বয়ে গেছে। পুলিশও এটাকে তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ বলেই মনে করবে।

—ঠিক কথাই। বাঘাকাকা বললেন, তবে একটা উপায় হতে পারে বোধহয়।

—কি রকম?

বাঘাকাকা বললেন, সরযু আজই আবার চলে যাক ঐ বাড়িতে। ও দু-দিনের ছুটি নিয়ে এসেছে। মাইনেও নেয়নি। ও যা দেখবার দেখবে, যা শুনবার শুনবে, যা করবার করবে। তা ছাড়া ডাক্তার আদিত্যও আমাদের সাহায্য করতে পারেন।

—ডাক্তার আদিত্য? কিটু বলল, চমৎকার আইডিয়া। কথাটা ঠিকই বলেছ বাঘাকাকা। উনি ঐ পরিবারেরই ডাক্তার, পুলিশ যখন উপস্থিত হয়ে দরজা বা আলমারি খুলবে তখন উনি যা দেখবেন আর শুনবেন সেটা আমাদের অনুসন্ধানের কাজে লেগে যেতে পারে। উইল আছে কি না জানা যেতে পারে তাও।

আফজল বলল, ডাক্তার আদিত্য যখন ঐ বাড়িতে যাবেন তখন সঙ্গে তুমিও যেতে পারো কিটু। ওঁর সঙ্গে গেলে কেউ আপত্তি করতে পারবে না।

—এটা চমৎকার আইডিয়া। প্রকৃতি বলল, অবশ্য মাকেও এই কাজে লাগানো যায়। মা আজই ঐ বাড়িতে চলে যেতে পারে তো।

কিটু বলল, না না, কাকিমাকে ঐ বাড়িতে পাঠানোটা কাজের কাজ হবে না। ঐ বাড়িরই কেউ মাধবলালবাবুকে খুন করেছে, ওখানে কাকিমা গেলে ব্যাপারটা প্যাঁচালো হয়ে দাঁড়াতে পারে। কাকিমার প্রাণ-সংশয়ও হতে পারে যদি উনি কিছু জানতে পারেন এবং খুনি যদি সেটা জানতে পারে! এ কাজে কাকিমা নয়, ডাক্তার আদিত্যেরই শরণ নিতে হবে। আফজল, তোমার গাড়িটা পাওয়া যাবে ?

আফজল বলল, আমার গাড়ি ? ওটা খবরের কাগজের গাড়ি। ও গাড়িতে বোধ হয় যাওয়া ঠিক হবে না। ভুবনচরার মানুষ ঐ গাড়ি চিনে রেখেছে না ? এর চাইতে একটা ট্যাক্সি নিলেই ভাল হয়।

—ট্রেনে গেলেই বা ক্ষতি কি ? কিটু বলল।

—খারাপ হবে না। বাঘাকাকা বললেন, সাত-আট কিলোমিটার হাঁটতে মন্দ লাগবে না গ্রামের পথে।

—তা হলে আজই বেরোতে হয়। মানে এখনই।

আফজল বলল, সবার গিয়ে কাজ নেই। এক দল গেলে লোকেরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে। কিটু একা গেলেই ভাল হত, ওর অসুবিধে হবে তাতে। সঙ্গে আমিও যাব। কিটু সঙ্গে একটা ব্যাগে এক রাতের মতো জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। আমিও রাস্তায় দু-একটা জিনিস কিনে নেব। তার আগে অফিসে ফোনটা করা দরকার।

তারা বিকেলে গিয়ে পৌঁছুতে পারল ভুবনচরায়। অকস্মাৎ ওরা চমকে উঠে দেখল মহেন্দ্র পাল একটা সাইকেল ধরে ওদের খুবই কাছাকাছি দাঁড়িয়ে হাসছেন। তিনি বললেন, নমস্কার বাবুগণ, এই গ্রামে মানুষ থাকে না, কথাটা ঠিকই বলেছেন। তারপরই বললেন, আমাকে চিনতে পারছেন না ? এই অধমের নাম মহেন্দ্র পাল, নমস্কার।

ওরা দু জনেই নমস্কার করল।

মহেন্দ্র পাল বললেন, আমার নাম মহেন্দ্র পাল. কিন্তু আপনাদের কলকাতার কাগজে ছাপা হবে এম পি! স্থানীয় এম পি !! অবশ্য যদি কেউ আমাকে বিষ-টিষ দিয়ে মারে, নইলে আমি কে মশাই যে আমার নাম খবরের কাগজে ছাপা হবে ?

তারপর একটু চাপা স্বরে বললেন, ব্যাপারটা কি মশাই ?

কিটু বলল, কিসের ব্যাপার ?

মহেন্দ্র পাল বললেন, কিসের ব্যাপার তাও কি বলে দিতে হবে নাকি ? আপনারা যে এদিকে আবার এসেছেন সে তো আর প্রাকৃতিক দৃশ্য-ফিশ্য দেখার জন্য নয়। কি মশাইগণ ঠিক বলেছি কি না ?

আফজল বলল, আপনার দোকানঘর মেরামত করে নিয়েছেন তো ?

—তা ভগবানের দয়ায় মেরামত এক রকম হয়ে গেছে।

—এখন কি মিষ্টি পাওয়া যাবে ?

মহেন্দ্র পাল এবারে বেশ খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন, হ্যাঁ আমার মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের দ্বার আপনাদের জন্য সর্বদাই খোলা। আমার দোকানের ছানার জিলিপি, নিজ মুখেই বলছি, এ অঞ্চলে তো নেইই, আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। একটা কথা মনে পড়ল আপনাদের দেখে।

—কি কথা ?

—শেয়ালের কথা। সেই যে মশাইগণ আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না, সেদিন আমি বলছিলাম শেয়ালেরা সব এদেশ থেকে উধাও হয়ে গেছে ? না মশাইগণ, তা ঠিক নয়। সেই ঝড়ের রাতে আমার স্ত্রী শেয়ালের ডাক শুনেছিল। হ্যাঁ মশাই আমারই স্ত্রী।

একটু পর মহেন্দ্র পাল বললেন, কি মনে হচ্ছে আপনাদের, বাড়িরই কেউ হবেন, কিন্তু কে ?

কিটু বলল, বাড়িরই কেউ হবেন, এর মানেটা কি ?

মহেন্দ্র পাল হাসলেন। বেঁটেখাটো, সাদায় কালোয় খোঁচা-খোঁচা দাড়িওলা লোকটির হাসিতেই বোঝা গেল তিনি খুব সহজ লোক নন। তিনি বললেন, এর অর্থ কি সেটা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝেছেন, আপনারা খুব ছেলেমানুষ নন। তবে কি না একটা কথা। বাড়ির কেউ না হলে আমার ধারণা, এটা কেবলই আমার ধারণা, আমার কথা সত্যি নাও হতে পারে—এই ব্যাপারে এক ডাক্তারই জড়িত। নইলে বলুন ঐ মারাত্মক বিষ কে আর যোগাড় করতে পারবে, আপনারাই বলুন। ভেবে নিন তিনি এই গ্রামেরই অতি পরিচিত ডাক্তার, তা নইলে কার সাধ্য··· ।

এবার তারা পেঁৗছে গেল মহেন্দ্র পালের দোকানের সামনে।

—ছানার জিলিপি দেব নাকি দুখানা করে ?

আফজল আর কিটু দু জনেই খুব ক্লান্ত। পায়ে বেশ ব্যথা। বসতে পারলে বেশ হয় এটাই তাদের মনে হল, কিন্তু একটু পর ছানার জিলিপি খেয়ে তারা সত্যি সত্যি মুগ্ধ হয়ে গেল।

দোকান থেকে বেরিয়ে কিটু বলল, লোকটি সহজ-সরল নয় কিন্তু। বেশ কৌশলে তিনি জানিয়ে দিলেন ডাক্তারের সম্পর্কে তাঁর সন্দেহের কথা। তিনি নাম করলেন না, তবে তাঁর কথার আসল অর্থ জানার জন্য বিরাট অঙ্কের প্রয়োজন নেই। ডাক্তার আদিত্য সম্পর্কে তাঁর সন্দেহের কারণটা কি ? ডাক্তার আদিত্যর সঙ্গে মাধবলালবাবুর সম্পর্ক ঠিক সবটা রোগী-ডাক্তারের মতো ছিল না। ভেবে দ্যাখো আফজল, প্রতি সপ্তাহে ডাক্তার আদিত্য যেতেন মাধবলাল-বাবুর বাড়িতে। ডাক্তারের পক্ষে বিষ সংগ্রহ করা কঠিন নয়। ডাক্তার একটা শিশির মধ্যে বিষ বড়ি রেখে দিলেন, আর কোনও এক সময়ে সে ওষুধ মনে করে বিষ বড়িটি খেয়েই পটল তুলল।

আফজল বলল, এ বিষ কি গ্রামের ডাক্তারের পক্ষেও সংগ্রহ করা সম্ভব? না কিটু, তাঁর পক্ষেও এটা খুব সহজ কাজ নয়।

কিটু বলল, কথাটা ঠিকই, সহজ কাজ নয়, কিন্তু তোমার আমার পক্ষে এ বিষ সংগ্রহ করা যত কঠিন, একজন ডাক্তারের পক্ষে অতটা কঠিন হয়তো নয়। তা ছাড়া ভেবে দ্যাখো, ডাক্তার যে সর্বদা গ্রামেই থাকছেন তা তো নয়। তাঁর গাড়ি আছে, তিনি বারাসত যান সেখানে তাঁর রোগী আছে, নার্সিং হোমে যান অপারেশন করতে। কলকাতাতেও তিনি প্রায়ই যান। এই মারাত্মক বিষ তিনি গ্রাম কখনও সংগ্রহ করে রেখে দিয়ে কোনও এক সময়ে সুযোগ বুঝে ওষুধের শিশির মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন।

—কি সুযোগ? আফজল বলল, এর মধ্যে তো সুযোগের কোনও ব্যাপারই দেখতে পাচ্ছি না। সুযোগ তাঁর তো ছিলই, সর্বদাই সে সুযোগ তিনি পেয়েছেন। কিন্তু কথা তা নয়, কথাটা হল ওঁর মোটিভটা কি? অর্থাৎ, ওঁকে মেরে ডাক্তারের লাভটা কি? জানো তো কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ডিম্ব-প্রসবিনী হাঁসিকে খুন করে না। যাঁর বাড়ি থেকে সপ্তাহে অন্তত একশো টাকা আয় হয় তাঁকে বাঁচিয়ে রাখাই তো তাঁর স্বার্থ রক্ষার উপায়। তাঁকে মেরে ফেলা কেন? ডিম্ব-প্রসবিনী হাঁসিকে মেরে কি কেউ সজ্ঞানে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে চায়?

কিটু হাসল।

আফজল বলল, হাসছ কেন কিটু, আমি কি কিছু অন্যায় কথা বলেছি?

কিটু বলল, না, আমি হাসছি তোমার স্বর্ণ ডিম্ব-প্রসবিনী হাঁসি কথাটা শুনে।

—ও তাই নাকি? আফজল বলল।

কিটু বলল, ডাক্তার আদিত্যের কথাটা তবু অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

—ড্যাম ইট। আফজল বলল, গোয়েন্দা হওয়ার ঐ এক মুশকিল। সকলকে সন্দেহ করাটা একটা রোগ হয়ে দাঁড়ায়। এ-রকম একটা পেশার লোক সুখী হতে পারে না।

কিটু বলল, জানি ভাই। এই পেশায় আমি থাকতেও চাই না আর। ভারি মন খারাপ হয়ে যায় মাঝে মাঝে। তবু ভেবে দ্যাখো, ডাক্তার আদিত্যের ব্যাপারটা সন্দেহজনকই।

আফজল বলল, মোটেই না। তোমার মাথাটা ক্রমশ মোটা হয়ে পড়ছে। প্রথমত ডাক্তার আদিত্য যদি তাঁর রোগীকে মারতেই চাইবেন তাহলে তিনি সায়ানাইড দিয়ে মারতে যাবেন কেন। যেখানে তিনি আরও সূক্ষ্মভাবে, ওষুধের সামান্য অদল-বদল ঘটিয়ে, কিংবা ওষুধের ডোজ বদলিয়ে কাজটা করতে পারতেন সেখানে অত ভয়ঙ্কর বিষ কেন প্রয়োগ করতে যাবেন?

কিটু বলল, ধরো তিনি চান সন্দেহটা অন্য কারু উপর গিয়ে পড়ুক? অর্থাৎ, মাধবলালবাবুকে হত্যা করা তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, তাঁর উদ্দেশ্য হল অন্য কারুকে এই ব্যাপারে জড়ানো। তা হলেই কেবল বোঝা যায় তিনি নিজে বিষ-প্রয়োগ করেও ডেথ-সার্টিফিকেট লেখার সময় কেন লিখবেন মৃত্যুটা সন্দেহ-

জনক। অর্থাৎ, ডাক্তার আদিত্য এখানে এক মারাত্মক খেলা খেলে থাকতে পারেন। তিনি চান অন্য কেউ ধরা পড়ুক। আবার দ্যাখো, মহেন্দ্র পাল মশাইও ডাক্তার আদিত্যকেই সন্দেহ করার কথা বললেন।

আফজল বলল, তিনি ডাক্তার আদিত্যের কথা মোটেই বলেননি, তিনি বলেছেন এই গ্রামেরই পরিচিত কোনও ডাক্তারের কথা। এই গ্রামের পরিচিত ডাক্তারের অভাব নেই, যদিও তাঁরা স্বশরীরে গ্রামে থাকেন না, তবু দ্যাখো, বিমানবাবু নিজে ডাক্তার নন, কিন্তু তিনি তাঁর শ্বশুরের ডাক্তারখানা চালান। মাধবলালবাবুর তৃতীয় পুত্র বিশ্বলাল ছিলেন ডাক্তারির ছাত্র। গ্রামের লোকের কাছে তিনিও ডাক্তার বলেই পরিচিত হতে পারেন। আবার ট্রেইনড নার্স রাধাময়ী, ওরও থাকতে পারে ডাক্তারের সঙ্গে সম্পর্ক, বিষ সংগ্রহ করার সুযোগ এরও রয়েছে। আরও দ্যাখো, বিনতা দেবী নিজে ডাক্তার নন, কিন্তু তাঁর স্বামী ডাক্তার, বর্তমানে রয়েছেন বিদেশে, কিন্তু তবু তাঁর মাধ্যমে বিনতা দেবীর পক্ষে বিষ সংগ্রহ করা সম্ভব। ঠিক সময়ে বিনতা দেবী সে বিষ তাঁর বাবাকে খাইয়ে দিলেন।

কিট্টু বলল, না আফজল, সেটা হতে পারে না।

—কেন হতে পারে না?

—মাধবলালবাবু আর সকলকে ভাল না বাসলেও নিজের কন্যার প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল।

আফজল বলল, তুমি বলছ বিনতা দেবী তাঁর কন্যা ছিলেন। কিন্তু বাবার মৃত্যু হলে সবচেয়ে বেশি লাভ যে প্রিয় কন্যারই হওয়ার কথা। বিশেষ করে তিনি যদি উইল করেন তাহলে প্রত্যেককে বঞ্চিত করলেও বিনতা দেবীকে নিশ্চয় বঞ্চিত করবেন না।

—সেটা ঠিক। কিট্টু বলল।



৭

কথা বলতে বলতে তারা অন্যমনস্ক হয়ে ডাক্তার আদিত্যর বাড়ি ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিলো, সেটা বুঝতে পেরে আবার ফিরে এলো ঐ পথ দিয়েই। এবার বেশ অন্ধকার হয়ে আসছে। ডাঃ আদিত্যর বাড়ি অবশ্য চিনতে ভুল হয়নি। বিদ্যুতের আলো আসছে কাঁচের জানালা দিয়ে। দরজার সামনে একটা ছোটো আলো জ্বলছে। তাতে ডাক্তারের নেমপ্লেটে লেখা অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে ডাক্তার বিনায়ক আদিত্য। আফজল ঘণ্টার সুইচ টিপল। মনে হল কোনও ছুঁচো সাইকেল রিকশা চাপা পড়ে চিক্ চিক্ চিক্ করে উঠল। আধুনিক বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় নানা রকম অদ্ভুত আওয়াজ হয় সেটা ওরা জানে বলে চমকালো না। দরজা খুলে দিলেন রানিদি। ওদের দেখে রানিদি বেশ চমকে গেলেন। অকস্মাৎ তাঁর মুখ ম্লান হয়ে গেল। কোনও মতে বললেন, কি ব্যাপার ভাই ?

কিটু প্রশ্ন করল, ডাক্তার আদিত্য কি বাড়িতে আছেন ? রানিদি বললেন, আছেন, কিন্তু তিনি অসুস্থ। এখন দেখা হবে না ভাই। তিনি দরজা বন্ধ করার ভঙ্গি করলেন।

কি আশ্চর্য ! কিটু ভাবল, সেদিন রানিদির ছিল কি চমৎকার ব্যবহার আর আজ তিনি যেন তাদের চিনতেই পারছেন না।

আফজল বলল, দু-এক মিনিটের জন্যও কি দেখা হয় না ?

রানিদি মাথা নাড়লেন। বললেন, না, হয় না। কাল সকালে এসো।

এমন সময় ডাক্তার আদিত্যর জড়িত কণ্ঠস্বর শোনা গেল— কে ?

কিটু বলল, আমরা— আমরা একটা কথা বলতে এসেছিলাম।

ডাক্তার আদিত্য বেরিয়ে এলেন। মনে হল তিনি বৈঠকখানাতেই ছিলেন। একটু উসকো খুসকো উদ্ভ্রান্ত চেহারা। কিটুদের দেখে বললেন, আরে ভাই এসো এসো। এই সময়ে আমার কাছে কেউ আসে না। এই সময় রোজই আমি অসুস্থ থাকি, সেটা সকলেই জানে, তোমরা জানবে কেমন করে ?

ডাক্তার আদিত্যর মুখ থেকে অ্যালকোহলের তীব্র গন্ধ বেরুচ্ছে। অসুখ হয়েছে কি না, তাই একটু ওষুধ খাচ্ছিলাম, দাদার সঙ্গে। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। ওষুধ চলে নাকি ?

কোনও জবাব না দিয়ে ওরা দুজন ডাক্তার আদিত্যর পেছন-পেছন বৈঠকখানায় ঢুকল। একটা বড় বোতল রাখা আছে টেবিলে। পাশে দুটি গ্লাস। একটা জলের যাগ। প্লেটের উপর রাখা কিছু কাজু বাদাম, মাছ ভাজা। টেবিলের পাশে একজন কালো চেহারার মানুষ বসে আছেন। সুট পরা, টাইটা একটু ঢিলে, চুলগুলো প্রায় সাদা। চেহারা অনেকটা ফোটোগ্রাফের নেগেটিভের মতো।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, ইনি হলেন বিদ্যাচরণ গুঁই, এঁর একটা অমৃত ভাণ্ডার আছে। বলে তিনি হা-হা করে হাসলেন। তারপর বললেন, এরা হল আমার তরুণ বন্ধু—একজন গোয়েন্দা, অন্য জন খবরের কাগজের রিপোর্টার।

—কি সাংঘাতিক। বললেন বিদ্যাচরণ গুঁই।

কিট্টুর মনে পড়ল ভুবনচরা থেকে মিহিরের খবর এঁরই জামাতা রামমোহনবাবু নিয়ে গিয়েছিলেন সেদিন। বিদ্যাচরণ গুঁই সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, ভারি সাত্ত্বিক লোক।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, এ গ্রামের বোধহয় সকলেই জানে আমি সন্ধেবেলা আউট কিন্তু সত্যি সত্যি আউট হই না কখনও। বলে হা-হা করে হাসলেন খানিক। বললেন, আউটের কতগুলি মানে হয় জানো তো? হা-হা! তারপর ডাকলেন, রানি! রানি!

গম্ভীর মুখে রানিদি দরজা খুলে ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়ালেন। ডাক্তার আদিত্য বললেন, অতিথি এসেছে—এদের জন্য কিছু মাছ ভাজা হবে তো? রানিদি কোনও কথা না বলে বেরিয়ে গেলেন। ডাঃ আদিত্য বললেন, তোমাদের কি অমৃত চলে? চলে না? হা-হা, আজকালকার তরুণ তোমরা, যদি তোমরা সরকার-বিরোধী কাজ করো তাহলে সরকার চলবে কেমন করে? তাহলে শোনো, এই একশো কুড়ি টাকার বোতলের মধ্যে সরকার নানাভাবে পান প্রায় নব্বুই টাকা! অতএব মদ্যপমাত্রেই এক একজন প্রকৃত দেশসেবক, কী বলেন, গুঁইমশাই?

গুঁইমশাই হাসলেন। কম আলোয় তাঁর চমৎকার সাদা ঝকঝকে দাঁত চিকচিক করে উঠল কেবল। তিনি বললেন, আর বলেন কেন, একটা বোতলে আমার যা লাভ হয় তা শুনলে শেয়াল-কুকুরও কাঁদবে, সরকারই তো আমাদের ব্যবসার বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে। তার উপর এই সব অঞ্চলে কে আর বোতলে পোরা আইনসঙ্গত দিশি-বিলিতি মাল কিনতে যাচ্ছে। যাদের পয়সা নেই তেমন, তারা বাড়িতেই বানিয়ে নিচ্ছে যে-যার মতো, আর যাদের পয়সা আছে, তারা ওই বে-আইনি চোলাই মালই পয়সা দিয়ে কিনে সাঁটছে, আরে বাবা, নিজেদের স্বাস্থ্য দেখবি না তাই বলে? ওই মাল খেলে শরীর-পেট দু-দিনেই ঝাঁঝরা হয়ে যাবে না? দেশেরই বা উন্নতি হবে কেমন করে, অ্যাঁ আপনারাই বলুন?

রামমোহনবাবু এঁকেই বলেছিলেন সাত্ত্বিক লোক!

কিট্টু আর আফজল চুপ করেই রইল। ওদের মনে পড়ল ডাঃ আদিত্যের অন্য এক মূর্তির কথা। সেই প্রথম দিনের মূর্তি। রোগী দেখছেন, প্যাঁচার চিকিৎসা করছেন। নেশা করার বিরুদ্ধে কথা বলছেন। মানুষকে দেখে চেনা যে ভারি মুশকিল সেটা কিট্টু জানত ঠিকই, কিন্তু আবার প্রমাণ পেল। এটা বেশ বড় গোছের প্রমাণ। একটু পরে রানিদি ঘরে ঢুকলেন কচি বেগুনভাজা আর লুচি নিয়ে। বললেন, ইলিশমাছ তো আর নেই। এর সঙ্গে ডিম ভাজা চলবে তো?

একটু আগে দুটো করে ছানার জিলিপি খেয়েছে, অতএব ভদ্রতা নয়, সত্যি সত্যিই বলল, না দিদি এতেই হবে। এর সঙ্গে যদি একটু চা পেতাম তো বেশ

হত। আফজল বলল।

রানিদি চলে গেলেন।

—চা বুঝি নেশা নয়? ডাক্তার আদিত্য বললেন, আর এইটেই নেশা? বলে বোতলের দিকে আঙুল দেখালেন।

ওদের চুপ করে থাকতে দেখে গুঁইমশাই বললেন, ডাক্তারবাবু কী বলে জানেন, তিনি বলেন, চা হচ্ছে চাকরদের ব্যাপার! চাকর জানেন তো, সে পুরনো আমলের কথা, চা বাগানের সায়েব কর্তাদের বলা হত চা-কর। সেই চাকর। হা-হা-হা!

বেশ খোলামেলা হাসি। কিট্টু ভাবল আজকাল দেশ থেকে হাসি কমে যাচ্ছে—সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে একটু আধটু অ্যালকোহল বোধহয় সকলেরই খাওয়া উচিত।

কিছুক্ষণ এটা সেটা কথার পর গুঁইমশাই উঠলেন।

গুঁইমশাই চলে গেলে ডাক্তার আদিত্য বললেন, কী ব্যাপার গোয়েন্দা এবং সাংবাদিক? মনে হচ্ছে কিছু সাহায্য চাই?

—ঠিকই ধরেছেন ডাক্তার আদিত্য। কিট্টু বলল, আপনার সাহায্য আমাদের একান্ত দরকার।

এর পর সে বলল, মিহিরের স্বার্থেই আসল হত্যাকারীকে বার করা দরকার।

—মিহিরের স্বার্থে? ডাক্তার আদিত্য বললেন, সেই মাতালটার স্বার্থে?

কিট্টু ভারি অবাক হল এবার। যিনি নিজে মদ টানছেন তিনি মিহিরকে মাতাল বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছেন।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, বুঝতে পেরেছি তুমি কী ভাবছ। আমি নিজে মদ টানি ঠিকই, কিন্তু কখনও বেহেড হই না। আমার একটা মাত্রা আছে। একটা বোতলের এক তৃতীয়াংশ আমার সর্বোচ্চ সীমা। এর বেশি কখনও নয়। আমি মাতাল হই না। এই অবস্থাতেও দরকার হলে কঠিন অস্ত্রোপচার করতে পারি। আমার মস্তিষ্কের যে সব কোষ আছে সেগুলি বেশ চাঙা হয়ে ওঠে, কিন্তু খেপে যায় না, যা মাতালদের হয়। আমার কথা আলাদা। আমি সব সময়েই নট আউট।

আফজল ভাবল এরকম মনের ভাব মাতালদেরও হয়।

কিট্টু বলল, মিহির সাধারণত মদ খায় না, কোনও নেশাই করে না, তাই সামান্য একটু অ্যালকোহল পেটে গেলেই বেসামাল হয়ে পড়ে, অ্যালকোহল টানে কিন্তু কখনও অ্যালকোলাহল করে না বলেই জানি। মাসে বড় জোর দু-চারবার মদ টানে। কিছুই গোলমাল করে না, তবে কবি সম্মেলনে বোধহয় সে একটু বেশি টেনেছিল সেদিন। তার উপর রাত্রিবেলা আবার এম এল-এর সঙ্গেও কিছু টানাটানি চলেছিল।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, তা ও তো ছাড়া পেয়ে গেছে, আর কী সমস্যা?

আফজল বলল, ছাড়া পেয়েছে, কিন্তু ওর এখন মনে হচ্ছে আসল অপরাধী

যদি ধরা না পড়ে তাহলে পরে কেউ ভাবতেও পারে মিহিরই···।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, সে একটা কথা বটে। তা আমি কী ভাবে তোমাদের সাহায্য করতে পারি ?

কিট্টু বলল, কাল পুলিশ মাধবলালবাবুর ঘরের সিল ভাঙবে, আলমারিও খুলবে। তারপর তারা কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করবে, যদি অবশ্য থেকে থাকে। তারপর চাবিটা বাড়ির লোকের হাতে দিয়ে চলে যাবে।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, সে তো বেশ ভাল কথা। তা আমি কী করব ?

কিট্টু বলল, কাল যখন পুলিশ আসবে তখন আপনি ওখানে উপস্থিত থাকবেন।

ডাক্তার আদিত্য ভ্রূ কুঁচকে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, আমি উপস্থিত থেকে করব কী ?

কিট্টু বলল, আপনি উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে, সঙ্গে আমরাও থাকব।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, অর্থাৎ ট্রোজান হর্সের ব্যাপার ? ঠিক আছে। আমি তোমাদের নিয়ে যাব। তা আজ কোথায় উঠেছ ?

—কোথাও না। কিট্টু বলল।

—মাধবলালবাবু তো তোমার আত্মীয় ?

—ঠিক আত্মীয় বলা যায় না। আমার কাকিমার বাবার পিসতুতো ভাই। আমি কখনই ওই বাড়িতে যাইনি, কাউকে চিনতামও না।

ডাক্তার আদিত্য হাসলেন। বললেন, চমৎকার আত্মীয়তা। খারাপ কি। মিহির মৈত্র তোমার কে হয় ?

—সেটা অনেকটা কাছাকাছি। আমার পিসতুতো ভাই, আমাদের বাড়িও খুবই কাছাকাছি।

—ঠিক আছে। ডাক্তার আদিত্য বললেন, তবে তোমাদের একটা থাকার ব্যবস্থা করতে হয়। এই বাড়িতেই সেটা হতে পারে। রাজি ?

রানিদি এলেন। ডাক্তার আদিত্য বললেন, এরা আমাদের অতিথি। ভাল কিছু খাওয়া দাওয়া আর রাত্রে থাকার জায়গা চাই।

রানিদি বললেন, তা বেশ ভালই হল। তোমাদের সঙ্গে গপ্পো-টপ্পো করা যাবে।

বেশ কথাবার্তা বলেন রানিদি। খাওয়ার সময় হঠাৎ ঘণ্টা বাজল। সেই ঘণ্টার আওয়াজ, সেই যেন একটা ছুঁচো সাইকেল রিকশা চাপা পড়েছে। তা একটা সাইকেল রিকশা থামার আওয়াজও একটু আগে শোনা গিয়েছিল। কিট্টু ভাবল, কোনও রোগী হবে।

দরজা খুলতেই কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ডাক্তারবাবু, আমার স্ত্রীকে একটু দেখবেন। এখানে নিয়ে এসেছি।

তারপর ডাক্তার আদিত্য বোধহয় তাঁর চেম্বারেই নিয়ে গেলেন রোগিণীকে। মিনিট কয়েক পর ফিরে এলেন। বললেন, অপমানজনক ব্যাপার।

—কী ব্যাপার ?

—কেষ্ট দত্তর বউ। কী এক ফিক ব্যথা হয় মাঝে মাঝে। আগে আমাকে দেখাত। পরে ওই নতুন সাধুটা আসার পর থেকে ওর ছাইপাঁশ খেয়ে ভাল ছিল নাকি। এখন আবার বলছে সাধু চলে গেছে তো, তাই আমার কাছে এসেছে। এরকম হলে দেশের ভবিষ্যৎটা কী? সব বুজরুকদের পাল্লায় পড়লে বিজ্ঞান এগোবে কেমন করে? বেশ অপমানজনক ব্যাপার। কেবল কি এই কেষ্টর বউ নাকি ? আরও চার পাঁচজন আমার কাছে এসেছে যারা সাধুর কাছ থেকেই ওষুধ নিত। ভেবো না সাধু বিনা পয়সায় ছাই বিলোত, মোটেই না।

—বাঁশের ছাইয়ের পুরিয়া এক টাকা, আম গাছের ছাই ষাট পয়সা, বটের ছাই আশি পয়সা ওইরকম সব রেট। আমার ধারণা ও সব একই গাছের ছাই।

রানিদি বললেন, হয়তো সাধুর ছাইয়ে এমন কিছু থাকত যাতে রোগী আরাম পেত ?

ডাক্তার আদিত্য খেপে গেলেন এবারে। বললেন, ছাই হচ্ছে ছাই—ওর মধ্যে কিছু নেই, থাকতে পারে না। ম্যালেরিয়া সারে কুইনাইন খেলে, ছাইতে নয়, ব্যথা সারে অ্যাসপিরিনে, ছাইতে নয়, টাইফয়েড সারে অ্যান্টিবায়োটিকে, ছাইতে নয়। ছাইতে রোগী আরাম পেত না ছাই।

রানিদি বললেন, তবু সাধুর রেকর্ড ভাল।

—রেকর্ড ভাল ? ডাক্তার আদিত্য গর্জে উঠলেন।

—নিশ্চয়ই ভাল। গত এক বছরে তোমার চিকিৎসায় মারা গেছে চারজন, কিন্তু সাধুর ওষুধে কেউ মরেনি।

এবারে ডাক্তার আদিত্য বললেন, কি চমৎকার লজিক। সাধুর কাছে যারা গিয়েছিল তারা কেউ কঠিন রোগী ছিল নাকি ? সাধুর কাছে টাইফয়েড রোগী কেউ যায়নি, টিবি রোগী যায়নি, ক্যান্সার রোগী যায়নি। আমার কাছে ভয়ঙ্কর অসুস্থ হয়ে যারা আসে তাদের অনেকেই মারা যায়। একটা প্রমাণ দিই, সাধুর কাছেই রোগী যেত, সাধু কারুর কাছে যেত না। এ থেকে প্রমাণ কী হয় জানো ? এ থেকে প্রমাণ হয় শয্যাশায়ী বা কঠিন অসুস্থ রোগী ওর কাছে যেত না।

রানিদি বললেন, সাধু কারুর কাছে যেত না ? কেন মশাই, মাধবলালবাবুর কাছে রাত্রে কে যেত মাঝে মাঝে ?

ডাক্তার আদিত্য বললেন, সে ওই সাধুই কি না কে জানে। আবার ওই সাধু হলেও মাধবলালবাবুর চিকিৎসার জন্যই যে সে যেত ওখানে তারই বা কী প্রমাণ ? ওই সাধুই মাধবলালবাবুকে বিষ খাইয়ে মেরেছে, তাও তো হতে পারে ?

রানিদি বললেন, যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। সাধু মাধবলালবাবুকে বিষ খাওয়াবে কেন ?

ডাক্তার আদিত্য এ কথায় ভারি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন আবার। তিনি বললেন, কার কিসে লাভ কী করে জানা যাবে ? এই যে তুমি বোকার মত কথা

কথা বলছ এতে তো তোমার কোনও লাভ হচ্ছে না।

রানিদি বললেন, আমি বোকার মত কথা বলছি? কেন সাধু খামোকা মাধবলালবাবুকে খুন করতে যাবে সেটা তো বললে না?

ডাক্তার আদিত্য বললেন, এখন চুপ করো। এই ছেলেরা কী মনে করছে বলো তো।

রানিদি বললেন, ওই তো তোমার চিরকালের নীতি। তর্কে হেরে গেলেই 'চুপ করো'। বাস হয়ে গেল। ডাক্তার আদিত্য আর কোনও কথা বললেন না। রেগে গরগর করতে লাগলেন।

সেদিন আর বিশেষ কথা হল না। কিট্টু আর আফজল বেশ তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়ল। ভোরবেলাতেই একটা কোলাহল শুনে অবশ্য তাদের ঘুম ভেঙে গেল। জানলা দিয়ে দেখা গেল প্রায় ত্রিশ জন লোক বসে আছে বাড়ির বারান্দায়। তারা নানারকম কথা বলছে, আবার কেউ কেউ বলছে চুপ চুপ ডাক্তারবাবু ঘুমোচ্ছেন! কিন্তু গোলমাল তাতে কমছেও না, বরং বাড়ছে। একটু পরে রানিদি ঘরে ঢুকে বললেন, এই এক মুশকিল। সকালবেলা উনি দু ঘণ্টা ফ্রি রোগী দেখেন, সে জন্য প্রতিদিনই এই গোলমাল হয়। উনি অবশ্য নটা পর্যন্ত ওদের দেখবেন। তারপর ফাঁকা হয়ে যাবে। বারোটা পর্যন্ত উনি রোগী দেখেন—অন্য রোগীদের। তারপর আর চেম্বারে বসেন না। সন্ধেবেলা বিশেষ রোগী আসে না। গুঁইমশাই অবশ্য প্রায় রোজই আসেন।

সন্ধেবেলা কেন রোগী বিশেষ আসে না তার কারণ তাদের অনুমান করতে তেমন অসুবিধে হল না। তবে বেশ বোঝা গেল ডাক্তার আদিত্য বেশ 'পপুলার'।

রানিদি বললেন, উনি লোক ভাল। ভারি ভাল মানুষ। গরিবদের কাছ থেকে ফি নেন না। গ্রামে একটা হাসপাতাল করবেন এই স্বপ্ন দেখেন। অনেক রোগীকে কত ওষুধও দেন বিনা পয়সায়। অবশ্য সে সব ওষুধ উনিও স্যাম্পল হিসাবে বিনামূল্যেই পান—কিন্তু সব ডাক্তার তো আর ওঁর মতো নন। একটু পরে ডাক্তার আদিত্য ঘরে ঢুকে বললেন, গুড মর্নিং রাত্রে নতুন জায়গায় ঘুম হয়েছিল তো? যাক আমি দশ মিনিট পর রোগী দেখা শুরু করব। নটার পর কিছুক্ষণ কথা বলা যাবে। আমি মাধবলালবাবুর বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি পুলিশ এলেই যাতে খবর দেয়। দশ মিনিটের পথ, হেঁটেই যেতে পারব। তোমরা ততক্ষণ ঘুরে আসতে পার—দিদির সঙ্গে কথাও বলতে পার। বেরুনোর আগে ব্রেকফাস্ট সেরে যেও।

আফজল বলল, আচ্ছা ডাক্তার আদিত্য, সেই সাধুর আখড়াটা কোথায় ছিল?

ডাক্তার আদিত্য বললেন, মাধবলালবাবুর বাড়ির কাছেই একটা পুরনো মন্দির আছে। ভগ্নপ্রায় দেউল। সেখানে নানাবকম জঞ্জাল রয়েছে। ভাঙা ফার্নিচার ভর্তি। বছরে একবার ওখানে কোনওমতে পুজোটা সারা হত, এবারে পুজোও হয়নি, কালীপুজোও নয়। মন্দিরের এমনই দশা যে সেটা সম্ভবও ছিল না। পুজো হয়েছিল মন্দির থেকে খানিকটা দূরে মাদারিমাঠে। ওখানেই

কবি সম্মেলন হয়েছিল এবারে। এর আগের বারেও ওখানেই হয়েছিল কবি সম্মেলন পুজোর পর পরই।

ব্রেকফাস্ট ইত্যাদি সেরে ওরা দুজনে বেরুল।

চলতে চলতে তারা বুঝতে পারল বহু চোখ তাদের দেখছে। গ্রামের লোকেরা কৌতূহলী হয়ে উঠেছে তাদের দেখে। এখানে কাউকে না জানিয়ে কিছু করার উপায় নেই।

একটু পর তারা দেখতে পেল ভাঙা এক মন্দির। আফজল আর কিটু সেখানে দাঁড়িয়ে পুরনো আমলের এক ঐশ্বর্যময় ইতিহাসকে যেন দেখতে পেল। মন্দির কী ছিল, কী হয়েছে।

মন্দিরটার সামনের দিক থেকে চমৎকার আলোয় কতকগুলো ছবি তুলল কিটু। আফজল বলল, এই মন্দিরের পেছন দিকটাও ছবি, তোলার পক্ষে মন্দ হবে না বলেই মনে হচ্ছে।

কিন্তু ওদিকটা বেশ গাছপালায় ভর্তি। ঘন ঝোপও রয়েছে। কিটু বলল, ওদিকে যাওয়া শক্ত হবে। কিন্তু তবু তারা মন্দিরের পেছন দিকে গেল। কিটু দেখতে পেল আফজল যা বলেছে সেটা ঠিক। মন্দিরের পেছন দিকে বিশাল এক শিবমূর্তি কবে কোনকালে রঙ দিয়ে আঁকা হয়েছিল, কিন্তু এখন রঙ চটে গেছে, শ্যাওলার পড়েছে, কিন্তু মূর্তিটা এখনও বেশ চেনা যায়। একটা গাছের ডাল কিছু বাধার সৃষ্টি করেছিল দেখে আফজল বলল, আমি ডালটাকে টেনে ধরি তুমি ছবি তোলো। এই বলে আফজল ঝোপের ভেতর দিয়ে কোনমতে এগিয়ে গিয়েই আচমকা বলে উঠল, এ আবার কী?

কিটু বলল, কী ব্যাপার আফজল?

আফজল বলল, এদিকে এসো দেখবে। ভারি আশ্চর্য তো!

কিটু এগিয়ে গেল। দেখল সেখানে পড়ে রয়েছে ওষুধের অসংখ্য ফয়েল। পাতলা অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে যে ফয়েল তৈরি হয় যাতে ওষুধের ক্যাপসুল বা ট্যাবলেট রাখা হয় সেই ফয়েল সারে সারে পড়ে রয়েছে। দেখে মনে হয় না না সেগুলো খুব পুরনো। এ ছাড়া নানা ওষুধের খালি শিশি-বোতলও প্রচুর জমে রয়েছে।

—এখানে দ্যাখো। আফজল বলল, বেশ কয়েকটা ফয়েলে এখনও ক্যাপসুল রয়েছে। আবার কতকগুলো ক্যাপসুল রয়েছে দুভাগে ভাগ করা, তার ভেতরকার ওষুধ নেই। ভারি অদ্ভুত তো ব্যাপার। আবার দ্যাখো একটা জামা। বৃষ্টিতে জলে প্রায় ন্যাতার মতো হয়েছে। এটা তুমি তোমার ব্যাগে ভরে নাও কাজে লেগে যেতে পারে।

কিটু বলল, ভারি আশ্চর্য।

কিটু কয়েকটা ছবি তুলে নিল মন্দিরের পেছন দিকের। মন্দিরের পেছনে দুটো জানালাও রয়েছে, তার পাল্লা এখন আর নেই, গরাদগুলোও মরচে পড়ে না থাকারই মতো।

ছবি তোলা শেষ হলে বিচ্ছিরি ওই জামাটা বাগে পুরে কিটু বলল,

এইখানেই না সাধু মহাশয় বাস করছিলেন, আর ঝড়ের রাতে অকস্মাৎ উধাও হয়েছিলেন?

আফজল বলল, তা বটে। সাধু মহাশয় ঝড়ে উড়ে গিয়েছিলেন। মন্দিরের ভেতর থেকে অবশ্য হাওয়ায় উড়ে যাওয়া শক্ত।

কিট্টু বলল, কিন্তু জানতে হবে তিনি এখানে উড়ে এসে জুড়ে বসেছিলেনই বা কেন, আর উধাও হলেনই বা কেন?

আফজল বলল, সে আর জেনে কি হবে। কাকেই বা জিজ্ঞেস করবে। আর কেই বা জানবে।

কিট্টু বলল, তারিখটা ভারি ইন্টারেস্টিং তো। সেই ঝড়ের রাতে, যে রাতে মাধবলালবাবু খুন হন সেই রাত থেকেই তাঁর অগুনতি ভক্ত এবং রোগিবর্গকে শোকসাগরে ভাসিয়ে তিনি উড়ে গেলেন কেন?

আফজল বলল, হয়েছে কিট্টু হয়েছে। ব্যাপারটা যেন আমার মনে দানা বাঁধছে।

—কী ভাবছ আফজল?

—একটু পরে বলছি। দেখছ না আমাদের দেখবার জন্য অন্তত দু-ডজন দর্শক? শান্তিতে কথা কি বলা যাবে এখন?

সত্যিই তাই। নীরব হলেও দর্শকবৃন্দ কম নয়। তবে তাদের বয়স কম। তারা অনেকটা দূরে থাকছে বটে, কিন্তু বেশ বোঝা যায় তাদের গতিবিধির উপর নজর রাখছে।

—এই কারণে আমি গ্রাম পছন্দ করি না। বলল আফজল।

—উঃ এইভাবে সারাজীবন লোকে কাটায় কেমন করে? কিট্টু তাকে সমর্থন করল।

ওরা এদিক ওদিক ঘুরে আবার ডাক্তার আদিত্যর বাড়িতে ফিরে এল।

কিট্টু বলল, তুমি কী ভেবেছ বলো।

আফজল বলল, ইট মে বি এ লং শট।

কিট্টু বলল, তবু শুনিই না তোমার আইডিয়া।

আফজল বলল, বিনতা দেবীর স্বামী এক বছর আগে বিদেশে গিয়েছেন না?

কিট্টু লাফিয়ে উঠল। রানিদি হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়ে বললেন, এত আমোদ কেন ভাই?

কিট্টু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, কী যেন একটা কামড়াল আমার কাঁধে। এমন কিছু না—কেবল চমকে গিয়ে লাফিয়েছি। ও কিছু না।

রানিদি বললেন, দুপুরে কী খাবে জিজ্ঞেস করতে এলাম। ভাল চিংড়ি মাছ পাওয়া যেতে পারে।

—যা খুশি রানিদি। যা খুশি। বলল আফজল এবং কিট্টু একসঙ্গে।

রানিদি চলে গেলে কিট্টু বলল, কথা আস্তে আস্তে বলতে হবে। বলো তুমি কী ভেবেছ।

আফজল বলল, বিনতা দেবীর স্বামী একজন ডাক্তার। কিন্তু কেমন ডাক্তার? তিনি দিল্লিতে কাজ করেন, কিন্তু হাসপাতাল ট্রেইনিং নিতে কানাডা যান। ধরো তিনি দিল্লিতে ডাক্তারি করেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর শ্বশুরের সম্পত্তি, যেমন কালো প্যাঁচা, ম্যাক-এব ঘড়ি, এ সবের প্রতি লোভ। তিনি বিদেশ যাবার কথা বলেন বটে, কিন্তু একজন সাধু সেজে এই গ্রামে এসে তাঁর বুজরুকি শুরু করেন। ছাই দিয়ে তিনি রোগী সারান। কিন্তু তুমিও জানো, আমিও জানি, ছাই খেয়ে বা মেখে রোগ সারে না। অথচ দেখছ এখানকার সাধুর দারুণ সুনাম। তিনি রোগীকে আরোগ্যই করেন। এ পর্যন্ত তাঁর হাতে কেউ মরেনি। কিন্তু কেন তাঁর এই সাফল্য? সহজ সমাধান। তিনি ছাইয়ের সঙ্গে সত্যিকারের ওষুধ মেশাতেন গুঁড়ো করে। ওষুধের ফয়েল বা শিশিগুলো এমনই যে সেগুলো সহজে ধ্বংস করা যায় না, পোড়ানোও যায় না, তা ছাড়া তিনি ভক্তদের সামনে সেটা করতেও পারেন না, তাই ওষুধ বার করে নিয়ে ফয়েলগুলো জানলা দিয়ে এমন জায়গাতেই ফেলতেন যে সেখানে কেউ যায় না।

কিট্টু বলল, ঠিক কথা। এ ভাবে তো আমার মাথায় আসেনি কথাটা। অর্থাৎ তুমি বলতে চাও এ ব্যাপারে বিনতা দেবী এবং তাঁর স্বামী অশ্বিনী রায়চৌধুরি জড়িত?

—নিশ্চয়। সমস্ত অনুমান ওইদিকেই যাচ্ছে না কি?

—কিন্তু একটা কথা আছে। কিট্টু বলল, ওই দুজনে মিলে মাধবলালবাবুকে খুন করলেন কেন, ওঁরা তো জানেন উনি বেশিদিন বাঁচবেন না? এমনিতেই তো মারা যেতেন।

আফজল বলল, বিনতা দেবীর স্বামীর নামটা তুমি কোত্থেকে পেলে?

কিট্টু বলল, সে আমি কালই কাকিমার কাছে ফোনে জেনে নিয়েছি। কিন্তু তুমি তো বললে না মাধবলালবাবুকে খুন করার জন্য ডঃ অশ্বিনী রায়-চৌধুরিকে এক বছর ধরে সাধু সেজে ওই মন্দিরে কেন থাকতে হয়েছিল? বিনতা দেবী নিজেই তো কাজটা করতে পারতেন।

আফজল বলল, ব্যাপারটা বড় জটিল। ঠিকই বলেছ কিট্টু। যদি বিনতা দেবীই কাজটা করতে পারতেন তা হলে ডঃ রায়চৌধুরিমশাই এখানে সাধু সেজে কেন এক বছর কষ্ট করলেন?

কিট্টু বলল, কষ্ট আবার কোথায় করলেন? ভক্তের অভাব ছিল না। খাওয়া-দাওয়াও নিশ্চয় ভালই করতেন, আর মন্দ আয়ও হত না প্রতিদিন।

আফজল বলল, দিনে আয় হত না কিট্টু, আয় হত রাত্রে। জানো তো উনি দিনে কারুর সঙ্গে দেখা করতেন না।

—এটাও তো একটা অদ্ভুত ব্যাপার, তাই নয়? আফজল বলল, দিনে দেখা করতেন না কেন?

কিট্টু বলল, অদ্ভুত কেন হবে? ডাঃ রায়চৌধুরিমশাইকে যদি চিনে ফেলে দিনের প্রখর আলোয়? সেই কারণেই রাত্রির ব্যবহার।

আফজল খানিক ভাবল। তারপর বলল, ডাক্তার রায়চৌধুরিকে ভুবনচরায়

কে চিনে ফেলবে ? উনি এখানকার লোক নন। বিয়ের সময় মাত্র একদিন কি দুদিনের জন্য এসেছিলেন, তাও নানা রকম সাজসজ্জা করে। এদিকে সাধুর সাজের মধ্যে এমন একটা ব্যাপার থাকে, দাড়িতে-জটায়, ফোঁটা-তিলকে, রুদ্রাক্ষের মালায়, খড়মে, সংস্কৃত বা হিন্দি বচনে যে তাকে অন্য কোনও অসাধু সাধু সেজে আছে বলেই মনে হয় না। এর সঙ্গে যদি গাঁজার গন্ধ গা থেকে বেরোয় তাহলে তো কথাই নেই।

ওরা কথা বলছে এমন সময় দরজায় টোকা দেওয়ার আওয়াজ। ডাক্তার আদিত্য মাথা বাড়িয়ে বললেন, ঠিক এগারোটায় পুলিশ আসবে বলে খবর দিয়ে গেছে। তোমরা রেডি থেকো। আমার আরও দুজন রোগী আছে দেখেই তোমাদের কাছে আসছি।

ডাক্তার আদিত্য চলে গেলেন। কিটু ভাবল, যাক ডাক্তার আদিত্য তা হলে কথাটা মনে রেখেছেন। আফজলকে বলল, আজ থেকে তাহলে এই মামলার একটা নতুন অধ্যায় শুরু। এতদিন আমরা দুর্গের বাইরে থেকে এলোপাথাড়ি অনুমান করেছি, নিজের চোখে কিছু ভাল করে দেখা হয়নি। এবার সে সুযোগটা পাওয়া যাবে।

আফজল বলল, একেবারে কিছু জানতে পারিনি তা তো নয়। বাঘাকাকার দৌলতে সরযু ওই বাড়িতে থেকে কিছু জানতে পেরেছে। এখন সেও ওই বাড়িতে হয়তো আছে, অন্তত বাঘাকাকার কথা শুনে তো মনে হয়েছে সরযু ওই বাড়িতে ফিরে আসবে। সংবাদদাতা হিসাবে মিহিরও কিছু জানিয়েছে। আমরাও সেদিন বাড়িতে এসেছিলাম, অবশ্য একেবারে ভেতরে ঢোকা হয়নি।

কিটু বলল, আজ আমরাও কম জানতে পারিনি। সাধু যে কেবল ছাই দিতেন না, সঙ্গে খাবার জন্য ওষুধও দিতেন সেটা জানা গেল। এটা যখন ডাঃ আদিত্য জানতে পারবেন তাহলে তিনি ভারি খুশি হবেন। রানিদি একা বেকায়দায় পড়বেন অবশ্য।

আফজল বলল, একটা জিনিস বিশেষ করে মনে রাখতে হবে—মাধবলাল-বাবুর খুনের সঙ্গে এই সাধুর সম্পর্ক আছে। এই সাধু মাঝে মাঝে রাত্রে মাধবলালবাবুর সঙ্গে দেখা করতেন।

কিটু বলল, আর নার্স রাধাময়ী। নার্সকে না জানিয়ে রাত্রে ওই বাড়িতে ঢোকাও সম্ভব ছিল না। মনে হয় ওর সঙ্গেও এই সাধুর সম্পর্ক একটা কিছু ছিল—দুজনেই একই রাত্রে নিরুদ্দেশ।

উঃ। বলল আফজল।

কিটু বলল, আবার কী হল ?

আফজল বলল, পায়ে একটা কী ফুটে গিয়েছিল সেবারে এখানে এসে। জায়গাটায় মাঝে মাঝে ব্যথা করে।

৮

মাধবলালবাবুর বাড়িতে ওরা যখন পৌঁছুল তখনও এগারোটা বাজেনি। দিনের বেলাতেও গাছপালার জন্য বাড়িটাকে প্রায় দেখাই যায় না। প্রথমে একটা বড় গেট। সেটা কখনও বোধ হয় বন্ধ হয় না। কাঠ আর লোহার তৈরি সাবেক গেট। এখন জীর্ণ দশা। বাড়িটারও সংস্কার হয় না বহুদিন। দেখে মনেই হয় না এই বাড়ির মালিক বড়লোক। সেদিন কিট্টুরা বাড়িটাকে ভাল করে দেখেনি আজ চোখে পড়ল বাড়িটা দোতলা হলেও দোতলায় ঘর মাত্র একটা কি দুটো। ডাক্তার আদিত্য বললেন, এককালে ছাতের ঘর দুটো গেস্টরুম হিসাবে ব্যবহার হত। এখন এ বাড়িতে লোকই কমে গেছে, গেস্ট এলেও নিচের সাত আটটা বড় ঘর আছে, তাতেই কুলিয়ে যায়। বাগানের মধ্যে দুটো ভাঙা কুঠি আছে, সেখানে এখন কেউই থাকে না।

বাড়িতে ঢুকতে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হল না। ডাক্তার আদিত্য ট্রোজান ঘোড়া হিসাবে কাজ করলেন। বৈঠকখানায় ঢুকতেই একটি নারীমূর্তিকে দেখা গেল। ওদের দেখে সে একটু মুচকি হেসেই গম্ভীর হয়ে গেল। সরযু ঘর ঝাট দিচ্ছিল। তাহলে সরযু কালই এসে গেছে। আজ সকালেও হতে পারে।

অভিনববাবু খোঁড়াতে খোঁড়াতে ওদের সমাদরে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলেন। পুরনো আমলের চমৎকার সব আসবাবপত্র দেখে কিট্টুরা মোহিত হয়ে গেল। বাড়িতে লোক সমাগম একটু বেশি। পাড়াপ্রতিবেশীরাও নিশ্চয় জানতে পেরেছে আজ পুলিশ ঘরের সিল ভাঙবে।

এগারোটা পঁচিশ মিনিট নাগাদ বাড়ির সামনে একটা পুলিশ জিপ এসে দাঁড়াল। জিপ থেকে চারজন কনস্টেবল এবং একজন পুলিশ অফিসার নামলেন। বাইরে বেশ কিছু দর্শক জুটে গেল, তাদের বাড়ির মধ্যে ঢোকা বন্ধ করতে দুজন কনস্টেবল রাইফেল হাতে গেটের বাইরে দাঁড়াল। ভেতরে পুলিশ আনুষ্ঠানিক কাগজপত্রে সই করিয়ে ডাক্তার আদিত্যকে বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে স্বীকার করে ঘরের ভেতরে যেতে অনুমতি দিলেন। ঘরের মধ্যে গেলেন পুলিশ অফিসার একজন কনস্টেবলকে নিয়ে, এ ছাড়া গেলেন অভিনববাবু। নিলয়া দেবী এক কোণে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিমানবাবু গেলেন স্মার্টভাবে। বিনতা দেবীও ঢুকলেন, আর সব আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব বাইরে রইলেন। মাধব-লালবাবুর বন্ধু অক্ষয় বসু ঘরের বাইরে একটা চেয়ারে চুপ করে বসেছিলেন। কিট্টু আর আফজল যতটা পারে ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল, কিন্তু একটা বিশাল খাট, কয়েকটা চেয়ার আর মোড়া ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না। অবশ্য বইভর্তি একটা বড় আলমারির অংশ দেখা যাচ্ছিল।

কট করে একটা আওয়াজ হল। আলমারির তালা খোলার আওয়াজ। ডাক্তার আদিত্যর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, বই আর কাগজপত্র ছাড়া এই আলমারিতে বিশেষ কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না। অকস্মাৎ অভিনববাবুর

খেদোক্তি, বাবা আমাদের ডুবিয়ে গেছেন, কিছুই রেখে যাননি এখানে। বাবা ওইরকমই একটা কিছু করবেন আমি জানতাম! তারপরই বিমানবাবুর কণ্ঠ শোনা গেল—ওটাতে আর কী থাকবে, ওটা তো ওষুধপত্রের আলমারি। ওখানে কিছু নেই সে তো বাইরে থেকেই বোঝা যাচ্ছে। ম্যাক-এব ঘড়িটা পর্যন্ত নেই, যেটা এখানেই থাকত। এ সবই, এ সবই একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের ব্যাপার, আর ডাক্তার আদিত্য, এ ব্যাপারে আপনার দায়িত্ব আপনি এড়াতে পারেন না। আপনিই ওঁকে পরামর্শ দিয়ে…। আর সব সময়ে বিমানবাবুর কথা সরবে সমর্থন করে চললেন অভিনববাবু! আকস্মাৎ ডাক্তার আদিত্যর গর্জন শোনা গেল, চুপ করুন, বিমানবাবু আপনি কি বলছেন তার ঠিক নেই। আবার বিমানবাবুর কণ্ঠস্বর: আপনি বাবার মৃত্যুর জন্য দায়ী। আপনি দীর্ঘদিন ধরে বাবার সমস্ত দামি জিনিস সরিয়েছেন, এবং শেষে খুন করে…। পুলিশ অফিসার বললেন, দেখুন, এ সব কথা এখানে বলবেন না, আমাদের কাজ করতে দিন। বিনতার কথা শোনা গেল, চুপ করো না মেজদা! বিমানবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কেন চুপ করব, সত্যি কথা বলতে আমি ভয় পাই নাকি?

ডাক্তার আদিত্যর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, এই হচ্ছে উপকার করার পুরস্কার। আমি যাঁকে চিকিৎসা করে দীর্ঘজীবী করলাম তাঁকে আমি মারব? এবারে বিমানবাবুর কথা শোনা গেল, আহা— ওটা বইয়ের আলমারি, ওর মধ্যে কিছু থাকবে বলে মনে করো? এই ডাক্তারই সব সরিয়েছে। আগেই ভেবেছিলাম।

মাধবলালবাবুর বন্ধু অক্ষয়বাবু যিনি সেদিন পর্যন্তও তাস খেলতেন ওঁর সঙ্গে, কাছেই বসে থাকা কিটুর কাছে এসে বললেন, আপনারা?

কিটু বলল, আমি ডাক্তারের সঙ্গে এসেছি।

এবার অক্ষয়বাবু চুপি চুপি বললেন, আপনি ব্রিজ খেলেন? তাস?

কিটু তখন শোনার চেষ্টা করছে ঘরের ভেতরকার সংলাপ। সে বলল, একটু আধটু খেলেছি।

—তাহলে শুনুন আমার হাতে ছিল ইস্কাপনের বিবি, নয়, আট আর সাত…

এরই মধ্যে একটা চিৎকার শোনা গেল অভিনববাবুর—এই তো বাবার উইল! এই তো বাবার উইল! পুলিশ অফিসারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ওটা আমার হাতে দিন। বিমানবাবুর কণ্ঠস্বর: ওটা আপনি নেবেন কেন? ওটা আমাদের সম্পত্তি। ডাক্তার আদিত্যর কণ্ঠস্বর: ঠিক কথা, ওটা আপনার নেওয়ার কথা নয়। এটা পারিবারিক ব্যাপার। তারপর একটা স্তব্ধতা, কয়েক সেকেন্ড পর বিমানবাবুর ভয়ংকর চিৎকার, বাবা আমাদের শেষ করে দিয়েছেন। সমস্ত নগদ টাকার… আমি যা ভেবেছিলাম তাই, অর্ধেক দিয়ে গেছেন শয়তান এই ডাক্তারকে। এই মাতাল আদিত্য ডাক্তারকে। আর বাকি অর্ধেক দিয়ে গেছেন কলকাতার এক দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে। এ কী হল? এ কী হল? ডাক্তার আদিত্য, দাদাকে দেখুন, দাদা অজ্ঞান হয়ে গেছেন। দাদা অজ্ঞান হয়ে গেছেন। উঃ। পুলিশ অফিসার ভিড় সামলাতে পারবেন না মনে করে এরপর দরজা বন্ধ

করে দিলেন। আফজল বলল, ব্যাপার সাংঘাতিকই দাঁড়াল তাহলে।

চারদিকে নানারকম উত্তেজনা। ছোটদের স্তব্ধতা এই প্রথম উপলব্ধি করা গেল। এতক্ষণ তারা নানারকম গোলমাল করছিল। অক্ষয়বাবু আস্তে আস্তে উঠে এলেন তাঁর আসন থেকে। কিট্টুর কাছে এসে বললেন, তারপর শুনুন কী হল। আমাদের প্রতিপক্ষরা ডেকেছিল থ্রি নো-ট্রাম্পস, ডবল-রিডবলের খেলা। আমি যদি ছোট চিড়ে লিড দিই তাহলেই তিনটে ডাউন, দিলুম ভুল করে এমন একটা লিড···।

ঠিক এই সময় হঠাৎ কী রকম অদ্ভুত একটা আওয়াজ হল সোফার পেছন থেকে। মুখ বাড়িয়ে কিট্টু দেখল নিশ্চিতভাবে এ বাড়ির কুকুর বাঘা। হাই তুলছে। সুখী বাঘা।

ডাক্তার আদিত্য পুলিশ অফিসারকে বললেন, ব্যাপারটা আমার পক্ষে খুব প্রীতিপ্রদ নয়। আমার বিরুদ্ধে যে সব কথা বলা হচ্ছে তাতে আমার যথেষ্ট মানহানি হওয়ার সম্ভাবনা। আর কেউ যদি এ কথা উচ্চারণ করেন তাহলে আমি ড্যামেজ-এর মামলা করব। এই মৃত্যুর ব্যাপারে আমাকে অযথা দায়ী করা হচ্ছে। আমি বিমানবাবু এবং অভিনববাবুকে বলছি যেন তাঁরা ভবিষ্যতে এ ধরনের কথা উচ্চারণ না করেন। আর এখন যা বলেছেন তা প্রত্যাহার করে নেন।

পুলিশ দরজার বাইরে থেকে জমায়েত সমস্ত লোককে দূরে চলে যেতে বলল। তারপর কিট্টু আর আফজলকে ঘরের ভেতরে ডাকা হল। ডাক্তার আদিত্য বললেন, আমারও সাক্ষী দরকার। পুলিশের সঙ্গে কিট্টু আর আফজলকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, কিট্টু লাহিড়ির নাম শুনে থাকবেন, উনি হচ্ছেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। যেহেতু মাধবলালবাবুর ব্যাপারটা আমার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে সে হেতু আমি তাকে এবং তার সহকারী আফজল হুসেনকে নিয়োগ করছি সত্য উদ্ঘাটনের জন্য। আশা করি এতে পুলিশের আপত্তি হবে না।

পুলিশ অফিসার বললেন, ঐ অধিকার হরণ করার অধিকার আমার নেই, তবে পুলিশের কাজে বাধা যেন না দেওয়া হয় কোনওমতেই।

ডাক্তার আদিত্যের কথা মতো অভিনববাবুর মুখে আর মাথায় জল দেওয়ায় তিনি শান্ত হয়ে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে বসে ছিলেন! বেচারা খোঁড়া ভদ্রলোককে দেখে কিট্টুর কষ্ট হল। সত্যি কত আশা করেছিলেন তিনি। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর টাকার অংশ নিয়ে কিছুটা স্বাধীনভাবে খরচটরচ করতে পারবেন। ভুবনচরা থেকে চলে যাবেন কলকাতার কাছাকাছি কোথাও। ছেলেমেয়েদের পড়ার একটা সুবন্দোবস্ত করতে পারবেন। কথাগুলো কিট্টুর এমনি মনে হল। ভালবাসাহীন পরিবার। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। হয়তো অভিনববাবু এই সব কথা ভেবেই কেমন বিবশ হয়ে পড়েছিলেন।

ডাক্তার আদিত্য এবার বিনতা দেবী এবং বিমানবাবুকে বললেন, আশা করি এ ব্যাপারে আপনাদের আপত্তি হবে না। কিট্টু লাহিড়ি আমাকে দুর্নামের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সত্য অনুসন্ধান করবে। তারপর বললেন, উইলে যা

লেখা আছে তা আমার পক্ষে সত্যিই গর্বের বিষয়। স্বাভাবিকভাবে মাধবলাল-বাবুর মৃত্যু হলে ভাল হত। বুঝতে পারছি কেউ এর মধ্যে এমন খেলা খেলেছেন যে খেলায় এখন আমাকেও যোগ দিতে হচ্ছে। মরণ বাঁচনের খেলা।

বিনতা দেবী বললেন, না আমার আপত্তি নেই। কিটুবাবু অনুসন্ধান করুন। সত্য কী যদি উনি বার করতে পারেন তাহলে আমরা খুশিই হবো। বিমানবাবু বললেন, এর মধ্যে বার করার আর কি আছে? ডাক্তার আদিত্য উইলের ব্যাপার জানতেন আর সেটা জানতে পেরে তিনিই···

—ফের? ডাক্তার আদিত্য এবার রেগে টকটকে লাল হয়ে গেলেন। বিন্দু বিন্দু ঘাম তাঁর কপালে মুখে দেখা দিল। আর তিনি কথা বলতে পারলেন না। তিনি একটু পরে সামলে নিয়ে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে—এ বাড়িতে আর নয়।

—কিছু মনে করবেন না। বিনতা দেবী বললেন, শোকে মেজদার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

ডাক্তার আদিত্য বলতে বলতেও থেমে গেলেন—টাকার শোক নিশ্চয়, বাবার মৃত্যুর জন্য এ শোক নয়। ডাক্তার আদিত্য বললেন, মনে না করার কিছু নেই বিনু। আমাকে খুনে বলার পরও আমি মনে কিছু করব না এমন কথা তোমার কেমন করে মনে হল? আমি বুঝতে পারছি, স্পষ্ট বুঝতে পারছি এই উইলের ব্যাপারটা আমার বিরুদ্ধে যাবে। লোকে ধরে নেবে আমিই বুঝি ইচ্ছে করে···

বিনতা দেবী বললেন, উইলটা ভাল করে পড়াই তো হয়নি। লেখাটা ওঁরই কি না, সাক্ষী কে, কবেকার উইল, এরপর আর কোনও উইল বাবা করেছিলেন কি না সেটাও তো জানা দরকার। উইলটা অভিনববাবুর হাতে ভাঁজ করা অবস্থায় ছিল। তিনি বললেন, এ উইলে যাই থাক না কেন আমি মানি না। আমরা মানি না। এ উইল আমি পুড়িয়ে ফেলব।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, কোনও লাভ হবে না অভিনববাবু। ও উইল রেজিস্ট্রি করা হয়ে গেছে। এ উইলের কপি একটা আমার কাছেও আছে, সিল করা অবশ্যই।

উইলের সাক্ষী বিদ্যাচরণ গুঁইয়ের কাছেও কপি থাকা সম্ভব। অতএব উইল মিছিমিছি ছিঁড়বেন না। আপনার পিতা মাধবলালবাবু পাকা কাজ করে গেছেন।

—বাবার মাথা খারাপ হয়েছিল, এই মর্মে আমরা ঐ উইলের বিরোধিতা করব। মামলা করব। উইলের শর্ত অনুযায়ী টাকা পেতে পেতে আপনার জীবন শেষ হয়ে যাবে।

—আপনারা সকলেই কি এই মত পোষণ করেন? ডাক্তার আদিত্য সকলের দিকেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন। তুমি কী বলো বিনু।

বিনতা বললেন, উইলটায় আমাদের বাবার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সে হিসেবে আমার তো আপত্তি থাকতেই পারে। বাবার কত টাকা ছিল জানি না। যাই থাক তার পরিমাণ খুব কম হবে না, তারই সুদ থেকে একটা পুরো সংসার চলত। ন্যায্য হিসেবে আমার এক চতুর্থাংশ পাওনা হয়।

উইল করে বঞ্চিত করলে তা আমাকে মেনে নিতেই হবে, যদিও মনটা খারাপ হবেই। আমি তো কখনও বাবার প্রতি কোনও অন্যায় করিনি, তাহলে তিনি আমাকে কেন বঞ্চিত করলেন? তবু আমি বলব বাবার যদি সেটাই ইচ্ছে হয় তাহলেও আমি মেনে নেব। আমি এ জন্য আদালতে গিয়ে বলতে পারব না বাবার মাথা খারাপ ছিল। আমি জানি বাবার মাথা খারাপ ছিল না। তিনি চমৎকার মানুষ ছিলেন।

অভিনববাবু বললেন, তুই কী বলছিস বিনু তুই জানিস না। নিজেই তুই নিজের সর্বনাশ করছিস।

বিমানবাবু বললেন, ঠিক আছে। তুই যদি অংশ না চাস তাতে কী আপত্তি থাকতে পারে? দাদা আর আমি লড়ব।

পুলিশ অফিসার বললেন, আপাতত আমরা যাচ্ছি। ঘর থেকে কয়েকটা জিনিস আমরা নিয়ে যাচ্ছি। মাধবলালবাবুর ওষুধগুলো। মনে হয় এই সব ওষুধের মধ্যেই কেউ বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। ওষুধের শিশির গায়ে হাতের ছাপ কিছু লেগে থাকতে পারে। পরীক্ষা করে আবার এসব ফেরত দেওয়া হবে। রুটিন ব্যাপার। এ সব ওষুধ তো সবই আপনার প্রেসক্রিপশনেই আনা? দেখুন তো।

ডাক্তার আদিত্য ওষুধগুলোর শিশি দেখলেন। বললেন, হ্যাঁ এ সব ওষুধই আমি ওঁকে দীর্ঘদিন ধরে দিচ্ছি। গত তিন বছর একই ওষুধ দিয়েছি।

—সব ওষুধ আপনিই কি সরবরাহ করতেন? পুলিশ অফিসার প্রশ্ন করলেন।

—না। আমি প্রেসক্রিপশন দিতাম। ওষুধ বাইরে থেকে আনা হত।

—কোত্থেকে আনা হত?

—সে আমি জানি না।

—আমি কখনও কখনও এনে দিয়েছি আমাদের দোকান থেকে। বললেন বিমানবাবু। এর মধ্যে একটা ওষুধ সহজে পাওয়া যায় না বলে আমি কয়েকটা কিনে রেখেছি আমার কাছে।

—কোন্ ওষুধ?

—কার্ডোডিলাম।

—ওটা কিসের ওষুধ?

—হার্টের। হার্টে বেশি ব্যথা হলে ওটা একটা ক্যাপসুল খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলাম। খুব দামি ওষুধ। একটা শিশিতে দশটা ক্যাপসুল থাকে। দাম একশো ত্রিশ টাকা।

—এ ছাড়া অন্য কোনও ওষুধ নিয়মিত খেতেন উনি?

—আর দুটো ওষুধ নিয়মিত খেতেন। একটা বাতের জন্য। পর পর একুশ দিন খেতে হত, তারপর একমাস বিশ্রাম। তারপর আবার ঐ একই ওষুধ একুশ দিন, এইভাবে চলত।

—আর?

ডাক্তার আদিত্য বললেন, আর একটা সাধারণ মাল্টি ভিটামিন। আসলে কোনও কাজের নয়। সান্ত্বনা ওষুধ, সাহেবি নাম প্ল্যাসিবো, রোজ দুবার খেলে রোগীর মনে হয় তিনি ভাল হয়ে উঠছেন। এসব কথা আপনি জিজ্ঞেস করছেন কেন? এর কোনটার মধ্যেই সায়ানাইড অব পটাসিয়াম নেই।

কেন যে এই প্রশ্নগুলো করলেন তা পুলিশ অফিসার নিজেই জানেন না। তিনি একটু দেঁতো হাসি হাসলেন। স্বীকার করলেন ওষুধ সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ জ্ঞান নেই, কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে হয় বলেই করা। তারপর একটু উচ্চকণ্ঠে বললেন, উইলের ব্যাপার নিয়ে আপনারা কী করবেন, কী সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা আপনাদের ব্যাপার। ও নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। ডাক্তারের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই, এমন কি সন্দেহও করা যাচ্ছে না। অতএব আপাতত আমাদের আর কিছু করার নেই। আর যদি কিট্টু লাহিড়িমশাই কিছু সত্য বার করতে পারেন তাহলে ব্যাপারটা তিনি যেন আমাদের জানান। আমাদের সহযোগিতার হাত সর্বদাই বাড়িয়ে দেব। আমাদের অনুসন্ধান কাজে অভিজ্ঞ লোকও নেই। তারপর প্রায় ফিস ফিস করে বললেন, এখন যা সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট হচ্ছে সবই রাজনৈতিক কর্তাদের ল্যাজ ধরে। কোনও শিক্ষা নেই, ট্রেইনিং নেই। বি এ পাশ বলে যে সার্টিফিকেট আনে সে দুলাইন ইংরেজি শুদ্ধভাবে লিখতে পারে না, বাংলা বানান এক একটা যা হচ্ছে তাও ভারি ভীতিপ্রদ। আজকাল নাকি কলেজ স্ট্রিটের আশে পাশে তিনশো টাকা দরে বি এ, এম এ ডিগ্রির সার্টি-ফিকেট পাওয়া যায়। আসল নকল ধরার সাধ্য কারু নেই। আচ্ছা আজ আসি তাহলে, নমস্কার।

পুলিশ চলে গেলে ডাক্তার আদিত্য বললেন, বিশ্বলালের কোনও খবর পাওয়া যায়নি? শ্রাদ্ধের সময় দেখতে পাইনি।

—না। বিনতা দেবী বললেন।

—ওঁকে খবর জানানো হয়েছিল?

—একটা টেলিগ্রাম করা হয়েছিল মাদ্রাজের ঠিকানায়। সেখান থেকে অ্যাড্রেসি লেফ্‌ট বলে সেটা ফেরত এসেছে। বেচারা জানেই না বাবা মারা গেছেন।

কিট্টু ভাবল, বেচারা? বাবার সঙ্গে যাঁর কখনই বনিবনা হয়নি, বাবা মারা গেলে যিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন, তিনি বেচারা? অবশ্য উইল বেরুনোর পর এখন বেচারা বলা যেতে পারে হয়তো।

আফজল বলল, ওঁর ঠিকানাটা কি পাওয়া যাবে? হয়তো কিট্টুর দরকার হতে পারে।

বিনতা দেবী খুঁজে খুঁজে কোত্থেকে একটা চিঠি নিয়ে এলেন। পোস্ট-কার্ডের চিঠি। বললেন, মাস চারেক আগে ও যখন এসেছিল তার কয়েক দিন পর ও দুটো হোটেলের ঠিকানা জানিয়েছিল যেখানে কেউ গিয়ে মোটামুটি কম চার্জে থাকতে পারে— আমার এক বন্ধুর মা চোখের অসুখে ভুগছিলেন বলে ওখানকার একটি বিখ্যাত চোখের হাসপাতালে চোখ দেখাতে যাবেন। সে

ঠিকানা জানিয়েছিল এই চিঠিতে। চিঠিতে ঠিকানা লেখা ছিল কিন্তু ওর উপর দু ফোঁটা জল পড়ায় সবটা পড়া যাচ্ছে না। তবে আর এ এস ৪১ কথাটা পড়া যায়। কোনও জায়গার নামের শেষের তিন অক্ষর বলে মনে হয়। আর কী একটা যেন, মনে হয় লেখা আছে আই জি কলোম কিন্তু তাও ঠিক পড়া যাচ্ছে না, নম্বরও পড়া যাচ্ছে না। বিনতা দেবী বললেন, কার্ডটা আপনি রাখতে পারেন ইচ্ছে করলে।

আফজল পোস্টকার্ডটা পকেটে পুরল। কিন্তু আই জি কলোম ব্যাপারটা কী, তা ঠিক মাথায় ঢুকল না।

বিনতা দেবী বললেন, আপনারা কি ওর খোঁজ করবেন?

কিটু একটু ভেবে বলল, কখনও ওঁকে দরকার হতেও পারে তো।

—এখন দুপুর শেষ হয়ে এল প্রায়। আপনাদের খাওয়া হয়নি নিশ্চয়। ইচ্ছে করলে খেয়ে যেতে পারেন। হয়তো কিছু খোঁজখবরও আপনাদের নেওয়ার দরকার হতে পারে।

ডাঃ আদিত্য অকস্মাৎ বলে উঠলেন, না না ওরা আমার ওখানেই খাবে। দুপুরে নেমন্তন্ন করেছি। দরকার হলে ওরা পরে আসবে।

এ কথায় মনে হল বিনতা দেবী ছাড়া সকলেই স্বস্তি অনুভব করলেন। ডাক্তার আদিত্য অভিনববাবুকে বললেন, চলি তাহলে আজ। মনটাকে শান্ত করুন।

বিনতা দেবী কিটুকে বললেন, আপনি এবং আপনার বন্ধু এখানে যখন ইচ্ছে আসবেন। যা ইচ্ছে প্রশ্ন করবেন।

এমন চট করে কথাটা বললেন যে বিমানবাবু এবং অভিনববাবু তৎক্ষণাৎ আপত্তি করতে পারলেন না, কিন্তু তাঁদের দুজনের চোখই জ্বলছিল।

বাইরে বেরিয়ে ডাক্তার আদিত্য বললেন, দেখলে তো সব? অকৃতজ্ঞ সব মানুষ। আমাকে কিনা খুনে প্রতিপন্ন করতে চায়।

—আপনি কি জানতেন মাধবলালবাবু উইলে আপনার নামে সম্পত্তির বেশ বড় একটা অংশ রেখে গিয়েছেন? কিটু প্রশ্ন করল।

অম্লান বদনে ডাক্তার আদিত্য বললেন, জানতাম।

—জানতেন?

—জানতাম। তোমরা উইলটা যদি পড় তাহলে কেন তিনি আমাকে সম্পত্তি দিলেন জানতে পারবে। এ ছাড়া তিনি আমাকে একটা চিঠিতে জানিয়েছিলেন ঐ টাকা আমাকে কেন দিয়ে যাচ্ছেন।

—কেন?

—আমার একটা হাসপাতাল, ছোট একটা হাসপাতাল করার ইচ্ছে বহুদিনের। আমি একদিন গল্প করতে করতে কথাটা ওঁকে বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম—গ্রামে হাসপাতাল বলে কিছু নেই। ভাল চিকিৎসক গ্রামে আসতে চান না। গ্রামের রোগীদের জন্য ত্রিশ বেডের একটা আদর্শ হাসপাতাল করব

এমন একটা স্বপ্ন আমি মধ্যে মধ্যে দেখে থাকি। কী, স্বপ্নটা খারাপ?

—না, না। আফজল বলল।

—আমি বলেছিলাম দাতব্য হাসপাতাল নয় অবশ্য। কিছু টাকা রোগীদের দিতে হবে যাতে লাভও হয় না ক্ষতিও হয় না। আমি হিশেব করে দেখেছিলাম লাখ দশেক টাকা যদি পাওয়া যায় তাহলে কাজ শুরু করা যায়। এ কথা বলাতে মাধবলালবাবু খুব উৎসাহিত হয়েছিলেন। তিনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন আমি উইলে আপনাকে কিছু দিয়ে যাব। অত টাকা অবশ্য হবে না, তবে অনেকটাই হবে—তুমি কাজটা করবে, এটাই আমার প্রার্থনা। তুমি বাকি টাকাটা যে কোনওভাবে সংগ্রহ করতে পারবে সে বিশ্বাস আমার আছে। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, ডাক্তার, তুমি আমাকে যতই বাঁচাতে চেষ্টা করো না কেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি আমার দিন ঘনিয়ে আসছে। আমার মৃত্যুর পর আমার আত্মীয়স্বজন কেউ যেন এক পয়সা নগদ না পায় সেটা তুমি দেখো।

—আলমারিতে গয়না ছিল কিছু, সেগুলো পাওয়া যায়নি?

ডাক্তার আদিত্য বললেন, একটা ব্যাপার আছে। কিছু গয়না কিংবা দুর্মূল্য কিছু তিনি প্যাকেট করে আমাকে রাখতে দিয়েছিলেন। সেটি আমার কাছে এখনও আছে।

—কালো প্যাঁচার ব্যাপারটা কী? আফজল প্রশ্ন করল।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, ব্যাপারটা একেবারেই ঠিক নয় বলে মনে হয়। বহু প্রাচীনকালে ঐ পরিবারে হয়তো অমন কোনও একটা বস্তু ছিল। কোনও মুদ্রা, জাহাঙ্গিরের আমলের স্বর্ণমুদ্রা। সেটিকে কেউ গলানো সিসের ছাঁচে ফেলে একটা কালো প্যাঁচা গোছের কিছু বানিয়েছিল। কিন্তু সেটি আর ঐ পরিবারে নেই। পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কোনও এক অজ্ঞাত সময়ে ঐ বস্তুটির সদ্ব্যবহার করেছিলেন হয়তো, কিংবা এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলেন ঐ বাড়ির চত্বরের মধ্যে যা কেউ খুঁজে হয় পাননি কখনও, কিংবা পেলেও সেটা প্রকাশ করেননি। ঐ পরিবারের ইতিহাসে দেখা যায় একটা অপরাধের ধারা চলেছে। খুনখারাবি জালিয়াতি এসবই ঘটে গেছে ঐ পরিবারে। আবার ওরই মধ্যে সম্পূর্ণ আশ্চর্যজনক সৎ কিংবা সাধারণত আমরা যাঁদের স্বাভাবিক বলি এমন লোকও ছিলেন।

কিটু বলল, এ সব কথা কি তিনি আপনাকে বলেছেন?

ডাক্তার আদিত্য বললেন, কিছু তিনি বলেছেন। কিছু অন্যের কাছে শুনেছি, কিছু আন্দাজ করেছি। সব কথা জানবার উপায় আমার ছিল না, বুঝতেই পারছ। তিনি নিজেই অনেক সময় বলে যেতেন আমি শুনে যেতাম। আমি নিজের থেকে কখনই তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করিনি।

কিটু বলল, আপনার কাছে যে প্যাকেটটা আছে তাতে কী আছে আপনি জানেন না?

—না ভাই। ডাক্তার আদিত্য বললেন, আমি জানি না।

—কেন ওটা আপনার কাছে আছে?

—এখানে মাধবলালবাবুর মনের একটা পরিচয় পাবে। তিনি তাঁর কিছু মূল্যবান জিনিস আমার কাছে রেখে দিয়েছেন— প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল তাঁর আমার উপর। তিনি বলেছিলেন, উইলেও লেখা আছে, ঐ প্যাকেটটিতে যা আছে তা অমূল্য। তাঁর মৃত্যুর পর ঐ প্যাকেটটিতে যা আছে তা যেন সর্বসাধারণকে দান করা হয়।

—অদ্ভুত তো ব্যাপারটা ? ঐ প্যাকেটে যদি অমূল্য কিছু থাকে তাহলে তা সর্বসাধারণকে দান করা যাবে কেমন করে ?

ডাক্তার আদিত্য বললেন, বোধহয় কালো প্যাঁচা আছে, যেটি তিনি হয়তো জাদুঘরে দান করতে চান। কিন্তু প্যাকেটটা দেখে মনে হয় না ভারী কিছু আছে, বড় জোর আধ কেজি ওজন হবে। কালো প্যাঁচা, যা শুনেছি—তার ওজন অন্তত কেজি দেড়েক হওয়ার কথা।

কিটু বলল, মেয়েদের প্রতি মাধবলালবাবুর একটা দুর্বলতা ছিল।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, একটি মেয়ে সে সুযোগ নিয়ে তাঁকে ফাঁসিয়ে দিয়েছিল। একটি ঝি সত্যি তাঁকে বিপদে ফেলেছিল, কিন্তু তাতেও তাঁর শিক্ষা হয়নি।

—কী ব্যাপার ?

—ব্যাপার খুবই জটিল এবং সরল। ডাক্তার আদিত্য বললেন, ওঁর দ্বারা একটি ঝিয়ের সন্তান সম্ভাবনা হয়েছিল। ঝিটি খুবই সেয়ানা। সে বছর কয়েক আগে এই বাবদ হাজার দশেক টাকা খসিয়ে নিয়ে সরে পড়েছিল।

—কিন্তু এ কথা তো আগে শুনিনি।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, ব্যাপারটা আমার জানা। বেশ ভাল করেই জানা। আমাকেই ঐ বাবদ একটা বেআইনি অপারেশন করতে হয়েছিল। সেই ঝি যার নাম জয়ারানী তার স্বীকারোক্তি আমার কাছে আছে, তারই হাতের লেখায়, যাতে সে আর কিছু করতে না পারে। এই ব্যাপারে মাধবলালবাবুর আমার উপর নির্ভরতা বেড়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা কাকপক্ষীতেও টের পায়নি।

—কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর স্বভাব পাল্টায়নি। কিটু বলল।

—ওটাই ওঁর দুর্বলতা। ডাক্তার আদিত্য বললেন, ওঁর তাস খেলার শখ ছিল, কবিতা সম্পর্কে উৎসাহ ছিল—ভারি মশগুল হয়ে থাকতেন ওতেই, কিন্তু তাঁর আকাঙ্ক্ষার অবদমন এই বয়সেও হত না। নারী পেলেই, বিশেষ করে অসহায়া বলে ওঁর যাদের মনে হত তাদের প্রতি উনি ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়তেন। আমার বিশ্বাস, উনি কোনও কোনও ঝিকে হয়তো সোনার অলংকারও উপহার দিয়েছেন।

—আচ্ছা, নার্স রাধাময়ীর প্রতিও কি উনি—

—সম্ভব হতেও পারে। ডাক্তার আদিত্য বললেন, তবে প্রমাণ পাইনি।

—ওই নার্স তো এসেছিল বারাসত থেকেই।

—হ্যাঁ তা ঠিক। ডাক্তার আদিত্য বললেন, বিমানবাবু ওকে এই বাড়িতে আনেন। মাসে হাজার টাকা মাইনে, খাওয়াথাকা সমেত।

কিট্টু বলল, একজন ট্রেইনড নার্স এই পাড়াগাঁয়ে মাসে মাত্র হাজার টাকায় কাজ করতে কেন এল ?

ডাক্তার আদিত্য কথাটা বিবেচনা করবার জন্যই বোধহয় কিছুক্ষণ নীরব হলেন। তারপর বললেন, তুমি ভাবছ কোনও মতলব নিয়েই সে এখানে এসেছিল ? তা হলে বিমানবাবুর সঙ্গে ঐ খুনের একটা সম্পর্ক পাওয়া যায়, তাই না ?

কিট্টু বলল, হ্যাঁ আমি সেই সম্ভাবনাটা বাতিল করতে চাই না।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, রাধাময়ী ট্রেইনড নার্স ঠিকই, কিন্তু কয়েক বছর হাসপাতালে কাজ করার পর দেখা গেল ওর হায়ার সেকেন্ডারির সার্টিফিকেট আসল নয়, ভুয়া। অতএব তার চাকরি গেল। খুব আশ্চর্য ব্যাপার নয় ? তার কিন্তু রোগীর সেবা করার সব অভিজ্ঞতাই আছে। বুদ্ধিমতী, নরম স্বভাবের আর কর্তব্যপরায়ণতার জন্য তার একটা বড় প্রোমোশনও হয়েছিল ! কিন্তু ঐ এক টুকরো জাল কাগজের জন্য তার কেরিয়ারটাই নষ্ট হয়ে গেল। অথচ কত হাজার হাজার লোক হয়ত ঐ জাল কাগজের দৌলতেই কত রকম বড় বড় কাজ করছে, কেউ অধ্যাপনা করছে কেউ বা ডাক্তারি !

—ওর কি খোঁজ পাওয়া গেছে ?

—না। সে বাড়ি ফিরে যায়নি। পুলিশ অবশ্য তার ছবি নিয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে।

—তাই নাকি ? আফজল বলল, আমার তো চোখে পড়েনি।

কিট্টু বলল, আমিও দেখিনি। বেশ কয়েকদিন ভাল করে কাগজই দেখা হচ্ছে না।

আফজল বলল, কোন্ কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে ?

ডাক্তার আদিত্য একটু বাঁকা হাসি হেসে বললেন, গণপ্রভাতে।

আফজল লজ্জিতভাবে হাসল। বলল, ঐ কাগজটা আর পড়তে ইচ্ছে করে না। স্রেফ নিজের লেখাটা কি ভাবে কোন্ পজিশনে দিয়েছে, কিছু বাদ দিয়েছে কি দেয়নি দেখি। তারপর সমস্ত উৎসাহ চলে যায় পড়ার।

কিট্টু বলল, পুলিশ তা হলে চেষ্টা করছে। সেটা আশার কথা। আমার ধারণা রাধাময়ী ধরা পড়লেই মাধবলাল আচার্যর হত্যারহস্য সমাধান হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা !

কিট্টুর এই সঙ্গে হঠাৎ একটা কথা মনে হল—কথাটা প্রায়ই তার মনে হচ্ছে, ডাক্তার আদিত্যকে কি সব কথা বলা উচিত হচ্ছে ? ওঁর সরল সরল প্রাণখোলা কথাবার্তার আড়ালে প্যাঁচ নেই তো বড় কোনও ? উনি নিজে খুন করেননি এমন ভান করছেন। তা তো করতেই হবে। তাহলে মহেন্দ্র পাল কেন ডাক্তারের উল্লেখ করলেন ? মহেন্দ্র পাল—যাঁর সঙ্গে ওদের প্রথম দিনই দেখা হয়েছিল। ডাক্তারের বিরুদ্ধে বলার কারণটা তাহলে কী ? কেবলই সন্দেহ ? কিন্তু সন্দেহই বা কেন হবে, তার কারণ কী হতে পারে ?

ভাল লাগে না কিট্টুর এ সব কথা ভাবতে। এই জগতে কি কেউই সরল নয়,

সকলেরই মনে জিলিপির প্যাঁচ ?

প্যাঁচ কথাটা তার মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্যাঁচা কথাটাও মনে এল। কালো প্যাঁচা সম্পর্কে ডাক্তার আদিত্য যেভাবে বললেন যা বললেন তাতে তো ব্যাপারটাই বিরাট একটা হাস্যকর হতবুদ্ধিকর মিথ্যার ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেল।

কিট্টু ভাবল তাহলে বিমানবাবুই রাধাময়ীকে দিয়ে তাঁর কাজ হাসিল করলেন ? সেই কারণেই কি রাধাময়ী মাধবলাল আচার্যের বাড়িতে গিয়েছিল, তারপর কাজ হাসিল করে সোনার গয়নাগাঁটি আর ঘড়ি নিয়ে পালিয়েছে ? কিট্টুর মনে ঝড় চলছে। কিছুতেই সে বুঝতে পারছে না, গয়নাই যদি চুরি করতে হয় তাহলে মাধবলালবাবুকে মেরে ফেলার দরকার কী ? একটু ঘুমের ওষুধেই তো কাজ হতে পারত। সায়ানাইডের মতো সাংঘাতিক বিষের দরকার কী ? মেরে ফেলতেও ঘুমের ওষুধ একটু বেশি মাত্রায় কাজ হয়। রাধাময়ী তাহলে মারেনি। কিন্তু সে পালাল কেন ?

হতে পারে। একটা সম্ভাবনা তার মাথায় এল। রাধাময়ী যে ঘরে ছিল সে ঘর থেকে বিনা বাধায় নিঃশব্দে মাধবলালবাবুর ঘরে যাওয়া অসম্ভব নয়। হয়তো রাধাময়ী কোনও চিৎকার বা আর্তনাদ বা গোঙানি শুনে ওই ঘরে গিয়ে যখন বুঝতে পারল একটা সাংঘাতিক কাণ্ড হয়েছে, মাধবলালবাবু বিষ খেয়েছেন, এবং মারা যাচ্ছেন তখন তার ভয়ানক ভয় হল। এ জন্য ওকে দায়ী করা হতে পারে এটা একটা ভয়, আরও বড় ভয় সে যে জাল সার্টিফিকেট নিয়ে কাজ করছিল, সে জন্য তার চাকরি গেছে সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ত, সে জন্য সে তার সামান্য জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে গেছে।

কিট্টুর মাথায় নানা চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল। আচ্ছা—মাধবলালবাবুর অতিরিক্ত যৌন চেতনায় যদি সাড়া দিয়ে থাকে রাধাময়ী ? তাহলে সে কিছু হয়ত গোপনে গয়নাও উপহার হিসেবে পেয়ে থাকতে পারে। কিন্তু মাধবলালবাবু মারা যাওয়ার পর যখন তার কাছে ঐ সব গয়না পাওয়া যাবে তখন কেউই বিশ্বাস করবে না যে ওগুলো চুরি করা নয়। তাই রাধাময়ী রাতের অন্ধকারে ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে পালিয়ে গিয়েছিল। এটা বোধহয় অসম্ভব নয়।

কিন্তু অত রাত্রে সে একা কিভাবে যাবে, কত দূরেই বা যেতে পারবে ভিজতে ভিজতে ? তাহলে সে কি কাছাকাছি কারও বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে ছিল ? গ্রামে কি ওভাবে লুকিয়ে থাকা সম্ভব ? এটা পড়তে যত সময় লাগে তার হাজার ভাগের এক ভাগ সময়ও লাগল না কিট্টুর ভাবতে।

কিট্টু আর ভাবতে পারল না। এরকম জটিল কাণ্ড এর আগে সে কখনও হাতে নেয়নি। সে ঘেমে উঠল।

সামনে চলেছেন ডাক্তার আদিত্য এবং আফজল কথা বলতে বলতে। এবার কিট্টুর মনে এল বিমানবাবুদের সেই তীব্র তীক্ষ্ণ কথাটা, আপনিই আমার বাবার মৃত্যুর জন্য দায়ী। আপনিই দীর্ঘদিন ধরে বাবার সমস্ত দামি জিনিস সরিয়েছেন, এবং শেষে খুন করে…।

হঠাৎ ডাক্তার আদিত্য পেছন ফিরে তাকালেন। বললেন, তুমি অত পিছিয়ে পড়ছ কেন ? ক্লান্ত লাগছে বুঝি খুব খিদেয় ?

খিদে ? কিট্টুর এতক্ষণ মনে হয়নি কিন্তু এখনই মনে হল সত্যি তারা বহুক্ষণই না খেয়ে আছে।

ডাক্তার আদিত্যর বাড়ির সামনে একটা চমৎকার ঝকঝকে অ্যামবাসাডর দাঁড়িয়ে আছে। একজন মেকানিক গোছের লোক সেলাম করে এসে দাঁড়াল। বলল, সব ডিফেক্ট সার ঠিক করে দিয়েছি। এখন দু বছর নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। বলে একটা বিল ডাক্তার আদিত্যর দিকে বাড়িয়ে দিল।

ডাক্তার আদিত্য বিলটার উপর চোখ বুলিয়ে বললেন, সাড়ে চার হাজার টাকার উপর যে ? মেকানিক সলজ্জভাবে তা স্বীকার করল। তারপর বলল, পুরো ট্যাঙ্ক পেট্রোল আছে সার। কোথাও পেট্রোল মিলছে না, শেষে ধূর্জটিবাবুকে বলে ···। এরপর লোকটি একটু থামল। বলল, চেকটা কি আজই দেবেন সার ? ডাক্তার আদিত্য বললেন, পরে দেব—দিন দশেক বাদে এসো। লোকটি দন্ত বিকশিত করে বলল, সার চা খাওয়ার জন্য যদি গোটা কুড়ি টাকা দিতেন ···বড় পরিশ্রম গেছে।

ডাক্তার আদিত্য পকেট থেকে কুড়ি টাকার একটা নোট বার করে দিলেন। লোকটি চলে গেলে বললেন, বারাসত বড় এক্সপেনসিভ জায়গা হয়ে উঠল, এক কাপ চায়ের দাম কুড়ি টাকা ! নাকি বকশিস কথাটা সম্মানহানিকর ?

খাওয়ার ব্যবস্থা বেশ ভালই হয়েছিল। পোলাও মাংস বেগুন ভাজা আর পায়েস। রান্নাও চমৎকার।

খাওয়ার পর কিট্টুর ভারি ঘুম পেয়ে গেল। এই অভ্যেসটা তার সম্প্রতি হয়েছে। বিশেষ কিছু না করার থাকলে যা হয়। ওর চোখ দেখেই রানিদি বললেন, ঘুম পাচ্ছে তো, ঘুমিয়ে নাও তোমরা।

আফজল বলল, নাঃ এখুনি আমাদের যেতে হবে। ইস কত বেলা হয়ে গেছে।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, আজ কি না ফিরলেই নয় ? এখানে থেকে যেতে পারতে অনায়াসে—আমাদের কোনও অসুবিধে হবে না, বরং ভালই লাগবে।

আফজল বলল, আমাকে আজ ফিরতেই হবে। কাল সকালেই আমার ডিউটি। আজ রাতেই যাওয়ার ইচ্ছে আছে।

রানিদি বললেন, কলকাতা যাওয়ার অনেক সময় আছে। আজ পৌঁছুলেই তো হল ? এখন একটু বিশ্রাম করে চা খেয়ে তারপর যেয়ো।

কিছুক্ষণ পর কিট্টুর একটু তন্দ্রামতো এসেছিল, অকস্মাৎ আজফল তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তুলল।

ধড়মড় করে কিট্টু উঠে বসল।

সর্বনাশ হয়েছে কিট্টু ! আফজল বলল, একটু আগে কলকাতা থেকে ফোরেনসিক বিভাগ বারাসত পুলিশকে জানিয়েছে যে ওষুধের শিশি আলমারি থেকে নিয়ে গিয়েছিল পরীক্ষার জন্য তার একটি ওষুধ—কার্ডোাড়িলাম এর

শিশির গায়ে আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। একটু আগে একজন খবরটা দিয়ে গেছে ডাক্তার আদিত্যকে।

—ভাল কথা! কিট্টু চোখ মুছতে মুছতে বলল।

—ভাল কথা নয়। শিশির গায়ে কার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে জানো, মিহিরের!

কিট্টু বলল, তাতে কি হয়েছে, কার্ডোডিলাম কি বিষ নাকি?

আফজল বলল, কার্ডোডিলাম বিষ নয় ঠিকই। কিন্তু ধরো যেটার একটা ক্যাপসুল ওষুধ, তার দুটো ক্যাপসুল এক সঙ্গে খেলে মারাত্মক হতে পারে।

ডাক্তার আদিত্য ঘরে ঢুকে বললেন, কথাটা ঠিকই। কোনও জিনিস আছে যা বিষ মোটেই নয়, কিন্তু মাত্রাধিক্যেই তা মারাত্মক বিষের কাজ করে।

—তাই নাকি, আফজল প্রশ্ন করল।

—নিশ্চয়ই! ডাক্তার আদিত্য বললেন, ধরো সাধারণ নুন। যা আমরা রান্নায় দিই, পাতে খাই—যা না হলে আমাদের বাঁচাই শক্ত, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে খেলে ঐ নুনই বিষ হয়ে দাঁড়ায়! ঐ নুনই মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

আফজল বলল, মহা মুশকিল হল আমাদের ঐ মিহিরের। বেচারা সাতে নেই প্যাঁচে নেই, অথচ বার বার ওকেই প্যাঁচে পড়তে হচ্ছে! কিন্তু আমরা এখন কি করতে পারি, কিট্টু প্রশ্ন করল।

—প্রথমেই মিহিরকে যাতে ফের গ্রেফতার না করে পুলিশ সেটা দেখতে হবে। যাকে বলে আগাম জামিন নেওয়া, সেটা নিতে হবে। ডাক্তার আদিত্য, বললেন, দরকার হলে আমি সাহায্য করব। তোমরা আজ চলে যাও, আমি গাড়িতে করে বারাসত পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছি, আমার একটা কাজও আছে সেখানে। আমি কালই তোমাদের সঙ্গে দেখা করব সকাল আটটার মধ্যেই। তোমার ঠিকানাটা লিখে দাও কিট্টু ঐ প্যাডের উপর। তোমরা এখনই চলে যাও।

৯

রাত প্রায় সাড়ে আটটার সময় কিট্টু আর আফজল পৌঁছুল মিহিরের বাড়িতে। বাড়ির আবহাওয়া যথেষ্ট গম্ভীর দেখে বুঝতে দেরি হল না যে খবরটি সেখানেও পৌঁছে গেছে। মিহির প্রায় কান্না কান্না কণ্ঠে বলল, আমি বড় বিপন্ন। আমি কিছুই করিনি, অথচ বার বার আমাকেই ঝামেলায় পড়তে হচ্ছে। সুপ্রিয়া পিসিও বেশ বিচলিত। তিনি বললেন, এবার কি হবে?

কিট্টু সান্ত্বনার সুরে বলল, কিছু হবে না পিসি। এই সময় মিহিরের বাবা শান্তিরঞ্জনবাবু এলেন। একটু উদাসীন ভাব। সংসারের ব্যাপারে বিশেষ থাকেন না, অনেক সময় যেন এ জগতেই থাকেন না, এই ব্যাপারে অবশ্য একটু অসহায় বোধ করছেন। তিনি বললেন, কিট্টু একটা কাজ কর—বড় পুলিশে খবর দে—এ ভারি অন্যায় কথা। ওষুধের শিশিতে মিহিরের হাতের ছাপ থাকবে কেন? ওটা অন্য কারু হাতের ছাপ।

ওরা বুঝল ওঁকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা শক্ত হবে। কিট্টু বলল, তাই করব পিসেমশায়। ছোট পুলিশকে শায়েস্তা করতে বড় পুলিশ ডাকতে হবে।

—তোরা গুরুচরণকে বল না। ওর দু-দুটো আলসেশিয়ান আছে, ওঁর কথার উপর কেউ কথা বলবে না।

গুরুচরণ সমাদ্দার এক কালে পুলিশ বিভাগে একজন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি ছিলেন। সাত বছর আগে রিটায়ার করেছেন, এখন কোনও ক্ষমতা নেই, কিট্টু সেটা জানে। সে বলল, ঠিক আছে পিসেমশাই, গুরুচরণবাবুকে বলব।

—কিছু মিষ্টি নিয়ে যাস যখন যাবি। পিসেমশাই বললেন, মিষ্টি ভারি ভালবাসেন উনি। বলে, যেন সমস্ত ব্যাপারে আর কিছু করার নেই, এমনি একটা নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

সুপ্রিয়া পিসি বললেন, দেখলি তো, দেখলি তো—আমি কেমনভাবে আছি দেখলি তো কিট্টু? যতদিন যাচ্ছে কেবল গাদাগাদা বই পড়ছেন। কোথায় কবে কোন্ যুদ্ধ হয়েছিল, সে যুদ্ধে কারা জিতেছিল কারা হেরেছিল এই সব নিয়েই আছেন। পোকায় ভর্তি সব বইগুলো রোজ গেলেন। এ দিকে যে ছেলে বয়ে যাচ্ছে সংসার ভেসে যাচ্ছে তার কোনও চিন্তা নেই। যাকগে, কিট্টু তুই কিছু একটা কর। সুপ্রিয়া পিসিও একটু পর বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

কিট্টু কিছুক্ষণ চুপ করে বলল, ব্যাপারটা কি করে হল রে?

মিহির বলল, মাইরি বলছি কিট্টুদা আমি কিছু জানি না। আমার কিচ্ছু মনে পড়ছে না।

—তুই কি ওষুধের আলমারি খুলেছিলি?

মিহির দু হাতে মাথা রেখে অনেকক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, সে সময় আমার ঠিক খেয়াল ছিল না কি করেছি। যা মনে পড়ছে অনেক অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেছি, গল্প করেছি, কবিতা পড়েছি অনেক রকম কথাও হয়েছে। মাধবলাল-

বাবু আমার উপর ভারি খুশি হয়েছেন এ সব মনে পড়ছে। মনে পড়ছে ঝোড়ো হাওয়ায় তাঁর সঙ্গে বিষ্টিতে কত রকম আওয়াজ হচ্ছে, ব্যাং ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ঝিঁঝিঁ ডাকছে। কোথায় টিনের উপর জল পড়ছে, তার একটা অন্য রকম আওয়াজ হচ্ছে, এক ধরনের সঙ্গীত সৃষ্টি হচ্ছে। মনে আছে, ভারি ভাল লাগছিল। মনে পড়ছে তিনি এক আশ্চর্য কালো প্যাঁচার কথা বলেছিলেন, আরও একটা আশ্চর্য কথা মনে পড়ছে।

—আশ্চর্য কথা ?

—ভারি আশ্চর্য কথা! বাঘা ঘরে ঢুকেছিল, আমরা যখন রাত্রের খাওয়ার পর বসে বসে বোতল থেকে একটু একটু করে হুইস্কি খাচ্ছিলাম জল মিশিয়ে, তখন সে এসে পায়ের কাছে বসে আমাদের দিকে লোভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

—তারপর ? আফজল বলল।

—তারপর এক অদ্ভুত ব্যাপার। টেবিলের উপর দুটো টোকা দিতেই বাঘা ছুটে ঘরের বাইরে গেল, পর মুহূর্তেই ফিরে এল অ্যালুমিনিয়ামের একটা কোয়ার্টার প্লেট হাতে করে।

—হাতে করে ? আফজল বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

মিহির বলল, না না মুখে করে। কি বলতে কি বলছি। তারপর শোনো, আরও অদ্ভুত ব্যাপার। মাধবলালবাবু খাট থেকে নামলেন। আস্তে আস্তে তিনি ওষুধের আলমারির ভেতর থেকে কি একটা টনিকের বোতল বার করলেন। তা থেকে তিনি বেশ খানিকটা তরল পদার্থ বাঘার আনা কোয়ার্টার প্লেটে ঢাললেন, আর সে বেশ চুক চুক করে সেটা শেষ করে দিল। আমি বুঝলাম রাম। রামের গন্ধ আমি চিনি। তবে খুব সেরা জাতের নয় কিট্‌দা। শস্তা জাতের রাম। মাধবলালবাবু বললেন, আরে কাউকে বারণ করলেই কি সে মেনে নেবে ? এ কি ডিক্টেটরশিপ, এ হল ভারতবর্ষ, এখানে গণতন্ত্র হুম-হাম করে চলছে! আরে আমার উপর ডাক্তার নোটিশ জারি করেছে তো ভারি বয়ে গেছে। আমি না হয় না-টেনে রইলাম কয়েকমাস, কিন্তু বাঘা ? বেচারার তো বাত হয়নি, ব্লাড প্রেশার নেই, সুস্থ সবল সরলপ্রাণ প্রভুভক্ত কুকুর—ওর কি হবে ? তাই তো আমি কৌশলে, বুঝলে মিহির, ওকে শান্তিতে রাখতে পেরেছি। তারপর মাঝে মাঝে নিজেকেও খুশি করেছি—আরে এ দেশে কি হম্বিতম্বি চলে ? এ হল গণতন্ত্রের দেশ। নজগজ এখানে যা ইচ্ছে করবে কার বাবার কি তাতে ?

—নজগজ মানেটা কি ? আফজল বলল।

মিহির বলল, আমার মনে হয় উনি বলতে চেয়েছিলেন জনগণ।

—তারপর কিছু তোমার মনে আছে ?

মিহির ভাবল। তারপর বলল হ্যাঁ—একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম কথাটা। অনেক কাব্য আলোচনার পর উনি বললেন, ভাইরে আমার মনে হচ্ছে আমার বুকে আজ ব্যথা হবে বেশ। আজ একটু বেশি টেনে ফেলেছি—তোমার খাতিরে। তুমি একটা কাজ করো ভাই, ঐ যে আলমারিটা রয়েছে ওর মধ্যে

তিনটে ওষুধের শিশি দেখবে যার গায়ে লেখা আছে কাডোডিলাম, ওর থেকে একটা ক্যাপসুল প্লেটের উপর রেখে দাও, হ্যাঁ আমার এই সাইড টেবিলে রেখে দাও। দরকার হলে খেয়ে নেব। জল তো টেবিলেই আছে।

—তুমি তাই করলে? আফজল প্রশ্ন করল।

—এখন মনে পড়ছে, আমি তাই করলাম। দেখলাম তিনটে কাডোডিলাম শিশির মধ্যে একটি একেবারে ফাঁকা। তখন আমি একটা নতুন শিশি নিয়ে কটকট করে খুলে ফেললাম। মিহির বলল, তারপর তা থেকে একটা ক্যাপসুল নিয়ে প্লেটে রাখলাম।

—নতুন শিশি? কিটু লাফিয়ে উঠল প্রায়, তুমি ঠিক বলছ?

—ঠিক বলছি কিট্দা।

—তবে তো চমৎকার। কিটু বলল, পুলিশ যদি মনে করে তুমি ওষুধের সঙ্গে সায়ানাইড অব পটাশিয়াম মিশিয়ে দিয়েছ তাহলে এতেই প্রমাণ হবে তা নয়।

আফজল বলল, পুলিশের মনে করা থেকে কি ঠেকানো যাবে কিটু? আমরা যা অনুভব করছি, সেটা তো প্রমাণ নয়। পুলিশ তো এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করবে যে ওষুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে মিহিরই খাইয়েছে! কেন? না মিহির ওই সময় উপস্থিত ছিল। পুলিশ বলবে মিহির পকেটে করে বিষের একটা ক্যাপসুল নিয়ে গিয়েছিল সঙ্গে, সে সেটা ওষুধের ক্যাপসুলের বদলে, কিংবা একসঙ্গেই মাধবলালবাবুকে খাইয়েছে।

কিটু বলল, সে তো ভাবতেই পারে। কিন্তু আসলে কি হয়েছিল তা তো বোঝা যাচ্ছে না। সেটাই তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মাধবলালবাবু আত্মহত্যা করেননি এটাই ধরে নিচ্ছি। তাহলে কেউ বিষ খাইয়েছে সেটা ঠিক। ওষুধের বদলে বিষ দিয়ে কেউ মেরেছে ওঁকে। মিহির বলছে সে সম্পূর্ণ নতুন একটা শিশি বার করে সেটার ঢাকনা সদ্য খুলে তা থেকে একটা ক্যাপসুল বার করে প্লেটের উপর রেখেছিল। আচ্ছা মিহির, মনে করে দ্যাখ তো সকালবেলা প্লেটের উপর ক্যাপসুলটা ছিল কি-না?

—মনে পড়ছে না কিট্দা। তবে মনে হয় ছিল না। জলও গ্লাসে সামান্যই ছিল।

হঠাৎ সুপ্রিয়া পিসি ঘরে ঢুকে বললেন, খেয়ে যাবি তোরা। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব হয়ে যাবে। তারপরই চলে গেলেন।

কিটু বলল, ঐ ঘরে বাইরের কোনও লোক এসেছিল রাতে?

মিহির বলল, কি করে জানব কিট্দা। আমরা যে উইং-এ ছিলাম সেটা তিন-ঘরা একটা আলাদা ইউনিট বলতে পার। বারান্দার গ্রিল করা গেটে তো তালা দেওয়াই দেখেছি মনে হচ্ছে। দু একবার বাইরের দৃশ্য দেখতে বারান্দায় গিয়েছি।

কিটু উত্তেজিত হয়ে বলল, যে কেউ বাইরে থেকে ওই বাড়িতে ঢুকতে পারে, যেমন করে যে কেউ বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।

আফজল বলল, সেটা কেমন করে হয় ?

কিট্টু বলল, চাবি থাকলেই হয়। গ্রিলের দরজার তালা দিলে ভেতর থেকেও খোলা যায় বাইরে থেকেও খোলা যায়। ইস বাইরে থেকে ঝড়বৃষ্টি কাদা ভেঙে কেউ ঘরে ঢুকলে চমৎকার চমৎকার সব পদচিহ্ন পাওয়া যেত। সে সব পুলিশ খেয়ালই করেনি বোধহয় ?

আফজল বলল, আরে পুলিশ খেয়াল করবে কেন ? তারা তো মিহিরকে ঐ বাড়িতে দেখেই ভেবেছে তারা পেয়ে গেছে অপরাধীকে, তাদের আর কি চাই ? বাইরের লোক মিহির, অতএব সোনায় সোহাগা। ওর হয়ে কেউ কিছু গোলমাল হুজ্জুতি করবে না। নিরাপদ লোক, কিন্তু জানত না যে লোকটি কবি, এবং আধুনিক কবি। রাজনৈতিক দলের মতোই কবিরা শিবিরে শিবিরে বিদ্যমান। দু-পাঁচটা শিবির নয় ডজনে ডজনে শিবির। একেবারে দিল্লির ক্ষমতালোলুপ রাজনীতিবিদদের মতোই এক এক শিবিরের আচার-ব্যবহার। তবে একটা ভাল কথা কবিদের সম্পর্কে বলা যায় ওরা কেউ কেউ ক্ষমতালোলুপ, হয়তো সম্মান-লোলুপ, শ্রোতালোলুপ, ভক্তলোলুপও, কিন্তু টাকা-পয়সালোলুপ নয়। দরকার হলে তারা জোটও বাঁধে আবার প্রায়ই নির্জোট হয়ে নিজেদের মধ্যেই খামচা-খামচি করে, অধিকাংশই অন্তত তাই। কি বলো মিহির ?

মিহির জবাব দিল না।

কিট্টু বলল, তোমার ভয় নেই মিহির। তুমি যে ওষুধ খাইয়েছ মাধবলাল-বাবুকে তাতে বিষ ছিল না। থাকা সম্ভব নয়। নতুন শিশি খুলে তা থেকে তুমি ওষুধ দিয়েছ। অতএব বিষ ওষুধের মধ্যে ছিল না। তুমি খাইয়েছ ওষুধ, তোমাকে ধরার কোনও উপায় নেই।

আফজল বলল, কিট্টু, কথাটা বোধহয় তুমি ভাল করে ভেবে বলনি। ওষুধের শিশি যে আস্ত ছিল, আনকোরা নতুন ছিল, সেটা খুলে একটা ক্যাপসুল মিহির প্লেটে রেখেছিল সেটা কে বলেছে ? বলেছে মিহির। কে দেখেছে ? দেখেছেন মাধবলালবাবু। মাধবলালবাবু এখন মৃত। মৃত ব্যক্তি সাক্ষি দেয় না, কথা বলে না। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ বা প্রবচনই আছে—ডেড মেন ডু নট টেল টেলস্। অতএব মিহির যেখানে ছিল সেখানেই আছে।

কিট্টু বলল, আমরা তো জানি মিহির ঠিক কথাই বলছে ?

আফজল বলল, ঠিক কথা। মিহির ঠিক কথাই বলছে—কিন্তু প্রমাণ তো করতে হবে।

কিট্টু বলল, কতকগুলো জিনিস প্রমাণ করতে হয় না, ধরে নিতে হয়। আসলে মিহিরের অকস্মাৎ ঐ বাড়িতে যাওয়া এবং আশ্রয় নেওয়া এবং সেই রাত্রেই মাধববাবুর ঐভাবে মৃত্যু হওয়ার মধ্যে পূর্ব পরিকল্পনা থাকা সম্ভব নয় কেননা মিহিরের কোনও মোটিভই নেই। মিহিরের বন্ধুরা সাক্ষি দেবে সে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দৌড়ে তাদের মিনিবাস ধরতে চেষ্টাও করেছিল, একটুর জন্য মিস্ করেছে। অতএব আমি জানি আদালতে মিহির ছাড়া পাবেই। কিন্তু আসল কথা তা নয়। আসল কথা হল খুনটা করল কে ? সেটাই আমাদের খুঁজে

বাঘাকাকাকেও সব বলতে হবে গুছিয়ে। কিন্তু গুছিয়ে বলা কি সহজ? বাড়িতে ফিরে সে বাঘাকাকাকে তার সমস্ত দিনের অভিজ্ঞতার কথা একটু একটু করে জানাল। বাঘাকাকা গম্ভীরভাবে সব কথাই শুনলেন, কিন্তু বিশেষ মন্তব্য করলেন না। কেবল বললেন, বেশ ভাল কথা, কিংবা চমৎকার, কখনও বা, তাই নাকি?

কিট্টুর হাই উঠছে দেখে বাঘাকাকা বললেন, শুতে যাও কিট্টুবাবু। কাল সকালেই তো আবার ডাক্তার আদিত্য আসছেন।

কিট্টুর সে কথা মনে করে মনটা ভারি উদাস হয়ে গেল। সকাল থেকেই আবার কাজ, হয়তো উত্তেজনা। তার ক্লান্তি আসছে ভাবতেই। তার কি কোনও অসুখ করেছে? ডাক্তার আদিত্যর কাছ থেকে কোনও পরামর্শ নেবে কি? কবে এই অনুসন্ধান শেষ হবে? সত্য অনুসন্ধান! কথাটা ভাবতেই তার হাসি পেয়ে গেল, সে ম্লান হাসি হাসল। সত্য ব্যাপারটা যে সর্বদাই বরুপীর মতো চেহারা বদলায়।

পরদিন ডাক্তার আদিত্য এলেন, কিন্তু সকালে নয় বেশ দেরিতে। নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছেন। তিনি বললেন, আর বোল না ভাই। গাড়িটা রাস্তায় খারাপ হয়ে গেল, যে গাড়ি কালই সারাই হয়ে এল এবং মেরামতওয়ালা বলে গেল এখন দু বছরের মতো নিশ্চিন্ত! এই হচ্ছে সেই গাড়ি; যাই হোক আবার দেড়শো টাকা খরচ করে কোনমতে সারিয়ে এনেছি। সকালে রোগীদের আজ আর দেখলাম না। বলো কি কাজ করা যেতে পারে মিহিরের আগাম জামিনের ব্যাপারে।

কিট্টু কথাটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। সে বলল, হ্যাঁ আগাম জামিন ব্যাপারটা মন্দ নয়। কিন্তু আমার মনে হয় পুলিশ বোধহয় এবারে একটু সাবধানেই কাজ করবে, ওকে তৃতীয়বার গ্রেফতার করে হাস্যাস্পদ হবে না। আজকের কাগজে দেখছি আফজল গণপ্রভাতে ছোট্ট একটা সংবাদ দিয়েছে, বিশেষ সংবাদদাতার নামে। তাতে পরোক্ষে, কৌশলে পুলিশকে একটু সমালোচনা করাও হয়েছে। হয়তো এতে পুলিশ সংযত হবে।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, আমি কাগজটা দেখিনি। বাঘাকাকা কাগজ এনে দিলে ডাক্তার আদিত্য পড়ে বললেন, একসেলেন্ট, সবসমেত কুড়ি লাইনের বেশি লেখেনি, কিন্তু বেশ চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছে।

—কিন্তু আমরা তো সেই অন্ধকারেই রয়ে গেলাম ডাক্তার আদিত্য? কিট্টু বলল, আপনি কি আমাদের আর কিছু বলতে পারবেন? দিতে পারবেন কোনও হদিস? মাধবলালবাবুকে মেরে কার লাভ হতে পারে সেটা আমরা তো মোটামুটি জানতে পারলাম, কিন্তু সত্যি সত্যি কে ঐ কর্মটি করতে পারে সেটা সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন? সমস্যাকে একটু অন্য দিক থেকে দেখা, এই আর কি।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, সত্যি কথাটা এই যে মাধবলালবাবুর মৃত্যুতে

বার করতে হবে। মিহিরকে জেল থেকে বাঁচাতে নয়, মিহিরের প্রতি যাতে কারু কখনও সন্দেহ না হয় সে জন্যই সেটা করা দরকার। তা ছাড়া আমাদের আরও একটা দায়িত্ব এসে গেছে। কেবল মিহির নয়, ডাক্তার আদিত্যকেও তো সন্দেহ করা হচ্ছে। তিনিও তো আমাদের উপরই ভার দিয়েছেন সত্য অনুসন্ধানের। আর এই সত্য অনুসন্ধান আমাদেরই করতে হবে। এ কর্ম পুলিশ করবে না। পুলিশ করতে পারে না তা নয়—তাদের যে সব শক্তি সামর্থ্য আছে তাতে তারা পারে না এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু, আসলে তারা করবে না, তার কারণ এই ব্যাপারে কোনও বড় পুলিশ কর্তা আগ্রহ দেখাননি। দ্বিতীয়ত এর মধ্যে নগদ অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা তেমন নেই। আজকাল ঐ অঞ্চলে পুলিশ এবং চোরা-কারবারিদের মধ্যে যে আদান-প্রদান চলে তার পরিমাণ কম নয় এবং সবচেয়ে বড় কথা, সেটা চলে এমন সুষ্ঠুভাবে যে ধরা যায় না। আমি অবশ্য দু-একজন সৎ পুলিশের কথা ধরছি না, তাঁরা নমস্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।

কিট্টু বলল, আমরা দেখিনি, কিন্তু কাছেই রয়েছে ইচ্ছামতী নদী। ভুবনচরা থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার। ওপারেই বিদেশ। সাহেবরা আমাদের একটা সুবিধে করে দিয়েছেন, আগে বিদেশ কত দূরে ছিল. এখন কলকাতা থেকে সত্তর আশি কিলোমিটার দূরে একটা নদী পেরোলেই বিদেশ। আর তাতে সুবিধে। এই অঞ্চলে যারাই সাহসী, যারাই জীবনটাকে একটু সহজভাবে নেয়, যারা নীতি সততা ইত্যাদির দাম কমিয়ে এনেছে তাদের পক্ষে দিনে দু-পাঁচশো টাকা আয় করা এমন কিছু কঠিন কর্ম নয়। এই অঞ্চলের প্রাচুর্যের বড় প্রমাণ দেখবে কত বাড়ির উপর টিভি-র শুঁড়। একটা বাচ্চা ছেলেও আধুনিক ক্যামেরার লেন্স, দাম, এ সবের কথা জানে। তারপর দ্যাখো ডাক্তার আদিত্যের ব্যাপারটা. উনি গ্রামের ডাক্তার। কিন্তু তিনি যত কম ফিই নেন না কেন, তাঁর আয় বেশ ভালই হয়। গাড়ি আছে, ফ্রিজ আছে, ছেলে-মেয়েদের হস্টেলে রেখে পড়ান। এই অঞ্চলের সমৃদ্ধির সঙ্গে ওঁর লাইফ স্টাইল খাপ খেয়ে যায়। তবে এটা ঠিক, আমার মনে হয়েছে এখানকার গরিব কিন্তু অনেকেই গরিব সেজে থাকে।

সুপ্রিয়া পিসি ঘরে ঢুকে বসলেন, তোমরা সব খেয়ে নাও, খাদ্য প্রস্তুত। চলে এসো খাওয়ার ঘরে।

মিহির বলল, কিট্‌দা, গরিব সাজে কেমন করে ?

এর পরই সকলে উঠে পড়ল বলে এর উত্তরটা আর কিট্টুর দেওয়া হল না। অবশ্য এর উত্তর কি হবে তাও কিট্টুর জানা নেই। তবে কথাটা ঠিকই। মাধব-লালবাবুর যা ঐশ্বর্য ছিল তাতে উনি বেশ জমকালোভাবেই বাস করতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি করেননি। বাড়িটাকে পর্যন্ত বোধহয় তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে সারাননি। চুনকাম হয়নি, রং হয়নি। এও তো এক ধরনের গরিব সেজে থাকাই।

খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা উঠল। কিট্টু হাই তুলে বলল, বড় ক্লান্ত লাগছে। রাতও বেশ হয়েছে—এবার বাড়িতে গিয়ে একটু ঘুমের ব্যবস্থা করা যাক।

কারুই ক্ষতি হয়নি। কেউ মনে আঘাত পাননি। উল্টোদিক দিয়ে দেখলে দেখা যায় তাঁর মৃত্যুতে লাভও কারু হয়নি, তিনি তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী আত্মীয়-স্বজন প্রত্যেককেই বঞ্চিত করে গেছেন।

কিটু বলল, প্রত্যেককে বঞ্চিত করেননি, আপনি নিজের কথাটা ভুলে যাচ্ছেন।

ডাক্তার আদিত্য তীব্র দৃষ্টিতে কিটুর দিকে তাকালেন। তারপর যেন কোনওক্রমে নিজেকে সংযত করলেন। মুখ হাসি ফুটিয়ে বললেন, ঠিক কথা। তিনি আমাকে তাঁর নগদ টাকাকড়ির অর্ধেক দিয়ে গেছেন, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নয়, ভুবনচরায় একটা হাসপাতাল গড়ে তোলার জন্য। ওর থেকে আমার একটি পয়সাও লাভ হবে না। এ ছাড়া লাভ হবে কলকাতার একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের। কিন্তু আসল কথা হল এই উইলের কথা যাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন তাঁদের কেউই জানতেন না। তাঁরা—অর্থাৎ তাঁর পুত্র কন্যারা এবং পুত্রবধূরা জানতেন মাধবলালবাবুর মৃত্যুর পর তাঁরা লাভবান হবেন। সেটাই আসল কথা।

কিটু বলল, কেবল বিশ্বলাল হয়তো জানতেন তিনি কিছুই পাবেন না।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, উইল করলে তিনি বঞ্চিত হবেন, কিংবা কম পাবেন এটা হয়তো তিনি জানতেন, কিন্তু উইলের কথাটা তাঁর তো জানার কথা নয়। সেটা তাঁর বাড়ির লোকেরা কেউই বোধহয় জানতেন না। সে দিক দিয়ে বিচার করলে কিন্তু ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়ায়।

ডাক্তার আদিত্য একটু চুপ করলেন। তারপর বললেন এই উইলও তো ছেলেমেয়েরা মানবেন না। তাঁরা নিশ্চয় এর প্রতিবাদ করবেন, মোকর্দমা করবেন, প্রশ্ন তুলবেন তাঁদের পিতার মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে।

কিটু বলল, আপনি তো ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক। আপনি কি মনে করেন তিনি মানসিক দিক থেকে সুস্থ ছিলেন?

ডাক্তার আদিত্য বললেন, আমার মনে হয় না এই যুগে কোনও মানুষই মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারেন। এই মানসিক অস্বাভাবিকত্ব প্রতিটি মানুষের মধ্যেই থাকে। মানুষের মনের ইচ্ছে অনেক সময়েই লাগাম ছাড়া হয়। প্রতিভাবান ব্যক্তিরাও অস্বাভাবিক সাধারণ মানুষের কাছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও কি কারু স্বাভাবিক বলে মনে হবে? কিংবা আইনস্টাইনকে? গড় মানুষদের দৃষ্টিতে আর সকলেই তো অস্বাভাবিক। আবার অন্যেরাও মনে করবে গড় মানুষ অস্বাভাবিক। এটাও ঠিক, গড় মানুষ নেইই এই দুনিয়ায়।

—আপনাকে যদি আদালতে সাক্ষি দিতে বলা হয় তাহলে আপনি কি বলবেন মাধবলালবাবু অস্বাভাবিক ছিলেন?

—না তা আমি বলব না। বলব তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং স্বাভাবিকই ছিলেন। আইনগত সংজ্ঞা অনুযায়ী তিনি স্বাভাবিকই ছিলেন।

—তাহলে উইলের বিরুদ্ধে মামলায় আপনার সাক্ষ্যের জোরে ছেলেমেয়েরা হেরে যাবেন?

—না। ডাক্তার আদিত্য হাসলেন একটু। ম্লান হাসি। তারপর চশমার কাচ দুটো রুমাল দিয়ে পরিষ্কার করলেন। তিনি বললেন, ওঁরাই জিতে যাবেন যতদূর মনে হয়।

—কেন?

—কেন না, আমার সাক্ষি এ ক্ষেত্রে একেবারেই ইনভ্যালিড। এই ব্যাপারে আমার স্বার্থ জড়িত, অতএব আমার সাক্ষ্য হবে একপেশে—বায়াস্ড। আদালত আমার সাক্ষ্যকে যদি গ্রাহ্য না করে সেটাই হবে স্বাভাবিক!

—এ ব্যাপারটার কথা আপনার মনে হয়নি কখনও?

ডাক্তার আদিত্য বললেন, একটু একটু মনে হয়নি তা নয়। তবে কাল মাধবলালবাবুর বাড়িতে গিয়ে বুঝলাম গ্রামের হাসপাতাল বোধহয় করা যাবে না। ছেলে-মেয়েরাই জিতবেন। এই রকম কেসে আদালত প্রায় সর্বদাই ব্যক্তির স্বার্থই বড় করে দেখেন সামাজিক স্বার্থ নয়।

—কিন্তু আপনিই তো একমাত্র ডাক্তার যাঁর সাক্ষ্য হতে পারত সবচেয়ে মূল্যবান? কিটু প্রশ্ন করল। প্রশ্ন করেই তার মনে পড়ল সেই সাধুর কথা। ছাই খাইয়ে এবং গায়ে মাখিয়ে যিনি রোগীদের চিকিৎসা করতেন। তিনিও তো ডাক্তারই ছিলেন। কথাটা অবশ্য এখনও বলা হয়নি ডাক্তার আদিত্যকে। সে তা না বলাই ভাল বলে মনে করল।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, মূল্যবান? ঠিক কথা, কিন্তু যা বললাম, আমার সাক্ষ্য সেখানে টিকবে না। বাড়ির লোক যা সাক্ষ্য দেবেন আদালত তার উপরই রায় দেবেন। তা ছাড়া ওঁর যে মাথা খারাপ ছিল এটা বলার জন্য সাক্ষির অভাব হবে না।

—আচ্ছা ডাক্তার আদিত্য, ঐ যে সাধু, ভুবনচরার নতুন সাধু বলা হয় যাঁকে, যিনি ঐ হত্যার রাত থেকেই নিরুদ্দেশ, তাঁর কথা পুলিশকে বলা হয়েছে কি?

—না বোধহয়। অন্যমনস্কভাবে ডাক্তার আদিত্য বললেন।

—ওটা পুলিশকে জানালে ভাল হত। লোকটি রহস্যজনক।

—তা ঠিক।

—আচ্ছা ওঁকে নতুন সাধু বলা হত কেন?

—বহু বছর আগে ওখানে, মানে মন্দিরের চত্বরে এক সাধু বাস করতেন। লোকে তাঁকে ভয়-ভক্তি করত। কারণ উনি অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা করতে পারতেন। একটা আমের আঁটি থেকে আমগাছ বানাতে পারতেন, খালি থলে থেকে পায়রা বার করতে পারতেন, ভারি চমৎকার গাঁজা খেতে পারতেন। অমন দম নাকি কারু ছিল না। শেষে ভুবনচরারই এক গৃহস্থ ঘরের বৌকে নিয়ে তিনি উধাও হন। ফলে সাধুর প্রতি মানুষের ভক্তিশ্রদ্ধা সব কিছুদিনের জন্য লোপ পায়। এর পর দু-একজন সাধু আস্তানা গেড়ে বসার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সফল হননি তাঁরা।

—কেন?

—সে এক ব্যাপার! আগের সাধুও অত তাড়াতাড়ি পালাতেন যদি না...! এই বলে ডাক্তার আদিত্য খুব জোরে হাসলেন।

—কি হয়েছিল?

—এই গ্রামে এক জাদুকর এসেছিলেন ওপার বাংলা থেকে। আমাদের ওদিকে এটা খুব চলে। এপার থেকে কেউ ওপারে যায় গান-টান গায়, জলসা করে, কিছু টাকা নিয়ে এপারে চলে আসে, আবার ওপার থেকেও চলে আসে কেউ কেউ। তা বছর কয়েক আগে পুরানো সাধুর ব্যবসা যখন জমজমাট তখন মাদারিহাটের মাঠে সেই জাদুকর দেখালেন আমের আঁটি থেকে আম গাছ করা, খালি থলে থেকে পায়রা বার করা এই সব খেলা! লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে খেপে গেল সেই সাধুর উপর। এরই কয়েকদিন পর সেই সাধু নিরুদ্দেশ হলেন। অর্থাৎ জাদুকর একজন সাধুকে সত্যি সত্যি উড়িয়ে দিলেন, অদৃশ্য করে দিলেন। তবে নতুন সাধু প্রথম থেকেই এমন একটা চাল চাললেন যে লোকেরা মোহিত হয়ে গেল। একজন মরণাপন্ন রোগীকে তিনি সত্যি ছাই চিকিৎসা করে সারিয়ে তুললেন।

—ছাইকোলজিকাল ব্যাপার? কিটু বলল।

—তা ছাড়া কি? যাই হোক সেই থেকে তিনি গেড়ে বসলেন। ভারি আশ্চর্যের কথা, ছাই খাইয়ে আর মাখিয়ে তিনি সত্যি সত্যি বহু রোগীকে আরোগ্য করলেন। তাঁর ব্যবসা বেশ ফেঁপে উঠল।

কিটু বলবে কিনা ভাবল। ছাইকোলজিক্যাল চিকিৎসার গোপন রহস্য সে কি ডাক্তার আদিত্যকে বলবে? বললে অবশ্য তিনি খুশিই হবেন। অবশেষে সে বলেই ফেলল ব্যাপারটা।

ডাক্তার আদিত্য আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, কী বোকা আমি, কী বোকা আমি! এই সহজ কথাটা আমার মাথায় আসেনি কেন? এত সহজ কথা। এ ছাড়া হবেই বা কেন। কেবল প্ল্যাসিবো-তে কি টাইফয়েড সারে? আমি কঠিন রোগে ভুগছে এমন ম্যালেরিয়া রোগীর সঙ্গেও কথা বলে দেখেছি যারা ঐ ছাই খেয়েই সেরে উঠেছে। কেন আমি বুঝতে পারিনি। আমি ভেবেছি তাহলে এতদিন ধরে এই যে শাস্ত্র আমরা পড়লাম, প্র্যাকটিস করলাম, সারা দুনিয়ার উন্নত দেশের মহা মহা পণ্ডিতেরা যে সব ওষুধ আবিষ্কার করলেন, এগুলো ভুয়ো, মিথ্যা? 'সেরে যাব' এই বিশ্বাসেই রোগ সারে? আমার মন সত্যিই বিচলিত হয়েছিল কিটু। তুমি আমাকে সত্যি একটা উদ্বেগ থেকে বাঁচিয়েছ।

কিটু বলল, এই নতুন সাধু মাধবলালবাবুর কাছে যেতেন গোপনে, এটা জানেন কি?

ডাক্তার আদিত্য বললেন, এটা আমার না জানারই কথা। আমাকে কেউ বলেনিন। তবে হাবেভাবে অনুমান করেছি। এটাও অনুমান করেছি উনি কিছুদিন বোধহয় আমার ওষুধ না খেয়ে ঐ ছাই ডাক্তারের ওষুধও খেয়েছেন। আমি দুবার ওঁর টেবিলের উপর প্লেটে ছাইয়ের দাগ দেখেছি। আমার তখন তেমন কিছু মনে হয়নি। মনে হওয়া উচিত ছিল। ভেবেছিলাম অনেকে ছাই

দিয়ে দাঁত মাজেন, কিংবা উনি বোধহয় গোপনে সিগারেট টানেন, তার ছাই হবে। পরে মনে হয়েছে কথাটা. আর আমি জিজ্ঞেসও করব ভেবেছিলাম, কিন্তু করা হয়নি।

—উনি সিগারেট টানতেন?

—প্রচণ্ডভাবেই টানতেন। দিনে কমপক্ষে তিন প্যাকেট। আমি বলেছিলাম কমিয়ে এক প্যাকেট করতে, কিন্তু দেখলাম তিনি সম্পূর্ণই ছেড়ে দিয়েছেন।

—ভারি অদ্ভুত। কিটু বলল, অদ্ভুত মনে জোর ছিল তাঁর।

—সেটা ঠিক। ডাক্তার আদিত্য বললেন, কেবল একটা দুর্বলতাই তাঁর ছিল। তিনি চাইতেন যৌবন। যৌবন উপভোগ করার কথাও বলতেন, ওষুধ চাইতেন। আমি বলতাম, আচাজ্জিমশাই, কতকগুলো জিনিস হয় না, হবার নয়। আপনার যা বয়স এই বয়সে এমন একটা কিছু নিয়ে থাকুন যাতে মনটা বিক্ষিপ্ত হতে না পারে। তিনি আমার কথার প্রতিবাদ করতেন না। বলতেন চেষ্টা তো করছি—এমন একটা কাব্যকথা লিখব ভাবছি, মাঝে মাঝে লিখছিও, যা কিনা সমস্ত লোককে বিস্মিত এবং স্তম্ভিত করে দেবে। আমার ভুল হয়েছিল সারাটা জীবন নষ্ট করেছি, যে সময়টা আমি পার হয়ে এসেছি তাতে আমি বড় কবি হিসেবে বিখ্যাত হতে পারতাম। রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য পেতে পারতাম, সাংস্কৃতিক দুনিয়ায় একটা ছাপ রেখে যেতে পারতাম। সময় আমার ফুরিয়ে আসছে, তবু আমি চেষ্টা করছি কাব্যজগতে স্থায়ী আসন পাওয়ার জন্য।

কিটু বলল, উনি তাহলে কিছু লিখছিলেন? আপনাকে পড়িয়েছিলেন কিছু?

—না। ডাক্তার আদিত্য বললেন, তিনি আমাকে সম্ভবত সমঝদার বলে মনে করতেন না, সেটা ঠিকই। কাব্য ব্যাপারটাই আমার কাছে ভারি রহস্যময় বলে মনে হয়।

এর পর ডাক্তার আদিত্য বললেন, আগের কথায় ফিরে যাই। প্রশ্নটা হল মাধবলালবাবুর মৃত্যুতে কার বা কাদের লাভ হবে। এর উত্তর মোটামুটি জানা। এবারে দেখতে হবে কার পক্ষে বিষ প্রয়োগ করা সম্ভব। এখানে বাড়ির লোকের কথাই বেশি করে মনে হয়। অর্থাৎ ঐ রাত্রে ঐ বাড়িতে যাঁরা ছিলেন তাঁদেরই কেউ।

কিটু বলল, তাঁদের সঙ্গে আর একজনকে যোগ করতে হবে।

—কে তিনি?

কিটু বলল, নতুন সাধু। নতুন সাধু অর্থাৎ ছাইকোলজিকাল সাধু মাধবলালবাবুর কাছে গোপনে আসতেন। তিনি সেই রাত্রেও এসে থাকতে পারেন। এসে সায়ানাইড অব পটাসিয়ামের একটা পুরিয়া বা ক্যাপসুল খাইয়ে ওঁকে খতম করে আলমারি খুলে গয়নাপত্র ঘড়ি ইত্যাদি সব নিয়ে পিঠটান দিয়েছেন। ওঁর পক্ষে বাড়িতে ঢোকা সহজ। এমনও হতে পারে বারান্দার দিকের গ্রিলের দরজার তালার চাবি মাধবলালবাবু তাঁকে দিয়ে রেখেছিলেন। সেই চাবি দিয়ে

তালা খুলে তিনি ঘরে ঢুকতেন, সেদিনও ঢুকেছিলেন।

—হতে পারে। ডাক্তার আদিত্য বললেন, অসম্ভব নয়, কিন্তু কিটু একটা কথা মনে রাখতে হবে, ছাইকোলজিকাল সাধু মহাশয় তো আরও সহজে কর্মটা সমাধান করতে পারতেন। অত রাত্রে তাঁর আসার দরকারই ছিল না। তিনি অনেক সহজে বিষ দিয়েই কর্মটা করতে পারতেন। ঘুমের ওষুধের কয়েকটা বড়ি দিতে পারতেন। তা ছাড়া, সবচেয়ে বড় কথা, পাশের দুটি ঘর তার একটিতে রাধাময়ী থাকে, সে জেগে উঠে পড়বার ভয় ছিল, অন্য আর একটি ঘরে মিহির ছিল সেটা নতুন সাধুর জানবার কথা নয়।

কিটু বলল, ডাক্তার আদিত্য, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু ধরুন, এটাও তো হতে পারে, এবং এটা তো ঠিক বলেই মনে হয় নতুন সাধুর সঙ্গে নার্স রাধাময়ীর যোগসাজস ছিল আগে থেকেই। নতুন সাধু কেবল মাধবলালবাবুর চিকিৎসা করতে আসতেন, এমন তো নাও হতে পারে। ওঁর সঙ্গে রাধাময়ীর একটা সুসম্পর্ক হয় আগে ছিল, নয় তো পরে হয়েছিল। একই ঝড়ের রাত্রে, সেই বিখ্যাত খুনের রাত্রে দু-জনই উধাও হয়ে গেলেন এর একটা তাৎপর্য নেই? নিশ্চয়ই আছে।

বাঘাকাকা ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি বললেন, দুজনের জন্যেই দুপুরের খাদ্য প্রস্তুত।

—না। ডাক্তার আদিত্য বললেন।

—তাহলে কে করতে পারে না সেটা বলা যায় কি?

ডাক্তার আদিত্য হা-হা করে প্রাণখোলা হাসি হাসলেন। বললেন, বলেছ ভাল—চমৎকার! কে করতে পারে না সেটা বেরুলে কে করেছে সেটা বেরিয়ে আসবে, কেমন?

কিটু বলল, সে তো হতেই পারে।

ডাক্তার আদিত্য ঘড়ি দেখে বললেন, উঃ সর্বনাশ, আমাকে এখুনি বেরতে হবে।

কিটু বলল, খুব বেশি দেরি হবে না, সবসুদ্ধ বড় জোর আধঘণ্টা সময় লাগবে।

ডাক্তার আদিত্য আবার ঘড়ি দেখলেন। বললেন, ঠিক আছে—আধ ঘণ্টা আমি নিশ্চয়ই অপেক্ষা করব, কেননা আমার ভারি চমৎকার খিদে পেয়েছে। তারপর পুরনো কথার খেই ধরে বললেন, তোমার কথাটাই ঠিক বলে মনে হচ্ছে। উইল-ফুইলের ব্যাপার নয়। স্রেফ সোনা দানা চুরির ব্যাপার। কিন্তু গোল বাধাচ্ছে একটি ব্যাপার।

—কি সেটা?

—সায়ানাইড। এইটেই বড় সমস্যা সেটা তুমি বুঝতে পারছ। একটু আগেই বলেছি সাধু যদি ডাক্তার হন তাহলে বস্তুটি সংগ্রহ করা খুব কঠিন হলেও অসম্ভব নয়, কিন্তু তিনি এতটা বোকামি করবেন কিনা। কোনও অপরাধী হঠাৎ কিছু বোকামি করতেও পারে, করেও থাকে, কিন্তু এটা তো

হঠাৎ-এর ব্যাপার নয়। এর পেছনে রয়েছে বহুদিনের মতলব, বহুদিনের ষড়যন্ত্র। এই বোকামিটাই হচ্ছে হতবুদ্ধিকর।

খাওয়া-দাওয়ার পর ডাক্তার আদিত্য বললেন, তোমার রান্নার লোকটি বড় ভাল কিট্টুভাই। ভারি চমৎকার সব রান্না খেলাম।

কিট্টু বলল, উনি আমার ঠিক রান্নার লোক নন। উনি আমার সঙ্গী, পরামর্শদাতা, গুরু এবং অভিভাবক।

—কি রকম ?

—উনি আমার কাছে থাকেন, এই পর্যন্ত। উনি একটি পয়সা মাইনে নেন না। ওঁর নিজেরই অজস্র টাকা আছে। বাড়ির অনেক খরচই উনি নিজে বহন করেন। উনি অনেক বিষয়ে পণ্ডিত, এত স্মৃতিশক্তি কারও হয় বলে আমার জানা নেই। বহু তাঁর অভিজ্ঞতা। ক্রিমিনাল ওয়ার্লডে তাঁর বহু শাগরেদ, জেলও খেটেছেন একবার। উনি আছেন বলেই আমি কোনও গোয়েন্দাগিরির কাজ নিতে ভরসা পাই। এই ব্যাপারেও তিনি আমাকে সাহায্য করছেন। আমার বাবা-মা দু-জনেই বিদেশে থাকেন, সে জন্য তাঁরাও এমন অভিভাবকের কথা শুনে নিশ্চিন্ত থাকেন।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, উনি কি বলেন ?

কিট্টু বলল, তিনি কেবল শুনেই গেছেন। এখন পর্যন্ত কিছু বলেননি।

—তার মানে উনিও অন্ধকারে ?

কিট্টু ভাবল, এত কৌতূহল কেন ডাক্তার আদিত্যের ? তারপর ভাবল, কৌতূহল খুব অস্বাভাবিক নয়, হতেই পারে।

তবু কিট্টু সাবধান হল। যত কথা কিট্টু ডাক্তার আদিত্যকে বলেছে, তত কথা বলা কি উচিত হয়েছে ? কে জানে ? কিট্টু বলল, অন্ধকারে ঠিক নয়। এখন তিনি যা ভাবছেন, তা আমাকে বলেননি।

ডাক্তার আদিত্য যাওয়ার আগে বললেন, কিছুমাত্র ইতস্তত কোরো না। যখনই দরকার হবে, ভুবনচরায় চলে এসো। আমি সব রকম সাহায্যই করব। এমন কি যদি এ জন্য কিছু টাকাও দরকার হয়…।

কিট্টু বলল, না ডাক্তার আদিত্য, আমার টাকার দরকার নেই আপাতত। সুপ্রিয়া পিসিমা যা দিয়েছেন, তা-ই খরচ হয়নি।

ডাক্তার আদিত্য যাবার পর কিট্টু ভাবল সাহায্য করতে বড় বেশি আগ্রহ তো ওঁর। ভারি দুশ্চিন্তা হল তার।

১

পুলিশ ফের মিহিরকে ধরেনি এটা একটা বড় সান্ত্বনা। এর জন্য আফজলের ছোট্ট লেখাটিই বোধহয় দায়ী। আফজলের সেটাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা উদ্বেগজনকই হয়ে রইল। কিন্তু বাঘাকাকাকে প্রশ্ন করলে তিনি কেবলই রহস্যময় হাসি হাসেন। বলেন ঠিক পথেই সব চলেছে। এর মধ্যে মন্দিরের পেছন থেকে উদ্ধার করা সেই পুরনো ফেলে দেওয়া শার্টটি নিয়েও কম গবেষণা হয়নি। বাঘাকাকা ঐ শার্টটি নিয়ে কিসব পরীক্ষাটারিক্ষা করে তাঁর এক সহকারীকে পাঠিয়েছেন, কিন্তু কোথায় পাঠিয়েছেন তা বলেননি। অবশ্য পোস্টকার্ডে বিশ্বলালের যে ঠিকানাটা দেওয়া ছিল সেটা উদ্ধার করা যায়নি। আর এ এস নিশ্চয় মাদ্রাজের শেষ তিনটে অক্ষর। বিশ্বলাল মাদ্রাজে ছিল বলেই ওটা ধরা কঠিন হয়নি। তা নইলে বেনারস-এর শেষ তিনটে অক্ষরও হতে পারত। কিন্তু পুরো ঠিকানা পাওয়া যায়নি। বিশ্বলালের নামের পর মাদ্রাজ ৪১ লিখলে সে চিঠি তার কাছে পৌঁছত না। বাঘাকাকা বললেন, একবার মাদ্রাজ যাওয়া দরকার বিশ্বলালের খোঁজে। একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ কিটুবাবু হিসেবে মিলছে না একটা জিনিস ?

কিটুর অনেক হিসেবই মিলছিল না। মাত্র একটা জিনিসের হিসেব মিলছে না শুনে সে বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠল। বলল, কী হিসেব মিলছে না বাঘাকাকা ?

বাঘাকাকা বললেন, সব দিক দিয়ে দেখতে গেলে বিশ্বলালকেই মনে হয়। সায়ানাইড তাঁর পক্ষেই খাওয়ানো সম্ভব, কারু সন্দেহ উদ্রেক না করে সংগ্রহ করাও সম্ভব। তিনি থাকেন মাদ্রাজে, কেউ তাঁকে চেনে না, তিনি পশ্চিমবাংলায় একজনকে হত্যা করার জন্য সায়ানাইড সংগ্রহ করছেন এমন সন্দেহ হবে না।

—তাহলে মাদ্রাজ পুলিশের সাহায্য দরকার হতে পারে তাই না বাঘাকাকা ? কিটু প্রশ্ন করল, কিন্তু হিসেবটা মিলছে না কোথায় ?

—কিটুবাবু, তুমি দুদুটো প্রশ্ন করে ফেলেছ। প্রথম প্রশ্নটির উত্তর হ্যাঁ, তা তো হতেই পারে—কিন্তু এখনই নয়। মাদ্রাজ পুলিশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন তো হুট করে করা যাবে না। তুমি ওখানে গেলে পুলিশ পাত্তাই দেবে না। এখানকার সরকারি দফতর থেকে চিঠির দরকার হবে। যাক সেটা পরের কথা, কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর হল বিশ্বলালবাবু যদি খুন করেই থাকবেন তাহলে তিনি চুপচাপ রয়েছেন কেন ? এই তো তাঁর শুভাগমনের সময়। সম্পত্তি ভাগাভাগি, নগদ টাকা, ভল্ট খোলার ব্যাপার এসব তো তাঁর না জানার কথা নয়। অর্থাৎ সম্পত্তিই যদি হত্যার মোটিভ হয় এবং বিশ্বলালই যদি খুন করে থাকেন তাহলে স্বভাবতই এতদিনে তাঁর আগমন ঘটত।

—মাধবলালবাবুর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের টেলিগ্রামই তিনি পাননি। অতএব তাঁর আগমন ঘটেনি এটাই তো সরল এবং সহজ কথা। কিটু বলল।

—খুব সরল এবং সহজ? বাঘাকাকা ভাবলেন একটু। তারপর বললেন, কেউ যদি কোনও ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য ব্যবস্থা করে তাহলে তার ফলাফল জানবার জন্য তিনি উদগ্রীব হবেন না? তুমি তো পরীক্ষা দিয়েছ, পরীক্ষার ফলাফল জানবার জন্য তুমি উদ্বিগ্ন থাকোনি কিটুবাবু? ফলাফল প্রকাশ হওয়ার সময় যত দিন গেছে ফলাফল কখন বেরুতে পারে সেটা জানবার জন্য তুমি খবরের কাগজ তন্নতন্ন করে খোঁজনি?

কিটু বলল, বিশ্বলালবাবু মাদ্রাজে কলকাতার খবরের কাগজ পাবেন কোথায়? পেলেও এই খবর তো সব কাগজে বেরয়নি।

—না কিটুবাবু সেটা হয় না। বাঘাকাকা বললেন, তিনি নিশ্চিন্ত হতে চাইবেন। তিনি জানতে চাইবেন সেই মুহূর্তটা। অতটা না হলেও বিষ প্রদানকারী এমন কাউকে কাছাকাছি রাখবেন যাঁর কাছ থেকে তিনি সংবাদটি পেয়ে যাবেন ঠিক সময়ে। একটা টেলিগ্রাম, কিংবা একটা টেলিফোন কল, অথবা চিঠি। আর তারপরই তিনি তাঁর সাফল্যে আহ্লাদিত হয়ে শুভাগমন করবেন। কিন্তু তা ঘটেনি—আমার সেখানেই গোলমালটা ঠেকছে। হিসেবটা সেখানেই মিলছে না।

এমন সময় গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে আফজল এল। আফজলকে কিটু একটা আলাদা চাবিও দিয়ে দিয়েছিল। আফজল গাইছিল কোথা বাইরে দূরে যায়রে উড়ে হায়রে হায়।

বাঘাকাকা বললেন, ঠিক ঐ কথাই ভাবছিলাম, বাইরে দূরে। অর্থাৎ ব্যাপারটার কলকাঠি নাড়ানো হয়েছে দূর থেকেই। বাইরে থেকেই। ভেতরের লোক এমন কর্মটি করবেন না। তাই এই হিসেবটা মিলছে না।

—বাইরের লোকও তো অনেক। কিটু বলল, বিনতা দেবীর স্বামী অশ্বিনীবাবু দিল্লিকানাডা, এজেন্ট বিনতা দেবী, বিমানবাবু বারাসাত, এজেন্ট নার্স রাধাময়ী, ডাক্তার আদিত্য—এজেন্টের দরকার নেই, তিনি নিজেই ওষুধের শিশিতে বিষ রাখতে পারেন। নতুন সাধু যিনি পলাতক, এজেন্ট নার্স রাধাময়ী কিংবা তিনি নিজেই।

বাঘাকাকা একটু বাঁকা হাসি হাসলেন। বললেন, তবু একটা কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাচ্ছি সেটা হল বিষটা প্রয়োগ করা হল কখন, কেমন করে।

আফজল বলল, সেটা সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা ঠিকই। মিহির যে ওষুধ দিয়েছিল তাতে বিষ ছিল না। অতএব ধরে নিতে হচ্ছে বিষ প্রয়োগ করেছে বাড়িরই কেউ। সবচেয়ে বেশি সন্দেহ তাহলে পড়ে নার্স রাধাময়ীর উপরই, এবং সেক্ষেত্রে দু'জনের উপর সবচেয়ে বেশি নজর রাখতে হবে। প্রথমজন হলেন বিমানবাবু। ওঁরই পরিচিতা নার্স রাধাময়ী মাধবলালবাবুর বাড়িতে এতদিন ছিলেন, কিন্তু বিষ খাইয়েই তিনি প্রস্থান করলেন। উনি আগেই কর্মটি করতে পারতেন, এবং বিষ না খাইয়ে 'স্বাভাবিক' ভাবেই মৃত্যু ঘটাতে পারতেন—কিন্তু তিনি যে উদ্দেশ্যে ঐ বাড়িতে গিয়েছিলেন সেটি হল ম্যাক-এব কোম্পানির ঘড়ি। হয়তো সেটা তিনি সরাতে পারেননি। ঠিক যেদিন সরাতে পারলেন সে

দিনই তিনি পালানোর ব্যবস্থা করলেন। পালানোর পরিকল্পনার সঙ্গে রইলেন নতুন সাধু। হয়তো পালানোর তারিখ এবং সময়টা ঠিকই ছিল আগে থেকে, তাই সেই রাতে ঝড় হলেও পরিকল্পনা বাতিল করা সম্ভব হয়নি নার্স রাধা-ময়ীর। তা ছাড়া পালানোর পক্ষে ঝড়বৃষ্টির একটা অসুবিধে যেমন থাকে, তেমনি সুবিধেও অনেক। ঐ সময় রাত্রির অন্ধকারে অন্য কারু চোখের আড়ালে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার গেলেও কারু চোখে পড়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই। কেউ দেখে ফেললেও মুখ মাথা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখলে সেটা অস্বাভাবিকও মনে হয় না। অতএব ঝড়ের রাতটা দুষ্কর্ম করার পক্ষে খুব মন্দ বলা যায় না।

—অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত আসল মতলব যারই হোক, এজেন্ট হিসেবে নার্স রাধাময়ীকে কোনও হিসেবে থেকেই বাদ দেওয়া যাচ্ছে না। বলল কিট্টু।

—আপাতত সেটা ভেবে নিয়েই চলতে হবে। বাঘাকাকা বললেন, আফজল-বাবু কথাটা ঠিকই বলেছেন।

আফজল বলল, তাহলে আমাদের এখন কীভাবে এগোতে হবে ?

বাঘাকাকা বললেন, আমার মনে হয় যেভাবেই হোক, মাদ্রাজের ব্যাপারটা আগে জানতে হবে। আমাদের একবার মাদ্রাজ যেতে হবে। একটা সম্ভাবনা—সে যত সুদূর সম্ভাবনাই হোক না কেন একবার তার সমাধান করা উচিত। বিশ্বলালবাবু এখন কী করেছেন জানা দরকার।

—কিন্তু মাদ্রাজে গিয়েই বা কী লাভ। ওখানে গিয়ে ওঁর ঠিকানা পাওয়া না হয় গেল, কিন্তু সেখানে তো পাখি নেই। কিট্টু বলল, টেলিগ্রাম তো ফিরে এসেছে, ঠিকানায় উক্ত মানুষ বাসাত্যাগ করেছেন।

—প্রতিবেশীদের কাছে কিছু জানা যেতে পারে। বাঘাকাকা বললেন, অবশ্য ঠিকানাটা খুঁজে বার করতে পারলে তবেই।

—মাদ্রাজে যাওয়া থাকা এসবের খরচও খুব একটা মন্দ হবে না। কিট্টু বলল, অবশ্য সুপ্রিয়া পিসিকে বললে তিনি নিশ্চয়ই দেবেন।

—না কিট্টুবাবু একদম নয়। বাঘাকাকা বললেন, আমাদের এই বাইরে যাওয়ার কথা আর কাউকে বলার দরকার নেই। আমার অনেক টাকা বিনা কারণে ব্যাঙ্কে জমে যাচ্ছে। কিছু টাকা আমি সবসময়েই দিতে পারব।

কিট্টু একটু লজ্জিত হয়ে বলল, আমি ঠিক সেভাবে কথাটা বলিনি।

বাঘাকাকা বললেন, তোমরা এখন চা খাবে তো ?

—নিশ্চয় নিশ্চয় ! আফজল বলে উঠল। চায়ে আফজলের আপত্তি নেই।

বাঘাকাকা রান্নাঘরে যাওয়ার কয়েক মিনিট পর অকস্মাৎ আওয়াজ হল। কাপ ভাঙার আওয়াজ বলেই মনে হয়। কী ব্যাপার ? কিট্টু আর আফজল ছুটে গিয়ে দেখল রান্নাঘরের সামনে একটু হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বাঘা-কাকা। ওঁর এক হাতে একটা ট্রে ঝোলানো, আর সামনে কয়েকটা ভাঙা কাপ আর একটা টিপট ভেঙে ছত্রাকার হয়ে আছে।

—বাঘাকাকা তোমার কী হল ? কিট্টু উদ্বেগের সঙ্গে প্রশ্ন করল। বাঘা-

কাকার ঘোর তখনও কাটেনি। তিনি অস্পষ্টভাবে বললেন, আমি কী বোকা। ছাই ওষুধ !!

—কী হল ? আফজল প্রশ্ন করল, কাপ টাপ সব ভাঙলে কেন ?

বাঘাকাকা এবারে সামলে নিলেন। বললেন, তোমরা যাও আমি চা করে আনছি।

—কিন্তু কি হল হঠাৎ ? কিট্টু প্রশ্ন করল।

—না কিছু না তেমন। বাঘাকাকা ম্লান হাসলেন, ভাঙা কাপ সসারগুলো ঝাঁট দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

—ছাই ওষুধের কথা কি বলছিলে বাঘাকাকা ? আফজল প্রশ্ন করল।

—ও কিছু না। তোমরা যাও।

ঘরে ঢুকে আফজল বলল, বাঘাকাকা ভয় পেয়েছেন।

কিট্টু বলল, ভয় নয়। আমি দেখলাম তাঁর চোখে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি। ভয় পাওয়ার দৃষ্টি নয়। বরং মনে হল তিনি যেন অনেক গভীরভাবে কিছু ভাবতে ভাবতে দেখতে পেয়েছেন কিছু।

ঘরে ঢুকলেন বাঘাকাকা, নতুন করা ধূমায়িত চা ইত্যাদি নিয়ে। কিট্টু লক্ষ করল, বাঘাকাকার হাত দুটো থর থর করে কাঁপছে।

আফজলও সেটা লক্ষ করল, কিন্তু দুজনের কেউই আর কথা বলল না। বাঘাকাকা বললেন, আমি একটু চিন্তা করতে চাই এখন। ব্যাপার হয়েছে কি—আচ্ছা সেটা পরে বলব।

ওরা আর কিছু বলল না। ঘর থেকে বাঘাকাকা চলে গেলেন।

একটু পর কিট্টু বলল, ভারি অদ্ভুত লাগছে ব্যাপারটা। বাঘাকাকা এমন বিচলিত কখনও হন না। ঠাণ্ডা মাথার মানুষ, হঠাৎ তিনি এমন করলেন কেন ?

আফজল আস্তে আস্তে বলল, বয়স হচ্ছে তো, এখন একটু হাত-পা কাঁপতে পারে।

কিট্টু বলল, উঁহু—অন্য কিছু ব্যাপার আছে। আমি একটু দেখে আসি। কিট্টু একটু পরে বাঘাকাকার খোঁজে গিয়ে দেখল বাঘাকাকা একটা টেবিলের ধারে বসে আছেন দুটো হাত দিয়ে মাথা প্রায় ঢেকে। কিট্টু গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই বাঘাকাকা বললেন, ইস, কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

—কী মনে করতে পারছ না বাঘাকাকা ?

—১৩ জানুয়ারি সাপ্তাহিক কাগজে এটা মনে আছে, অথচ বছরটাই ভুলে যাচ্ছি। এটা ১৯৮৮ হতে পারে ১৯৮৯ হতে পারে এমনকি ১৯৮৭-ও হতে পারে।

—কোন কাগজ. আর ব্যাপারটাই বা কী ?

—তুমি দুটো প্রশ্ন করলে কিট্টুবাবু। বাঘাকাকা বললেন, কাগজটা হল শিলিগুড়ির সাপ্তাহিক। নবীন সূর্য, ইসুটা ছিল ১৩ জানুয়ারির। আর ব্যাপারটা ছিল এক সাধুর। যে সাধু রাত্রে কেবল দেখা দিতেন, যাঁর কাছে পালে পালে লোক যেত রোগ সারাতে। উনি ওষুধ দিতেন।

কিট্টু বলল, এরকম তো হামেশাই হচ্ছে আমাদের দেশে।

বাঘাকাকা বললেন, উনি ছাইয়ের পুরিয়া দিতেন রোগীদের। রোগীরা তাতেই সেরে যেত। ভারি নামডাক হয়েছিল তাঁর।

কিট্টু বলল, বুঝতে পেরেছি। তুমি ভাবছ…

—ঠিক ধরেছ কিট্টুবাবু! বাঘাকাকা বললেন, দুই ব্যক্তি একই বলে মনে হচ্ছে। আমার মনে পড়ছে ঐ কাগজে বেরিয়েছিল একদিন এই সাধু উধাও হয়ে যান, এবং সেই রাত্রেই একজন ধনী ব্যবসায়ীরও বাড়ি থেকে কয়েক লক্ষ টাকার জিনিসপত্র খোয়া যায়। ঐ সাধুর সঙ্গে ধনী ব্যবসায়ীর খুবই যোগাযোগ ছিল। এই সাধু বহু লোককে আরোগ্যও করতেন।

কিট্টু বলল, তোমার বিচলিত হবার কারণ কী বাঘাকাকা, এ তো ভাল কথা। একটা দারুণ ক্লু পাওয়া গেল। যদিও এতে কাজের কাজ কী হবে তা ঠিক বোঝা যাচেছ না এখনও।

বাঘাকাকা বললেন, কাজের কাজ কী হবে সেটা নিয়ে আমি বিচলিত হইনি কিট্টুবাবু। আমি বিচলিত হয়েছি আমার স্মৃতিশক্তি কমে গিয়েছে বলে। আরও ব্যাপার কি জানো, এই যে এতদিন ধরে নতুন সাধুর কথা বলছি, শুনছি, বিবেচনা করছি কিন্তু শিলিগুড়ির সাধুর কথা একবারও মনে পড়েনি। এটা ভাল লক্ষণ নয়। মোটেই ভাল লক্ষণ নয়। আজ হঠাৎ চা করবার পর কথাটা মনে পড়ে গেল, আরে—তাই তো, ভুবনচরার সাধু আর শিলিগুড়ির সাধুর মধ্যে একটা দারুণ মিল আছে তো! হঠাৎ আমার হাত কেঁপে গেল, আমি প্রায় হতবুদ্ধি কেবল যে হলাম তা নয়, আমার হাত-পা পর্যন্ত কাঁপতে লাগল, আমি কিছুতেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না।

—ঠিক আছে বাঘাকাকা ও নিয়ে তুমি বেশি ভেব টেব না। কিট্টু বলল।

বাঘাকাকা বললেন, আমার মনে আছে এরপর ঐ শিলিগুড়ির সাধু ধরাও পড়েছিলেন পুলিশের হাতে, তবে চোরাই সম্পত্তি উদ্ধারও করতে পারেনি পুলিশ। মনে হয় দু-মাসের জেলও হয়েছিল।

—তুমি নবীন সূর্য কোথায় পেয়েছিলে?

বাঘাকাকা বললেন, আমি এক ঠোঙা মুড়ি কিনেছিলাম ১৯৮৬-এর ফেব্রুয়ারিতে ডায়মণ্ডহারবারে, সেই ঠোঙা তৈরি হয়েছিল নবীন সূর্য দিয়ে। খবরটি ছিল শেষ পৃষ্ঠায়। আমি ঐ বছরই ওখানে গিয়েছিলাম মাছ ধরতে। আমার এক বন্ধু ওখানে থাকতেন, তাঁর বড় একটা পুকুরে প্রতি বছরই থাকত আমার মাছ ধরার আমন্ত্রণ। তারপর একটু ভেবে বললেন, তবে নবীন সূর্যর কপিটা ১৯৮৫-র হতে পারে। তার আগেরও হতে পারে।

কিট্টু বলল, বাঘাকাকা তোমার এত ভুল হয় না তো।

বাঘাকাকা বললেন, ঠোঙা তো, সে জন্য কাগজের একটা অংশ কাটা পড়েছিল, তাতে শিলিগুড়ি ১৩ জানুয়ারি লেখা ছিল, কিন্তু বছরের জায়গাটা কাটা পড়েছিল বলে বুঝতে পারছি না সেটা ১৯৮৬ সাল বা তার আগের যে কোনও সালের কাগজ হতে পারে। আমার মনে পড়ছে ঐ সঙ্গে আর একটা তথ্যও

সেখানে ছিল, যেটা সবচেয়ে জরুরি, তা হল পুলিশ তদন্ত করে জানতে পেরেছিল লোকটা ছিল সত্যিকারের ডাক্তার, সাধু সেজে সে লোকদের রোগ সারাত।

—ঐ ডাক্তার সাধুর নাম কি দেওয়া ছিল ?

—না। বাঘাকাকা বললেন, ওটা কাটা পড়েছিল ঠোঙা তৈরির সময়। কিন্তু কিটুবাবু এই কথাগুলো আমার তো আগেই মনে পড়া উচিত ছিল। সাধু ছাই খাইয়ে আর মাখিয়ে রোগী আরোগ্য করছে এটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তো আমার নবীন সূর্যর কথা মনে পড়া উচিত ছিল, তাই না ?

কিটু বলল, ও রকম তো হতেই পারে কখনও কখনও।

বাঘাকাকা বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর যেন ঐ প্রসঙ্গ আর তুলবেন না এমন ভঙ্গি করে বললেন, ভুবনচরার নতুন সাধু আর শিলিগুড়ির সাধু একই ব্যক্তি।

—ঐ ব্যক্তিটি কে ? কিটু প্রশ্ন করল।

বাঘাকাকা বললেন, ঐটেই তো হল সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

—ইতিমধ্যে আফজলও কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, বিশ্বলালবাবু কি হতে পারেন ?

—হতে পারত। বাঘাকাকা বললেন, হতে পারত। কিন্তু হিসেবে মিলছে না।

—কেন ?

বাঘাকাকা বললেন, বিশ্বলালবাবু কয়েক মাস আগে কয়েক দিনের জন্য ভুবনচরায় এসেছিলেন না ? যদি জানা যেত ঠিক ঐ সময়ে নতুন সাধু ভুবনচরায় ছিলেন না। ঐ কয়েকদিনের জন্য তাঁর দেখা পাওয়া যায়নি তাহলে হিসেবটা মিলে যেত। কিন্তু কেউ তো বলেনি যে সময়ে বিশ্বলালবাবু এসেছিলেন সে সময়ে ভুবনচরায় সাধুমশাই ছিলেন না।

আফজল বলল, একই লোক রাত্রে সাধু দিনে অসাধু হতে পারে। পারে না ?

কিটু বলল, সে আবার কি রকম ?

আফজল বলল, সেটা আবার বিশদ করে বলতে হবে নাকি ? ধরো তুমি ভুবনচরার নতুন সাধু। তুমি দিব্যি ওষুধে ছাই মিশিয়ে, কিংবা ছাইয়ে ওষুধ মিশিয়ে বেশ রোজগার করছ। এমন সময় হঠাৎ তোমার মনে হল তুমি নিজ মূর্তি ধরবে, অসুবিধে কি ? খুলে ফেললে নকল দাড়িটা, শার্ট আর প্যান্ট পরে নিলে, ত্রিশূলটার ফলাটা ব্যাগে পুরে নিয়ে লাঠিটাকে ফেলে দিলে। তারপর একজোড়া কালো চশমা পরে নিলে এবং ভোরবেলা মন্দির থেকে বেরিয়ে গেলে—হতে পারে না ?

—নকল দাড়ি ? বাঘাকাকা বললেন, সেটা একটা সমস্যার যেমন সমাধান তেমনি একটা সমস্যাও।

—কী রকম ? আফজল বলল।

—নকল দাড়ি পরাটা সাধু সাজার পক্ষে ভারি ভাল একটা উপায়। নকল দাড়ি পরলে সাধুকে ধরবে কে, বিশেষ করে রাত্রের আধা-আলো আধা-অন্ধকারে ?

কিন্তু এর মধ্যে বড় একটা সমস্যা হল দাড়ি তো কেবল বেড়েই চলে। এক বছরে আধ হাত দাড়ি যখন বেরোয় তখন সেটা কি আর নকল দাড়ি দিয়ে ঢাকা যায়? তখন নকল দাড়ি ফেলে আসল দাড়িতেও আবার কাজ চালানো যায় না, দু-রকম দাড়ি হয়ে যায়। এখানে দুটো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয়। নতুন সাধু ভুবনচরায় নিজস্ব দাড়ি নিয়েই এসেছিলেন, কিন্তু তিনি সেই দাড়িসমেতই বিদায় নিয়েছিলেন। কিন্তু যে সাধু অসাধু সে তা করবে না ধরা পড়ার ভয়ে। এতদিনের ক্রমবর্ধমান দাড়িকে সে বিসর্জন দিয়ে যাবে এটাই আশা করা যায়। আর তাহলে আফজলবাবু, আর একবার তোমাদের ঐ মন্দিরের পেছনটায় যেতে হয়। আমার মনে হয় ওখানে হয়তো পেয়ে যাবে নতুন সাধুর আসল দাড়ির কার্তিতাংশ, অথবা নকল দাড়ি, কেননা পলাতকের হেফাজতে নকল দাড়ি না পাওয়ারই সম্ভাবনা। তোমরা যখন মন্দিরের পেছন থেকে ওষুধের সব প্যাকেট, শিশি এ সব পেয়েছিলে, শার্ট পেয়েছিলে তখন দাড়ি পেয়েছিলে আসল কিংবা নকল? মনে হয় ওখানে খুঁজলে এখনও কিছু পেয়ে যেতে পারো, কেননা পলাতক হবার সময় তিনি যখন ওষুধও ফেলে দিয়েছেন তখন দাড়ি কি নিয়ে যাবেন, মনে হয় না। তা ছাড়া, মনে হয় তোমরা যে শার্টটিকে পেয়েছ সেটিও ওঁরই। কিন্তু কেবল শার্ট কেন, ওর সঙ্গে এক জোড়া ট্রাউজারও হয়ত পেতে যদি ভাল করে দেখতে।

কিট্টু বলল, এ সব তো আমি ভাবিনি আগে…।

বাঘাকাকা বললেন, আরও একটা কথা। সাধু এই গ্রামে যখন ডেরা বাঁধলেন তখন তিনি কি একা ছিলেন? তাঁর চেলা কিংবা চেলাগণের খোঁজ করা দরকার। এই সাধু যদি অসাধু হন তাহলে সঙ্গে শাগরেদ কেউ নিশ্চয় ছিল, যদিও সেই শাগরেদ বা শাগরেদবৃন্দ বড় অপরাধ দুটির সঙ্গে যুক্ত হয়তো ছিল না। আবার এটাও ঠিক যে বড় অপরাধ দুটি, অর্থাৎ চুরি এবং খুন। এই দুটোর জন্যই সাধুকে দায়ী করা যায় কিনা সেটাও দেখতে হবে। ঠিকই, একই রাত্রে একই জায়গায় দুটি অপরাধ ঘটেছে, তাতে একজন অপরাধীর কথাই মনে হবে, কিন্তু সেটা নাও তো হতে পারে।

কিট্টু বলল, ব্যাপারটা জটিল করে তুলছ, বাঘাকাকা?

—না কিট্টুবাবু! বাঘাকাকা বললেন, আমি সরল করতেই চেষ্টা করছি। তবে আমার অনুমান ভুল হতে পারে। দ্যাখো কিট্টুবাবু, সাধু যদি কেবল দামি দামি জিনিস চুরির জন্য ভুবনচরায় এসে ডেরা বেঁধে থাকেন তাহলে খুন করবেন কেন? নার্সের সাহায্যে কেবল একটা ঘুমের ছোট্ট ওষুধের ট্যাবলেট দিলেই যেখানে কাজ হয়? আর যদি খুন করাই উদ্দেশ্য থাকত, তাহলে জিনিসপত্র চুরি করবেন কেন?

আফজল বলল, টু-ইন-ওয়ান ওয়ান হতে পারে, অর্থাৎ এক ঢিলে দুই পাখি। যদি খুনই উদ্দেশ্য হয় তাহলে খুনি সেটাই কেবল করবে এমন সাধু এবং নির্লোভ খুনি এ দুনিয়ায় দুর্লভ। দ্যাখো ব্যাপারটা, মাধবলালবাবুর ঘরটি নানা দামি জিনিসে ঠাসা। খুন করে পালানোর সময় তিনি ছেড়ে দেবেন সব,

তিনি কি এমনই সাধু ? মনে হয় না।

বাঘাকাকা বললেন, জটটা তাহলে খোলা গেল না ? কিন্তু তবু একবার তো চেষ্টা করতে হয়। শিগগিরই একবার ভুবনচরায় যেতে হচ্ছে।

—কেন বাঘাকাকা ?

—মন্দিরের পেছনের অংশের ছবি তুলতে।

—কিন্তু সে তো কিট্টু তুলেছে, বেশ ভালই এসেছে ছবি। তারপরই বলল, বুঝতে পেরেছি তুমি চাও ঐ মন্দিরের পাশের জঞ্জালের স্তূপটা আর একবার আমরা ঘেঁটে দেখি।

—ঠিক কথা। বললেন বাঘাকাকা, নকল দাড়ি পেতে পারো, একটা শার্ট পাওয়া গেছে, হয়তো একজোড়া ট্রাউজারও পেতে পারো। আবার নাও পেতে পারো, কারণ সাধু যখন উড়লেন তখন ট্রাউজারই ওড়ার পক্ষে ভাল। আর চেষ্টা করবে তাদের চেলাদের খোঁজ করতে, কেননা, সাধু যখন, তখন চেলা না থেকেই যায় না। সর্বকর্ম করা আসল সাধুর পক্ষেও সম্ভব নয়। উনুন ধরানো, রান্না করা, খাওয়া-দাওয়া, বাসন মাজা, কাপড় পরিষ্কার করা এ-সবের জন্য চেলা নিশ্চয়ই ছিল। ওদের খোঁজ করা দরকার। এ ছাড়া একবার শিলি-গুড়িতে যেতে পারলেও হত।

—কেন ?

বাঘাকাকা বললেন, নবীন সূর্যের রিপোর্টটা একটু ভাল করে পড়া, ওখানকার লোকজনদের সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলা দরকার। আদালতে গিয়ে, যিনি ঐ মামলার বিচারক ছিলেন তাঁর কাছ থেকে জানবার চেষ্টা করা কিছু। সাধুর ব্যাপারটা ভাল করে জানা দরকার।

—তুমি শিলিগুড়ি যাবে বাঘাকাকা ?

বাঘাকাকা বললেন, সেটাতে আমার আপত্তি নেই। আমিই যাব ভাবছিলাম, ওখানে আমারও একজন চেনা লোক থাকেন, ডাক্তার। জেলের ডাক্তার।

—ডাক্তার ? আফজল বলল, আবার জেলের ডাক্তার।

ঠিক হল সেদিনই এসপ্লানেড থেকে শিলিগুড়ির বাসে বাঘাকাকা চলে যাবেন, আর পরদিন সকালে কিট্টু আর আফজল যাবে ভুবনচরায়। আসল উদ্দেশ্য সাধুর আস্তানা দেখা, জানালার ধারের জঞ্জাল পরীক্ষা করা, আর সুবিধে হলে চেলাদের খোঁজ করা।

পরদিন খুব সকালেই আফজল আর কিট্টু পৌঁছে গেল ভুবনচরায়। এবারে স্টেশন থেকে একটা রিকশ নিল। হাঁটবার ইচ্ছে আর নেই সেদিনকার অভিজ্ঞতার পর। তা ছাড়া আফজলের পায়ের সেই ব্যথাটা অনেক কমে গেলেও হঠাৎ বেকায়দায় টন টন করে ওঠে। কিন্তু রাস্তাটা এতই খারাপ যে রিকশয় বসে তাদের মনে হল হাঁটাই তাদের উচিত ছিল। কিট্টু রিকশওয়ালাকে বলল, এই রাস্তা মেরামত হয় না কেন ? রিকশ চালাতে কষ্ট হয় না ?

—কষ্ট হয় না আবার ? খুব কষ্ট হয়। আর রাস্তা মেরামত কেন হয় না

তা আর জিজ্ঞেস করবেন না বাবু, এই রাস্তা একমাস আগেই মেরামত হয়ে গেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত এ জন্য একত্রিশ হাজার টাকা খরচও করেছে।

—এর মধ্যে রাস্তাটা এমন খারাপ হয়ে গেল? কোথায় মেরামত হয়েছে দেখতে তো পাচ্ছি না কিছু।

রিকশওয়ালা বলল, দেখতে পাচ্ছেন না? তা রাস্তা যে সারানো হয়েছে তা রাস্তা দেখে বুঝবেন কেমন করে? আসল রাস্তা যেখানে সেখানে গেলেই দেখতে পাবেন।

—আসল রাস্তা? সেটা আবার কোথায়?

—আজ্ঞে সেটা পঞ্চায়েতের অফিসের খাতায়-পত্তরে। সেখানে দেখবেন এই রাস্তা এখন মেরামত হয়ে গেছে। পাকা রাস্তা হয়ে গেছে।

গ্রামে রিকশ ঢুকতেই ওরা ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নেমে পড়ল। মহেন্দ্র পালের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাঁর দোকানেই।

মহেন্দ্র পাল বিগলিত হেসে বললেন, আজ যে খুব সকাল-সকাল! জাল কি গোটানো হচ্ছে? ডাক্তার হালদারকে ধরতে পারলেন?

—ডাক্তার হালদার? ভারি চমকে গেল কিট্টু আর আফজল।

সেটা দেখে মহেন্দ্র পাল বেশ তারিফ করলেন বলে মনে হল।—এর মূল্যে ডাক্তার হালদার সেটা আমি প্রথমেই বলে দিয়েছিলাম আপনাদের। তা মনে হচ্ছে গরিবের কথা গ্রাহ্য করেননি।

কিট্টু বলল, কোথায় বলেছেন ডাক্তার হালদারের কথা। তাঁর নাম আমরা আগে শুনিইনি। আপনিও বলেননি, মনে করে দেখুন।

মহেন্দ্র পাল একটু থমকে গেলেন বলে মনে হল। তিনি বললেন, বলিনি বুঝি? নাম বলিনি সেটা হতে পারে, কিন্তু মনে হচ্ছে বলেছিলাম এই গ্রামেরই ডাক্তার মাধবলালবাবুকে খুন করেছেন!

আফজল বলল, এই গ্রামে তো ডাক্তার হালদার বলে কারু কথা শুনিনি। তাঁর চেম্বার কোথায়?

মহেন্দ্র পাল বললেন, চেম্বার? তারপর হা-হা করে খানিক হাসলেন। বললেন, ঐ যে পুরনো মন্দিরটা ওটাই তাঁর চেম্বার, বর্তমান চেম্বার। মানে তাঁর উধাও হওয়ার আগে পর্যন্ত উনি ওখানেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

—আপনি জানতেন সেটা?

মহেন্দ্র পাল বললেন, আমাব ভুল হয় না। উনি যখন সাধুর বেশে এখানে এসে বসলেন তখন একদিন ওঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। দেখেই চিনতে পারলাম। আরে আমার চোখকে ফাঁকি দেবে কে? ওঁর কপালে একটা কাটা দাগ ছিল, যেন একটা হাতুড়ির ছবি! তার উপর যতই চন্দন থাক আমি ঠিক ধরতে পেরেছিলাম, উনিই ডাঃ হালদার। আমার বাঁ পায়ে খুব ব্যথা হত। ডাক্তার আদিত্যর অনেক ওষুধ খেয়েছি, তাই ভাবলাম নতুন সাধুর ওষুধ একটু খেয়ে দেখি না! তারপর যখন বুঝলাম উনিই সেই হালদার ডাক্তার, যাঁকে অন্যায়-ভাবে, ভারি অন্যায়ভাবে এম-এল-এবাবু গ্রাম থেকে তাড়ালেন, ব্যাপার কি-না,

উনি নাকি ভুল ওষুধ দিয়ে তাঁর স্ত্রীকে মেরেছেন। যাই হোক আমি তো জানি ডাক্তার হালদার খারাপ কিছু কাজ করেননি, এম-এল-এ মশায়ের স্ত্রীকে উনি ভুল ওষুধ দেননি। তিনি পেনিসিলিন ইন্‌জেক্‌শন দেওয়ার আগে পরীক্ষা করে দেখেননি ওঁর অ্যালার্জি আছে কিনা। সেটা অসাবধানতা, ভুল ওষুধ দেওয়া বলে না তাকে। সেজন্য আমি তাঁকে চিনতে পেরেও না চিনবার ভান করেছি। আর আশ্চর্যের কথা কি জানেন, তিন সপ্তাহ ওঁর ছাই খেয়েই আমার পায়ের ব্যথা সেই যে সেরে গেল আর একবারও হয়নি। অথচ ঐ একই ব্যথার ব্যাপার নিয়ে আমি আদিত্য ডাক্তারের ওষুধ দু-বছর খেয়েও কোন উপকার হয়নি। যাই হোক, কিছুদিন পর একদিন আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলাম আমি ওঁকে চিনতে পেরেছি, তখন তিনি বললেন তিনি কোনও বদ কাজ তো করছেন না, একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে তিনি এই গ্রামে আরও কিছুদিন থাকতে চান, তা আমি ভাবলাম তা বেশ তো, একজন ভাল ডাক্তার যদি সাধু সেজে থাকেন আর তাতে যদি লোকের উপকার হয় তাতে আমি বাধা দেব কেন? তা ছাড়া এর ফলে আমারও সুবিধে হয়ে গেল বেশ।

—কি রকম?

—নানা অনুষ্ঠানে তিনি আমার দোকান থেকেই রসগোল্লা সন্দেশ ছানার জিলিপি এ-সব কিনতে শুরু করলেন। তিনি তাঁর ভক্তবৃন্দকেও আমার দোকানের বেলের মোরব্বা খাবার পরামর্শ দিতেন। ফলে আমারও লাভ হতে লাগল।

কিট্টু বলল, তা এখন যে বলছেন সব কথা?

মহেন্দ্র পাল বললেন, আমি হলাম গিয়ে সৎ মানুষ। সৎ নাগরিক। একজন লোক যদি ছাই খাইয়ে অসুস্থদের আরাম দিতে পারেন তাহলে আমি তা থেকে লোকেদের বঞ্চিত করব কেন? তা ছাড়া···। বলে গলার আওয়াজ আরও নামিয়ে এনে বললেন,···তা ছাড়া ঐ ডাক্তার আদিত্যের চাইতে তো উনি বড় ডাক্তার? ডাক্তার আদিত্য যে অসুখ সারাতে পারেন না, উনি তো সে সব অসুখ কত সারালেন, তা ঐ ছাই খাইয়েই হোক কিংবা মাখিয়েই হোক! উপকার হলেই সেটা ওষুধ, নইলে সেটা ওষুধ নয়।

—কিন্তু সাধু সৎ ছিলেন না মোটেই। চোর! বলল, আফজল।

মহেন্দ্র পাল বললেন, চোর আজ কে নয় বলুন। চোর বলে আমি ওঁকে দোষ দিই না। তবে তিনি চুরি করবেন বলে মনে হয় না আমার। ওঁর যে গুণ ছিল তাতে তাঁর অবশ্য চুরি করার দরকার ছিল না। হাজার হাজার টাকা রোজগার করা তাঁর পক্ষে কষ্টসাধ্যও ছিল না।

কিট্টুর মনে হল, এ চুরি তো সাধারণ টাকার জন্য চুরি নয়—এটা একটা বিশেষ ধরনের চুরি। এমনই একটা জিনিস, যা কিনা অতি বিরল, অতি পুরনো যার দাম হয় না। অমূল্য। সাধারণ চুরির ঘটনা এটা নয়, সাধারণ চোরও বলা যায় না এই চোরকে। তবে সাধারণ হোক অসাধারণ হোক, এ তো চুরিই।

কিট্টু কোনও কথা বলল না।

আফজল বলল, বলল, তবে আপনি আমাদের বলছেন কেন সাধুর কথা। আপনি যদি মনে করেন সাধু যে চুরি করেছে সেটা কোনও ব্যাপার নয়, চুরি আজ সকলেই করে—যদিও আপনার কথা আমি জানি না, সত্যিকারের সাধু আজকালও অনেকে আছেন। আপনি তবু তো চাইছেন সাধু ধরা পড়ুন।

—হ্যাঁ আমি চাই। নিশ্চয়ই! মহেন্দ্র পাল বললেন।

—কিন্তু কেন?

মহেন্দ্র পাল বললেন, কেন? কেন আমি বলছি। একজন চোর, আমি তাকে একশো বার ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু আমি একজন খুনেকে কোনও মতেই ছেড়ে দিতে পারি না। সে ছাড়া পায় এমন কথা আমি ভাবতেও পারি না। ডাক্তার হালদার কেবল চোর হলে আমার কিছু বলার ছিল না। কিন্তু তিনি খুনে। আমি চাই আপনারা তাঁকে ধরুন। ফাঁসিতে ঝোলান। আমি আপনাদের এক-মাস বিনা পয়সায় পেট ভরে মিষ্টি খাওয়াব!

কিট্টু আর আফজল এগিয়ে চলল ডাক্তার আদিত্যের বাড়ির দিকে। কিট্টু বলল, এক নতুন নাম পাওয়া গেল। যেমন-তেমন নাম নয়, ডাক্তারের নাম। ডাক্তার হালদার। এই ডাক্তার হালদারই চিকিৎসা করেছিলেন মাধবলাল আচার্যের স্ত্রীর। স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছিল—ফলে মাধবলাল আচার্য এই ডাক্তারকে গ্রামছাড়া করেন। সেই ডাক্তার হালদারই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এখানে আসেন। তিনি সাধু সাজেন। সাধু সেজে সুযোগ খুঁজতে থাকেন। সাধুর ছাইয়ের চিকিৎসার যশ ছড়িয়ে পড়ে। মাধবলাল আচার্যও সাধুর কথা শুনতে পান। আফজল, শুনছ ভাল করে?

আফজল বলল, চমৎকার হচ্ছে, গল্পের মতো তরতর করে এগিয়ে চলছে। তারপর?

কিট্টু বলল, তারপর মাধবলাল আচার্যের বাড়িতে কোনও এক শুভক্ষণে সাধু, অর্থাৎ নতুন সাধু, ঠিকভাবে বললে বলতে হয় অশুভক্ষণে ডাক্তার হালদার গিয়ে হাজির হন। মাধবলাল আচার্য অসুস্থ—তাঁর অসুখ সারাতে ব্যর্থ হচ্ছেন ডাক্তার আদিত্য, অন্য কোথাও গিয়ে অন্য কোনও ডাক্তারকে দেখাতে চান শরীরটা, কিন্তু সে কথা বলতে ইতস্তত করেন ডাক্তার আদিত্যকে। তিনি ডাক্তার আদিত্যের কাছে হৃত যৌবন ফেরানোর দাওয়াই চান, সঙ্গত কারণেই ডঃ আদিত্য তা নানা রকম কথায় ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। ওষুধ আর দেন না। মাধবলাল আচার্য মনে মনে চটে যান, কিন্তু এ কথা কাউকে বলতে পারেন না। বলার মতো কথাও নয়। কিন্তু লোকমুখে শুনে তাঁর মনে হয় নতুন সাধু তাঁকে দাওয়াই দিতে পারেন হয়তো। যদি নাও দেন দাওয়াই, তবু একবার চেষ্টা করতে বাধা কি? এইভাবে যোগাযোগ ঘটে যায় মাধবলালবাবুর সঙ্গে নতুন সাধুর। নতুন সাধু কেবল মানুষের মনস্তত্ত্বই জানেন তা নয় তিনি মাধবলাল-বাবুকেও চেনেন। তাঁর নারী সম্পর্কে অতিরিক্ত আগ্রহের কথা কানে আসে। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। তারপর কোনও এক সময়ে

তিনি আচার্য-বাড়িতে পদার্পণ করেন। বাড়িতে অনেক লোক, তারা কেউই সাধুর আগমন পছন্দ করেন না, অতএব তিনি এমনভাবে বারান্দার গ্রিল লাগালেন যে মনে হতে পারে বাইরের লোক যাতে না আসতে পারে তার পাকা বন্দোবস্ত করলেন, কিন্তু আসলে বাড়ির লোকের বাইরে যাওয়ার এবং বাইরের লোকের ভেতরে আসবার এই দু-রকম ব্যবস্থাই পাকা করা হল। তাদের চাবি যার কাছে থাকবে সে-ই নিঃশব্দে বাড়িতে ঢুকতে পারবে। চমৎকার বন্দোবস্ত। এমনকি বাঘা নামক ভিতু কুকুরটিও বুঝতে পারবে না। বাঘা যে দিকে থাকে সে দিকে বারান্দা নয়, অন্য দিকে। তা ছাড়া বাঘা এমনই অসাধারণ কুকুর যে কোনও আগন্তুক এলেও সে ডাকবে না। তার উপর বাঘা হচ্ছে নেশাখোর। সে রাম খায়। সাধু দু-একবার এসে হয়তো সেটাও জেনে গেছেন। অতএব কুকুরকেও শান্ত করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়।

কিটু একটু থেমে বলতে লাগল, ইতিমধ্যে নতুন সাধুর সঙ্গে নার্স রাধাময়ীর একটি সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। নার্স রাধাময়ীর ভবিষ্যৎ নেই। কোথাও সে বড় চাকরি পাবে না। মাধবলালবাবুর বাড়ি থেকে সে যা পায় তা খুব বেশি নয়, কিন্তু মাধবলালবাবুর মৃত্যুর পর তার এই আয় হওয়ারও উপায় নেই। নতুন সাধু, অর্থাৎ পুরনো হালদার ডাক্তারের পক্ষে এই নার্স মেয়েটিকে প্রলোভন দেখিয়ে প্রভাবিত করা মোটেই কঠিন হয়নি। কি এটুকু ঠিক বলেছি তো ?

আফজল বলল, ঠিক কথাই বলছ। কিটু বলল, এরপর সেই বিশেষ দিনটি এল। বিশেষ দিন, কিংবা বিশেষ রাত। আগে থেকেই রাতটা ঠিক করা ছিল, কিংবা এও হতে পারে ঝড় বৃষ্টি শুরু হলেই সাধু স্থির করেন সেটাই সেই রাত হোক। ডাক্তার হালদার—যাঁকে মাধবলালবাবু তাঁর খেয়ালখুশিমতো ভুবনচরা থেকে বিদায় করে দিয়েছিলেন বদনাম দিয়ে, সেই ডাক্তার হালদার প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি রাতের অন্ধকারে ঝড়ে বৃষ্টিতে গিয়ে পৌঁছুলেন সেই বাড়িতে। চেলাদের আগেই বিদায় করে দিয়েছিলেন। রাধাময়ী নির্দিষ্ট সময়ে দরজা খুলে দিলে হালদার ডাক্তার বা নতুন সাধু ভেতরে ঢুকলেন। ঠিক কি হয়েছিল তার হদিশ পাওয়া যেতে পারত পরদিন মাধবলালবাবুকে মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করার পর যদি বারান্দা এবং ঘরের পায়ের ছাপগুলি ঠিক ঠিক ধরে রাখা যেত। দুঃখের বিষয় পুলিশ সে-সব কিছু করেনি। যাই হোক, এরপর সাধু প্রথমেই দেখলেন মাধবলালবাবুর মৃত্যু হয়েছে—অথবা তিনি নিজেই মাধবলালবাবুকে সায়ানাইড অব পটাসিয়াম খাইয়ে দিলেন। তারপর আগে তৈরি করা চাবি দিয়ে আলমারি খুলে কালো প্যাঁচা, ম্যাক-এব ঘড়ি এবং অন্যান্য গয়না নিয়ে চম্পট দিলেন। খুব সম্ভব মেঝে খুঁড়ে ডাক্তার হালদার কালো প্যাঁচাকে পেয়ে যান।

আফজল বলল, মেঝে খোঁড়ার কথা আসছে কোত্থেকে ?

কিটু বলল, মনে নেই মিহিরের কথা। সে সেই রাত্রে মাটি খোঁড়ার আওয়াজ পেয়েছিল ?

আফজল অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়ল। বলল, সেটা কি সম্ভব যে কালো প্যাঁচা কোথায় পুঁতে রাখা হয়েছিল সেটি ডাক্তার হালদার জানতে পেরেছিলেন ?

কিট্টু বলল, সেটা একটা সমস্যা বটে। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে দামি জিনিসগুলি রাধাময়ী আগেই চুরি করে মেঝে খুঁড়ে সেখানে রেখে দিয়েছিল, পালানোর আগে খুঁড়ে বার করেছিল, তারই আওয়াজ মিহির পেয়েছিল ?

—এই যে, এই যে! একটি নারীকণ্ঠ শোনা গেল, তোমরা কোথায় চলেছ ? এত সকালেই।

রানিদির গলার আওয়াজ। উনি বাড়ির গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বোধহয় বাগানে কিছু কাজ করছিলেন। কিট্টু দেখল ঘড়িতে তখন আটটা বেজে কুড়ি মিনিট।

—আমরা আপনাদের বাড়িতেই যাচ্ছিলাম। কিট্টু বলল, ডাক্তারবাবু কোথায় ?

—রোগী দেখছেন। নটা পর্যন্ত রোগী দেখেন।

—ও হ্যাঁ তাই তো! বলল কিট্টু।

—ভেতরে এসো। বললেন রানিদি। তারপর দরজা খুলে দিলেন।

কিট্টু বলল, আগে ছবি তুলে আসি। সেদিন মন্দিরের ছবিটা ভাল করে তুলতে পারিনি। আমরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসব।

—এসো কিন্তু। এখানেই খাবে।

—নিশ্চয়।

মন্দিরের পেছনে তন্ন-তন্ন করে খুঁজল কিট্টু আর আফজল। কিছুই তেমন পাওয়া গেল না। শেষে তারা হতাশ হয়ে ফিরে আসবে মনে করছে এমন সময় গাছের একটা ভাঙা ডাল দিয়ে কিছু ওষুধের শিশি আর ফয়েল নাড়তেই দাড়ির দেখা পাওয়া গেল। সাদায় কালোয় মেশানো দাড়ি। আশেপাশের শিশি বোতলের সঙ্গে এমন মিলে মিশে ছিল যে চট করে চোখে পড়েনি।

আফজল বলল, বাঘাকাকা সত্যিই একজন আশ্চর্য মানুষ। তাঁর অনুমানই সঠিক হল। এখন একজোড়া ট্রাউজার পাওয়া দরকার। তারা অনেক খুঁজল, কিন্তু কিছু ভাঙা পুরনো ব্লেড ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না। ব্লেডগুলোর কয়েকটি মরচে পড়ে প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে, আর কয়েকটি ঠিক আছে।

—অর্থাৎ নতুন সাধু নিয়মিত দাড়ি কামাতেন। আফজল বলল।

কিট্টু বলল, উপায় কি ? নিজস্ব দাড়ি গোঁফের উপর পরের দাড়ি ঠিক খোপে টিকত না।

আফজল বলল, এবার চেলার সন্ধান করা দরকার।

কিট্টু মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বাঘাকাকার অনুমান মিলে গেছে। তার উপর নতুন সাধুই যে আসলে পুরনো ডাক্তার এই তথ্যটি আবিষ্কারও তার মনে হল বিরাট একটা কৃতিত্বের ব্যাপার।

জাল তাহলে ক্রমশ গুটিয়ে আসছে ?

কিট্টু এবারে তার ক্যামেরা বার করল। জঞ্জালের একটা ছবি তুলল জানালা-সমেত। তারপর একটা ছবি তুলল শিশি বোতল আর ফয়েলের। বলল, জাল সাধুকে জালে ফেলারই চেষ্টা করতে হবে।

—নমস্কার।

চমকে গেল তারা। দেখতে পেল মাধবলালবাবুর তাস খেলার সঙ্গী অক্ষয়বাবু।

—এই রে সেরেছে! কিট্টু শঙ্কিত হল। কিন্তু বলল, নমস্কার। কেমন আছেন?

—ভাল। অক্ষয়বাবু বললেন, তা ঐ নোংরা ঘাটছেন কেন?

কিট্টু বলল, এই এদিকে একটু এসেছিলাম, ভাঙা মন্দিরের ছবি তুলতে।

—তা বেশ, তা বেশ! অক্ষয়বাবু বললেন, কিন্তু ছবি তো তুলছেন নোংরার।

এর কোনও উপযুক্ত জবাব খুঁজতে গিয়ে কিট্টু হঠাৎ বুঝতে পারল এর জবাব হয় না। সে কেবল ঢোক গিলল। কিন্তু অক্ষয়বাবু নিজেই উদ্ধার করলেন বিপদ থেকে। তিনি বললেন, শুনুন—কাল রাত্রে কী অদ্ভুত একটা ব্যাপার হয়েছিল। যা কখনও হতে পারে হয়তো, কিন্তু হয় না, এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেছে, হ্যাঁ মশাই, আমারই বাড়িতে। আশ্চর্য ব্যাপার।

কিট্টু আর আফজল উৎসাহিত হয়ে উঠল।

অক্ষয়বাবু বললেন, বললে বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, কাল আমি ব্রিজ খেলায় কি হাত পেয়েছিলাম জানেন?

এরপর হাসলেন, যতখানি বড় হাসিমুখ করা যায় ততখানি হাসিমুখ করে বললেন, আমার ছিল তেরোখানা ইস্কাপন! বুঝুন একশো কোটিবার ডিল করলে নাকি এক হাতে এক রঙের তেরোটি তাস পাওয়া যায়। আমার বাড়ি এই কাছেই, আসুন না, পুরো খেলাটা কি রকম হয়েছিল একবার দেখিয়ে দিতাম। না মশাই ব্যাডলাক, আমি সেভেন স্পেডস ডাকার পর অপোনেণ্টরা সেভেন নো-ট্রামপস্ ডেকে খেলে গো হারা হারিয়ে দিল, উঃ মশাই আমি নিষ্ফল রাগে হাত কামড়েছি কেবল। চলুন না এই তো কাছেই বাড়ি।

আফজল বলল, আচ্ছা মশাই বলতে পারেন এই পলাতক সাধুর চেলা কজন ছিল?

অক্ষয়বাবু বললেন, দু-জন ছিল। তারা ঐ ঝড়ের রাতে সাধুর সঙ্গেই উধাও হয়েছে। দুটি কম বয়সের ছেলে। ঠিক ঝড়ের রাতে নয়, সকাল থেকেই।

—কী রকম বয়স হবে?

অক্ষয়বাবু বললেন, তা বেশি নয়, চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে।

—নাম জানেন তাদের?

অক্ষয়বাবু বললেন, নাঃ ওদের নামে আমার দরকার কি। কেন কি হয়েছে?

—না কিছু হয়নি তেমন। কিট্টু বলল, আজ আমাদের একটু তাড়া আছে কিনা, তাই চলে যাচ্ছি—পরে কখনও আপনার বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছে রইল।

একটু পর অক্ষয়বাবু দৃষ্টির আড়াল হতেই আফজল বলল, কম বয়স বলতে অক্ষয়বাবু বোঝেন চাল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ!

কিট্টু বলল, ব্যাপারটা কিছু নয়। আপেক্ষিক তত্ত্ব জানা থাকলে বিষয়টি আশ্চর্যের মোটেই নয়!

আফজল বলল, কিন্তু ওরা কারা?

কিট্টু বলল, ওরা হল গিয়ে চেলা, শাগরেদ, সঙ্গী, কর্মী, বা মাইনের চাকর। ওরা সাধারণ অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয় অভাবের জন্য, পেটের দায়ে। কিন্তু বড় অপরাধের সঙ্গে তারা যুক্ত হয় না সচরাচর। আমি পড়েছি।

—ওরা সাধু তাই তুমি বলতে চাও?

কিট্টু একটু হেসে বলল, সাধু-সঙ্গে যতটুকু সাধু হওয়া যায় তারা ততখানিই সাধু।

—ওরা বড় অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয় না কেন?

—হয় না কথাটা আমি ভুল বলেছি। কিট্টু বলল, আসলে ওরা জানেই না ওরা বড় অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। ওদের ভূমিকা হচ্ছে প্রস্তুতির।

—কী রকম?

—ব্যাপারটা হল এই, যে বড় অপরাধের মতলব করে সে জানে সে কি করতে যাচ্ছে, কিন্তু তার শাগরেদরা সর্বদা তা নাও জানতে পারে।

—কী রকম?

—একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ধরো কেউ গোপনে বোমা বানাচ্ছে। সে জানে সেই বোমা অহিংসভাবে ব্যবহার হবার সম্ভাবনা নেই। হয়ত তা ব্যবহার হবে নরহত্যাতেই, ডাকাতিতে। কিন্তু সে স্পষ্ট কিছু জানে না। তার কাজ সে সব জানা নয়, তার কাজ বোমা বানানো। তার উদ্দেশ্য কিছু পয়সা রোজগার করা—সে বোমা দিয়ে কে কি করবে তার তাতে কিছু আসে যায় না। ডাক্তার হালদারের শাগরেদরা জানত ডাক্তার হালদার সাধু সেজে ছাই খাইয়ে বা মাখিয়ে অন্যায় করছেন, লোকের বিশ্বাসের উপর তিনি ব্যবসা করছেন, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তারা কেমন করে জানবে ওঁর আসল মতলব মাধবলালবাবুর বাড়ি থেকে দামি জিনিস সরানো? তাই নির্দিষ্ট দিনে ডাক্তার হালদার তাদের বিদায় করে দেন। অর্থাৎ বেচারারা বেকার হয়ে পড়ে। ওদের ধরলেও বিশেষ লাভ হবে বলে মনে হয় না। আর ধরবেই বা কে বা কেমন করে? দেখলেই তো পুলিশের কাজকর্ম। বিনা প্রমাণে মিহিরকে ধরল, ঘরে বাইরের কেউ হাতের বা পায়ের ছাপ রেখে গেছে কি না সেটা পর্যন্ত দেখল না।

তাদের ফিরতে একটু দেরিই হয়ে গেল। ডাক্তার আদিত্য বললেন, কি গোয়েন্দা এবং সাংবাদিক, খবর কি? কিছু সূত্র পেলে?

আফজল কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কিট্টু তাতে বাধা দিয়ে বলল, কিছু না কিছু না!

ডাক্তার আদিত্য হেসে বললেন, অর্থাৎ তোমরা যা জানতে পেরেছ তা আমাকে বলবে না, এই তো? তা না বললে যদি তোমাদের সুবিধে হয় তো

বোলো না।

কিটু একটু লজ্জিত হয়ে বলল, তেমন কিছু জানা যায়নি। একটু একটু করে কিছু জানা যাচ্ছে, আবার গুলিয়ে যাচ্ছে। আগে যেটা ঠিক বলে মনে হচ্ছে, পরে দেখা যাচ্ছে সেটা ঠিক নয়।

—তা মন্দিরে কিছু প্রমাণ-ট্রমাণ পাওয়া গেল?

—নাঃ, কিটু বলল, কিচ্ছু না।

—মন্দিরটা ভারি সুন্দর ছিল এককালে! ডাক্তার আদিত্য বললেন।

—পুরনো মন্দিরে ছবি তোলা আমার একটা শখ। কিটু বলল। তারপর এ-কথা সে-কথার পর খুব নিরীহভাবে কিটু প্রশ্ন করল, আচ্ছা ডাক্তার আদিত্য, আপনি তো এই অঞ্চলে পনেরো বছর ধরে ডাক্তারি করছেন, এ অঞ্চলের লোকেরা কেমন?

—অন্য গ্রামের লোকের মতোই। ডাক্তার আদিত্য বললেন, বিজ্ঞান থেকে এঁরা শত হস্তেন! এদের মধ্যে আছে চোর, চোরা-চালানকারী, কৃষক, চাকুরে, বেকার, দু-একজন আবার ডাকাতিও করে। বেশির ভাগই অবশ্য সরল, বোকা-সোকা।

কিটু বলল, তবু তো আপনার খুবই প্রসার। বিজ্ঞান বিশ্বাস না করেও…।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, বিজ্ঞান বিশ্বাস করে না এরা, কিন্তু জানে অসুখ হলে ওষুধ খেতে হয়। এক-এক রকম অসুখে এক এক রকম ওষুধ চাই, সে জন্যই তারা আমার কাছে আসে—বিজ্ঞান-ফিজ্ঞান কিছু নয়। উপকার পায় বলেই আসে।

—যেমন তারা আসত ডাক্তার হালদারের ছাই খেতে! হঠাৎ কথাটা কিটু বলে ফেলল। আর তক্ষুনি তার মনে হল এই কথাটা বোধহয় এভাবে না বলাই উচিত ছিল।

ডাক্তার আদিত্য কিন্তু চমকালেন না। কিটু ভেবেছিল কথাটা শুনে বিচলিত হবেন ডাক্তার আদিত্য। সে সব কিছু হলেন না। বললেন, তা হলে তোমরা এটা ধরতে পেরেছ যে নতুন সাধুই সেই পুরনো ডাক্তার?

কিটু চুপ করে রইল।

আফজল বলল, আপনি জানতেন না?

ডাক্তার আদিত্য বললেন, একেবারেই না। তারপর বললেন, কথাটা অবশ্য পুরো ঠিক নয়। আগে জানতাম না, কিন্তু এখন তা বলতে পারি না। আমি কালই জানতে পেরেছি। আমারই এক বয়স্ক রোগী আমার কাছে আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সম্প্রতি তিনি এসে বলেছেন তাঁর এখন মনে হচ্ছে নতুন সাধু হলেন পুরনো ডাক্তার। তিনি ডাক্তার হালদার। যখন এখানে প্র্যাকটিস করতে শুরু করেন তখন থেকেই রোগী হিসেবে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ডাক্তারের কপালে কাটা দাগ, যেন একটা কালো রঙের ছোট ইঞ্চি দুয়েকের হাতুড়ি কেটে বসানো, অবশ্য ঘন চন্দনের প্রলেপে অনেক সময়েই সেটা ঢাকা পড়ত। কিন্তু তাঁর কথা বলার ধরন, হাব-ভাব এ সব তিনি ধরে ফেলেছিলেন দাড়ি গোঁফ

সত্ত্বেও। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি, কিন্তু পরে মনে হল এ তো হতেই পারে। অসম্ভব কেন হবে।

কিট্টু এ কথার কোনও উত্তর দিল না।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, এই সাধুকে ধরলেই রহস্যের সমাধান হবে। আমার নামও বাঁচবে। মনে রেখো তোমার উপর আমি দিয়েছি সত্য সন্ধানের ভার। তুমি যদি মনে করো আমি চালাকি করে তোমাদের এই ভার দিয়েছি তা হলে আমার প্রতি অবিচার করা হবে। আমি সত্যই চাই সত্য উদঘাটিত হোক।

কিট্টু ডাক্তার আদিত্যের গলায় পেল আন্তরিকতার সুর। সে বলল, এই পলাতক ডাক্তারকে খুঁজে বার করতেই হবে। তারপর বলল, আপনার কাছে সেই উইলটার কপি আছে?

ডাক্তার আদিত্য বিরস কণ্ঠে বললেন, আছে বৈকি। কিন্তু যে উইল রেজিস্ট্রি করা হয়েছে সে উইল নয়। পরবর্তী উইল। অর্থাৎ যে উইল অনুযায়ী তাঁর সম্পত্তির বন্দোবস্ত করা হবে।

—সেটা কি আলাদা উইল? কিট্টু প্রশ্ন করল।

—আলাদা উইল তো বটেই! ডাক্তার আদিত্য বললেন, নইলে আর বদলাবেন কেন? একটা কপি খামে বন্ধ করে আমার জন্য রেখে গিয়েছেন তাঁর সেফটি ভল্টে। সেটিতে আগের উইলের সব কথাই আছে, কেবল আমার ক্ষেত্রে একটু আলাদা করে লেখা আছে, তাঁর ভাষায় মোটামুটি বলছি—বলতে কষ্টই হচ্ছে, মানে ওঁর দান গ্রহণ করা আমার পক্ষে বোধহয় সম্ভবই হবে না।

—কী রকম? আফজল প্রশ্ন করল।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, বিচ্ছিরি রকম। তিনি উইলে লিখেছেন যদি ডাক্তার আদিত্য আমার মৃত্যুর দিন থেকে দু-বছর মদ্যপান বন্ধ রাখতে পারেন তবেই আমার নগদ টাকার অর্ধাংশ পাবেন, নইলে ঐ অর্ধাংশ কলকাতার উক্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠান পাবে।

ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল কিট্টু আর আফজলের। সে ভাব গোপন করে আফজল বলল, সেফটি ভল্টে কী ছিল?

—সেও এক অদ্ভুত ব্যাপার। বললেন ডাক্তার আদিত্য, গোটা দশেক গিনি, কয়েকটা জড়োয়া গয়না—চুড়ি, আঙটি, কম্পানির শেয়ার, ফিক্সড ডিপোজিটের দলিল, এইসব। তা সে তো অভিনববাবু আর বিমানবাবু নেবার জন্য তোড়জোড় করছেন। আদালতে আবেদন করেছেন, ওগুলো নগদ নয় বলে তাঁরা দাবি করছেন। গয়না অবশ্য নগদ নয়, কিন্তু গিনি তো নগদ। তা ছাড়া শেয়ার, কম্পানির ফিক্সড ডিপোজিট এগুলোও তো নগদই বলতে গেলে।

তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, নগদ হলেও আমার কী এসে যায় বলো। বুড়ো এমনই এক শর্ত লিখে গেছেন যে ওঁর টাকা দিয়ে শেষ পর্যন্ত মায়ের নামের হাসপাতাল করা সম্ভব হবে না। বুড়ো মহা···মহা···মানে, ইয়ে ছিলেন।

—কিন্তু হঠাৎ আপনার সম্বন্ধে এমন কথা লিখলেন কেন উইলে? আফজল প্রশ্ন করল।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, প্রথমে ঠিক বুঝতে পারিনি, কিন্তু আমার মনে হয় এখন যেন একটু একটু বুঝতে পারছি।

—কী বুঝতে পারছেন?

—বুঝতে পারছি ঐ ডাক্তার হালদার তাঁকে বুঝিয়েছেন কিছু। নকল সাধু হলেও ওঁর কিছু তুকতাক হয়তো জানা ছিল। ডাক্তার হালদারের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল মাধবলালবাবুর উপর প্রতিশোধ নেওয়া, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল কালো প্যাঁচা, ম্যাক-এব ঘড়ি, গয়না ইত্যাদি হাতিয়ে নেওয়া। এখন মনে হচ্ছে তৃতীয় উদ্দেশ্য ছিল আমার সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক বিষিয়ে দেওয়া।

—কিন্তু আপনার সঙ্গে ডাক্তার হালদারের শত্রুতা তো ছিল না, আপনার সঙ্গে মাধবলালবাবুর সম্পর্ক বিষিয়ে দেবেন কেন?

ডাক্তার আদিত্য বললেন, সহজ কারণ একটাই। ডাক্তার হালদার এই গ্রাম থেকে তাড়িত হবার পর আমি এসে ডাক্তারি করি সেটা ওঁর বোধহয় রাগের কারণ। তা ছাড়া আমি মদ টানি, অতএব আমি ভাল চিকিৎসক নই, এমন একটা ধারণাও হয়তো তিনি করিয়ে দিয়েছিলেন।

হঠাৎ কিট্টু প্রশ্ন করল, আচ্ছা ডাক্তার আদিত্য, আপনার কাছে যে প্যাকেট আছে, সেটি কি খুলেছেন?

—ও সেই প্যাকেট? না খুলিনি এখনও। ওটা সিল করা প্যাকেট। যখন তখন খুললেই হবে।

—অপেক্ষা করছেন কেন?

—ভয় করছে খুলতে।

—ভয়? আফজল বলল, ভয় করছে কেন?

—ভয় করছে এই ভেবে যে ওটা খুলে যা পাব তা তো আবার ভাগ করে দিতে হবে। অনেক চিন্তা-ভাবনার দরকার সময়ের দরকার। তা-ছাড়া ওটা আমি অভিনববাবু, বিমানবাবু এবং বিনতার সামনেই খুলতে চাই। অমূল্য সম্পদ আমি ওদেরও দিতে চাই। আর বিশ্বলালকেও বঞ্চিত করতে চাই না, সে মাধবলালবাবু যতই তাঁকে অপছন্দ করুন না কেন। ভেবে দ্যাখো বিশ্বলাল এমন কিছু অপরাধ করেনি। সে প্রেম করে বিয়ে করেছে, এই তার অপরাধ। সে সার্কাসের মেয়েকে বিয়ে করেছে, এটা তার আর এক অপরাধ। যাই হোক আমি অপেক্ষা করছি, আশা করছি বিশ্বলাল ফিরে আসবে শিগগিরই। সে এলে এই প্যাকেটটি আমি খুলব। কি, ঠিক সিদ্ধান্ত নিইনি?

—ঠিক করেছেন। কিট্টু বলল।

—আমি মনে করছি ঐ প্যাকেটের যা সম্পদ তার একটা বড় অংশ বিশ্বলালকে দেব।

—আচ্ছা ওর মধ্যে কালো প্যাঁচা নেই তো? আফজল প্রশ্ন করল।

—অ্যাঁ? ডাক্তার আদিত্য একটু চমকে উঠলেন। বললেন, সেটা তো

ভাবিনি। তবে কালো প্যাঁচার যা ওজন আর আকার শুনেছি, তাতে সেটা বেশি ভারী এবং বড়ই হবে, চ্যাপটা প্যাকেটে কালো প্যাঁচা থাকবে বলে মনে হয় না।

—ম্যাক-এর ঘড়ি ?

—না। সেটা থাকবে না। ডাঃ আদিত্য দৃঢ়কণ্ঠে বললেন।

—কি করে অত নিশ্চিন্ত ভাবে বলছেন ? কিটু প্রশ্ন করল।

—সেটা আমি নিজে ওঁর কাছে দেখেছি যে! আর তাও এই প্যাকেট পাওয়ার পর। অতএব নিশ্চিতভাবে বলা যায়। একটা সাধারণ ঘড়ি, সোনার অবশ্য, তার যে এত দাম হতে পারে ভাবা যায় না। যারা ব্যাপারটা জানে না তারা ভাববে এই পুরনো ঘড়ির জন্য দু'পাঁচশো টাকার বেশি কেউ দাম দেবে না।

—কিন্তু যারা জানে তাদের কাছে এর দাম পাঁচ লাখ টাকা হবে ? কিটু প্রশ্ন করল।

—অনেক, অনেক বেশি। ডাক্তার আদিত্য বললেন, পুরনো ঘড়ি, ক্যামেরা, অস্ত্র, বই, পুরনো ফাউন্টেন পেন এসবের সংগ্রাহক সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে এই পৃথিবীতে। কলকাতাতে এই ঘড়ির একটা বড় ব্যবসা আছে। মাঝে মাঝেই দেখবে কাগজে পুরনো রোলেক্স, ওমেগা, লন্‌জাইন ঘড়ির জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় বহু হাজার টাকা খরচ করে। কালকের কাগজে দেখলাম সোনার পুরনো ম্যাক-এর ঘড়ির জন্য পনেরো লাখ টাকার উপর দেওয়া হতে পারে! একথা শুনে কিটু আর আফজল অবাক হল খুবই।

—পনেরো লাখ টাকা! কিটু বলল, তারপর মাথা চুলকে কি ভেবে বলল, পুরনো ঘড়ি, দামি ঘড়ি শুনতাম, লাখ লাখ টাকা দামে কিছু ঘড়ি বিক্রিও হয় তাও শুনেছি! কিন্তু সত্যি সত্যি কেউ বিজ্ঞাপন দিয়েছে সেটা দেখিনি।

—কেন বিজ্ঞাপন তো প্রায়ই বেরোয় কাগজে! ডাক্তার আদিত্য বললেন।

—কোন্ কাগজে ? আফজল প্রশ্ন করল।

—গণপ্রভাতেই! এই তো এখানেই রয়েছে কাগজটা দেখে নিতে পারো।

আফজল একটু লজ্জা পেল। যাই হোক সে দেখল কাগজে বেশ বড় করেই দেওয়া হয়েছে। আফজল হিসাব করে দেখল এর জন্য বিজ্ঞাপনদাতাকে অন্তত পনেরো হাজার টাকা খরচ করতে হয়েছে। পি রিচার্ডসন নামের এক সাহেব আগামী সপ্তাহ, অর্থাৎ ডিসেম্বরের ষোল এবং সতেরো তারিখে সকাল দশটা থেকে সন্ধে ছটা পর্যন্ত ইস্টার্ন হোটেলের ১২১২ নম্বর কামরায় থাকবেন। যাঁরা ঘড়ি বিক্রি করতে চান তাঁরা সরাসরি সাক্ষাৎ করতে পারেন। নগদ টাকার লেনদেন করা হয়। গত শতাব্দীতে তৈরি অন্য যে কোনও ঘড়ি বা জড়োয়া গয়না আনলে তাও কেনার জন্য বিবেচনা করা হবে।

আফজল বলল, মানুষের মধ্যে কত রকম পাগলামি যে থাকে!

কিটু বলল, ঐ পাগলামি থাকে বলেই ফেলে দেওয়া জিনিসের কত দাম দেয় মানুষ। একটু দুষ্প্রাপ্য হলেই হল। যেমন ডাকটিকিট। ডাকটিকিট হল গিয়ে ডাক মাশুল দেবার প্রমাণ। কিন্তু তা থেকে জানা যায় কত দেশের নাম। এখন কত দেশের নাম বদলে গেছে, কত দেশের সীমাও বদলে গেছে, কিন্তু তার

দাম কিছু আছে, পুরনো হলেও তা থেকে কিছু একটা পাওয়া যায়, কিন্তু সে জন্য লাখ লাখ টাকা দিয়ে সে তথ্য জানার তো দরকার নেই। ওর একটা ছবি তুললেই তো যা জানার জানা যায়। আবার সাধারণ ডাকটিকিটের একরকম দাম, ভুল ছাপা ডাকটিকিটের দাম আবার হাজার গুণ বেশি। ঘড়িটায় অবশ্য সোনা আছে খানিক। যাই হোক পাগলামি থাক না থাক এটা ব্যবসা। সমস্ত পৃথিবী খুঁজে দেখ কত রকম পাগলামি নিয়ে ব্যবসা করা হয়!

কথাবার্তা বলার সময় দরজায় ঘণ্টা বাজল, আর সেই রিকশায় ছুঁচোচাপা পড়ার মতো আওয়াজ হল। ডাক্তার আদিত্য ঘরের বাইরে গেলেন, তারপরই ফিরে এসে বললেন একটা সুখবর আছে। পুলিশ এই ব্যাপারে আর তদন্ত করবে না। পুলিশ মনে করে ব্যাপারটার সঙ্গে বাইরের বা বাড়ির কেউ জড়িত নয়, এটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র, অতএব পুলিশ তোমাদের বাধা দেবে না।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, কালই বিকেলে পুলিশ কিছু জিনিস বাড়িতে ফেরত দিয়েছে।

কিটু বলল, কিছু জিনিস?

ডাক্তার আদিত্য বললেন, অদরকারি কিছু জিনিস যা তারা সেদিন নিয়ে গিয়েছিল—যেমন মাধবলালবাবুর খাটের পাশে রাখা প্রায় খালি জলের গেলাস, প্লেট, ওষুধের আলমারি থেকে নেওয়া ওষুধগুলো। ওষুধের শিশি, যা থেকে পাওয়া গিয়েছিল মিহিরের হাতের ছাপ।

কিটু বলল, তাহলে আর কি। মামলা তো শেষ। মিহিরের বিরুদ্ধে মামলা করবে না পুলিশ। কারু বিরুদ্ধেই মামলা করবে না পুলিশ। তাহলে আর খেটে মরা কেন। আর সত্যি কথা বলতে কি ডাক্তার আদিত্য, আমি প্রথম থেকেই, এমনকি এই ভুবনচরার ঘটনার আগে থেকেই বুঝতে পারছিলাম এই লাইনে আসা আমার ঠিক হয়নি। মিহির যেমন একটা পলাতক আদর্শের পেছনে ছুটছে, তাতে সে নানাভাবে পর্যুদস্ত হচ্ছে কিন্তু তবু সে হাল ছাড়ছে না, সে তার খেয়াল বা বুদ্ধি অনুযায়ী এগিয়ে চলেছে, আমি তা পারছি না। আমার মনে কেমন একটা অবসাদ এসে গেছে। এ থেকে মুক্ত হলে ইযেন আমি বাঁচি।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, তুমি ভুলে যাচ্ছ কিটু, ব্যাপারটা তো কেবল তোমাকে নিয়ে নয়। তুমি সত্য অনুসন্ধানের মাঝখানে হঠাৎ বলতে পার না আমি আর যাব না, আমার এখন ফেরা দরকার। আর কে খুন করেছে সেটা জেনেই বা কি হবে, এটাই তো তুমি ভাবছ?

কিটু বলল, ঠিক তাই।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, কিন্তু তোমার ভাই মিহির, তার কথা ভেবেছ? আমার কথা না হয় বাদই দিলাম—সত্যটা প্রকাশ পেলে আমরা দুজনেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারতাম।

কিটু বলল, আসল ব্যাপার হচ্ছে কি জানেন ডাক্তার আদিত্য, এই রহস্যের ব্যাপারে কোথাও কিছু আলো দেখতে পাচ্ছি না। যেদিকে যাচ্ছি যেন মনে হচ্ছে

এটাই ঠিক পথ, সঙ্গে সঙ্গে সে পথটা যেন আর দেখতে পাচ্ছি না। আলো দেখার পরই যেন পাওয়ার কাট্ হয়ে যাচ্ছে। আসল গোলমালটা বাধছে—এতগুলো সন্দেহভাজন ব্যক্তির কাকে সন্দেহ করব না? প্রত্যেককেই সন্দেহ হচ্ছে। আর যাকে খুনি বলে স্পষ্ট মনে হচ্ছে, অর্থাৎ সেই পলাতক সাধু, তাঁকে কোথায় পাব কেমন করেই বা ধরব? কোনও উপায় নেই। এ ব্যাপারে আমাকে অনেকেই সাহায্য করছে, প্রত্যেকে আন্তরিক ভাবেই আমাকে সাহায্য করছে—বাঘাকাকা, আফজল, আপনি, মাধবলালবাবুর বাড়ির লোকও বোধহয় আমাকে সাহায্যই করবেন, কিন্তু তাতেও কিছু হচ্ছে না। আমার হাতে পুলিশ নেই, হাজার হাজার টাকা খরচ হয়তো করতে পারি, সুপ্রিয়া পিসিকে বললে তার অভাব হবে না, আমার নিজেরও টাকা আছে কিছু, বাঘাকাকাও এ ব্যাপারে ভারী উদার। কিন্তু টাকা এবং সময় নষ্ট করে শেষ পর্যন্ত কোথাও পৌঁছোনোর আশা থাকলে তবে তো মনটায় জোর পাই। বাঘাকাকা গেছেন শিলিগুড়িতে। বুঝতে পারছি উনিও কোথাও ঠেকে গেছেন। শিলিগুড়িতে গিয়ে তিনি কি কিছু পাবেন? কোনও সূত্র? জানি না। মনটা ভারি খারি খারাপ হয়ে যাচ্ছে ডাক্তার আদিত্য। অনেক দিন হয়ে গেল।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, তুমি আশা ছেড়ো না। সময় লাগে লাগুক। তুমি চালিয়ে যাও। মিহির এবং আমার কথা ভেবেও অন্তত তুমি চেষ্টা কর। সত্য উদ্ঘাটিত হোক। এর জন্য যা খরচ লাগে সে জন্য তুমি বিন্দুমাত্র চিন্তা কোরো না। আমার নিজের স্বার্থেই তোমাকে আমি যা খরচ লাগে তার অনেকটাই দিতে পারব। অতএব চিয়ার আপ।

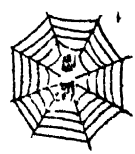
কিট্টু অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়ল। বলল, চারিদিকে অন্ধকার দেখতে পাচ্ছি।

ঠিক সেই সময় পাখা ঘুরতে ঘুরতে বন্ধ হয়ে গেল।

রানিদি বললেন, লোডশেডিং! ডিজেলও প্রায় শেষ হয়ে গেল। সন্ধেবেলাটা আজ আর আলো জ্বালানো যাবে না।

কিট্টু বলল, এখন তো সবে দুপুর—একটু পরেই বিদ্যুৎ এসে যাবে।

রানিদি বললেন, এ তোমার কলকাতার বিদ্যুৎ নয়। এখানে একবার পাওয়ার কাট হলে সেটা চলে অন্তত চার ঘণ্টা। কখনও কখনও আটদশ ঘণ্টাও বিদ্যুৎ বন্ধ থাকে।



১১

দুপুরে খাওয়াদাওয়া করে কিটু আর আফজল কলকাতায় ফিরে এল। আফজল তার অফিসে চলে গেল, কিটু গেল তার বাড়িতে। থলে থেকে বার করল মন্দিরের পেছনের জঞ্জাল থেকে সংগৃহীত কিছু কিছু টুকরো ওষুধের ফয়েল, শিশি, সদ্যভাঙা আয়নার একটা কি দুটো টুকরো, মরচে ধরা ব্লেড, দাড়ি কামানোর সাবানের প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া টিউব।

ফিরে এল ফাঁকা বাড়িতেই। সামনে সুরসাথীর ইস্ত্রির দোকান। সুরসাথী জানাল মিহিরবাবু দুবার এসে ফিরে গেছেন।

বাঘাকাকা এখনও ফেরেননি। শিলিগুড়ি গেছেন তিনি। কবে ফিরবেন কখন ফিরবেন সেটা বলে যাননি। কিটু বেশ বিমর্ষ হয়ে পড়ল। নিজে নিজে রান্না করা সম্ভব নয়। সে সুপ্রিয়া পিসির বাড়িতে ফোন করল। ওর নিজের ফোন ঠিক আছে, কিন্তু কয়েকবার চেষ্টা করেও সে সুপ্রিয়া পিসির ফোনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারল না।

সে ক্লান্ত হয়ে একটা কোলাজাতীয় পানীয় নিয়ে তাড়াতাড়ি শেষ করে ধপ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কিটুর যখন ঘুম ভাঙল তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। ডিসেম্বর মাসে, অনেক তাড়াতাড়িই অন্ধকার হয়ে যায়। সে আশা করছিল মিহির বোধহয় আসবে, তা হলে একসঙ্গে দুজন মিলে বাইয়ে কোথাও খেয়ে নেবে। পাড়ায় এক গলির মধ্যে একটা চিনে খাবারের দোকান বানিয়েছে কয়েকজন উৎসাহী যুবক, সেখানেও তার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আলস্যে আর হয়ে ওঠেনি। ঠিক এই সময় সে যখন ভাবছে, বেরুবে কি বেরুবে না, এমন সময় হঠাৎই ঘণ্টা বাজল। সে দরজা খুলেই দেখল মিহির। মিহির বলল, কিট্‌দা তোমাকে আমি দু-বার খুঁজেছি, কতবার যে ফোন করেছি তার ঠিক নেই। ফোন কি ঠিক নেই?

কিটু বলল, ফোন ঠিক আছে, আমিই বাড়িতে ছিলাম না। বাঘাকাকাও নেই, উনি গেছেন শিলিগুড়িতে।

মিহির বলল, কেন?

কিটু বলল, তোর ব্যাপারেই একটা ক্লু হয়তো পেতে পারেন উনি।

মিহির বলল, তোমার শরীর কেমন শুকনো-শুকনো লাগছে। কী রকম যেন ফুর্তি নেই বলে মনে হচ্ছে।

কিটু বলল, ঠিক বলেছিস। বড়ই ক্লান্ত লাগছে।

মিহির বলল, একটা কথা বলব কিট্‌দা, তোমরা এত কষ্ট করছ কেন? মানে মাধবলাল আচার্যকে কে মেরেছে জানবার দরকারটা কী? পুলিশ তো বলেছে এর সঙ্গে কোনও ব্যক্তি জড়িত নেই। এটা দুর্ঘটনা।

কিটু বলল, কিন্তু তা তো ঠিক নয়। কেউ না কেউ ওঁকে তো খুনই করেছে? আর প্রথমে তো তোকেই সন্দেহ করেছে পুলিশ। ব্যাপার যাই হোক

না কেন, কিন্তু আসল আসামি ধরা না পড়লে লোকে তো তোকেই সন্দেহ করবে ? এই জন্যই আমরা লেগে আছি।

মিহির বলল, কিন্তু কিট্‌দা, আমি ভেবে দেখলাম এই ব্যাপারে একটু সন্দেহ থাকা ভাল। তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি না, কিন্তু এই তো মাস দুয়েক হয়ে গেল এরই মধ্যে আমার জনপ্রিয়তা দারুণ বেড়েছে। আমার যে বই দু বছর হল একুশ কপিও বিক্রি হয়নি, মানে একটা বইমেলা মিস করেছি, নইলে একত্রিশ বত্রিশ কপি ঠিকই বিক্রি হত, সেই বই এই দু মাসে কেটেছে আড়াইশো কপি! আরও কিছু বিক্রি হত কিন্তু বাঁধাইখানায় শ্রমিক-গোলমাল চলছে বলে ভারী অসুবিধে হচ্ছে।

কিট্টু অবাক হয়ে বলল, তোর বই লোকে পয়সা দিয়ে কিনছে ? এরপর বলতে যাচ্ছিল—ওতে আছেটা কী ? কিন্তু মিহির এখন মুডে আছে, এখন হঠাৎ বাজে কথা বললে ও এটাকে রসিকতা বলে নাও মনে করতে পারে।

মিহির বলল, ব্যাপারটা কী জানো কিট্‌দা, আমার কবিতা ফবিতার জন্য কেউ কেনে না। মানে আমার একটা ইমেজ তৈরি হচ্ছে কিনা। একটু বোহে-মিয়ান, একটু ছন্নছাড়া ভাব, একটু আলটু-পালটু কথা, একটু বড় বড় কবিদের শ্রাদ্ধ করা, একটু নেশা করা, আর যে-সব কথা লোকে সাধারণত ভাবে না এমন সব কথা বসিয়ে দেওয়া, যা আমি পর্যন্ত বুঝি না। এমন চমৎকার সব বাক্য লোকেরা শুনলে স্তম্ভিত হয়। তা এ তো অনেকেই করে, কিন্তু আমার কী হয়েছে জানো কিট্‌দা, আমার সম্বন্ধে তরুণ কবিদের দারুণ শ্রদ্ধা বেড়েছে, আমি একজন বুড়ো ভদ্রলোককে বিষ খাইয়ে খুন করেছি এটা ভেবে নিয়েই। এ নাকি বৃদ্ধদের বিরুদ্ধে তরুণের সংগ্রাম। তা ছাড়া আধুনিকদের মধ্যে আমিই নাকি একমাত্র কবি যে দু-বার হাজতে গেছি। তবে আমার বিরোধী পক্ষও আছে সব. তারা বলছে, বিষ খাইয়ে খুন তো করে কাপুরুষরা, ও যদি ছোরা মেরে খুন করতো কিংবা আছাড় দিয়ে, অথবা ছাত থেকে ফেলে খুন করত, তবে না হতো সত্যিকারের কাজ! যাই হোক. আমি ভারী পপুলার হচ্ছি—সেটা আমি বুঝতে পারছি। আমার কয়েকজন ভক্ত জুটেছে, তারা আমাকে গুরু বলে ডাকে। কয়েকটি মেয়ে পর্যন্ত—ভেবে দ্যাখো, কলেজ ইউনিভার্সিটির মেয়ে পর্যন্ত আমাকে সব আন্তরিক আবেগের চিঠি লিখছে। এ কি আমার কবিতার জন্য ? কিছুটা তাই, কিন্তু সবটা নয়। এই সময় যদি তোমরা আসল খুনিকে বার করো খুঁজে, তা হলে আমার অবস্থা কী হবে ভেবেছ ? এক মুহূর্তে সিংহাসন না হোক মোটামুটি নেকড়ে-আসনে তো বসিয়েছে ওরা, যেমনি ওরা দেখবে আমার খুন করার ব্যাপারটা ভুয়ো তখন আমাকে ওরা ছেড়ে চলে যাবে। অতএব কিট্‌দা, আমি বলি কী, আর কষ্ট কেন ? ছেড়ে দাও।

কিট্টু স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে বলল, আচ্ছা মিহির, এই যে ব্যাপারটা, এটা তোর সত্যিই ভাল লাগছে ?

মিহির বলল, প্রথমে ভাল লাগেনি সে তো তুমি জানো। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে হোয়াট দি হেল্‌। এতে যদি আমি উপরে যেতে পারি, তাতে অসুবিধে

কী ? মানে আমার দায়িত্ব কোথায় ? অতএব কিট্‌দা এবার ক্ষান্ত দাও, মজাটা দেখা যাক্‌ না। জানো কিট্‌দা, একজন বড় প্রকাশক আমার কবিতার বই প্রকাশ করার জন্য ফোন করেছে। তা ছাড়া বনগাঁয়ের কাছে একটা সংস্থা আমাকে বছরের শ্রেষ্ঠ কবি বলে হাজার টাকার একটা পুরস্কার দেবে বলেছে এ মাসের শেষে। এর মধ্যে হঠাৎ যদি প্রকাশ হয়ে যায় আমি খুন করিনি তা হলে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটবে।

কিট্টু বলল, ব্যাপারটা বলে তা হলে ভালই করলি। আমি নিজেই ভাবছিলাম ভুবনচরার ব্যাপার নিয়ে আর মাথা-টাথা ঘামাব না। ভারী একটা অন্ধকারের শক্ত দেওয়াল আমাকে যেন বাধা দিচ্ছিল। কিন্তু তোর যে ইমেজ হচ্ছে এটা কি ভাল হচ্ছে ? এর ফলে তোর সাময়িক কিছুটা সুবিধে হচ্ছে হয়তো, তা কেটে যাবে না তো ? দু-দিন পর তোকে নিয়ে এই হুজুগ যা চলছে তা থাকবে তো ?

মিহির বলল, বলা শক্ত। মংলু বলে মিহিরদা তুমি গুরু, তোমার তুলনা নেই, পেঁচো তো আমার ক্রীতদাস বলা যায়। কিট্টুর মনে পড়ল ওদের কথা, কিন্তু ওরা কে তা জানত না, এখন ধরে নিল তরুণ কবিদেরই দুজন হবে। কিট্টু ভাবল, এরকম সফল ব্যক্তিকে আর কিছুতেই সাধারণ পথে ফেরানো যাবে না।

কিট্টু বলল, ঠিক আছে, আর ওসব সত্যানুসন্ধান করা নয় কিন্তু ডাক্তার আদিত্য মনে করছেন খুনের সঙ্গে তাঁর নামও তো জড়িয়ে গেছে। সত্য খুঁজে বার করলে উনি নিজেও অনেকটা স্বস্তি পাবেন।

মিহির বলল, ডাক্তারদের কাছে সেটা আবার একটা বদনাম নাকি ? যে ডাক্তারের চিকিৎসায় যত রোগী মরে সে ডাক্তারের ততই নাম যশ।

—মৃত্যু আর খুন দুটো আলাদা ব্যাপার মিহির। কিট্টু বলল।

—দুটোর মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্যই। বলে মিহির হাসল।

কিট্টু বলল, চল্‌ মিহির, পাড়ার গলির চিনে দোকানটায় গিয়ে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক্‌। তোর খিদে পেয়েছে ?

মিহির বলল, ভাল কথা মনে পড়িয়ে দিলে। মা তোমাকে খাওয়ার জন্যই ডেকেছে সন্ধেবেলা।

কিট্টু বলল, উপলক্ষটা কী ?

মিহির বলল, উপলক্ষ আবার কি, কিচ্ছু না। মা তোমাকে খাইয়ে তৃপ্তি পায়। কী যেন একটা নতুন রান্না শিখেছে মা, তোমার উপর দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট হবে বোধহয়।

কিট্টু বলল, তাতে আমি রাজি।

কিট্টু দেখল, সুপ্রিয়া পিসির মধ্যে যে অস্থিরতা আর উদ্বেগ ছিল সেটা আর নেই। পুলিশ যে মিহিরের বিরুদ্ধে মামলা করবে না সেটা জেনে তিনি ভারী খুশি হয়েছেন। কিট্টু যেতেই সুপ্রিয়া পিসি বললেন, আয় রে কিট্টু, আমি খালি ভাবছি তোর মতো একটি ভাল ছেলে কী করে এত কাজ থাকতে গোয়েন্দাগিরি করার দিকে ঝুঁকল। যাক এ কথা শুনে তোর খারাপ লাগবে, কোনও

দিনই আমাকে তুই পাত্তা দিসনি, আজও দিবি না, ভবিষ্যতেও আমি বলে বলে মুখ ব্যথা করে ফেলব কিন্তু তোকে বদলাতে পারব না। কাউকেই বদলাতে আমি পারিনি। মিহিরের কথাই ধর—ছোট থেকেই ওকে পই পই করে কত বারণ করেছি কুসঙ্গে মিশিস না, কিন্তু হলটা কী? আমার একটা কথা শুনেছে কখনও! একজনের দুশো কবি বন্ধু হয়, কখনও শুনেছিস? তার উপর আজকাল আবার দু চার জন মেয়ে বন্ধুও বাড়িতে আসছে, আহা তাদের কী চেহারা—কয়েকজনের চুল তো তিন ইঞ্চির বেশি কিছুতেই নয়, আর যা সাজপোশাক, দেখলে তো গা গুলিয়ে ওঠে।

কিটু বলল, আমিও ভাবছি সুপ্রিয়া পিসি, আমি গোয়েন্দাগিরি আর করব না। ভাবছি আফজলকে বলব ওর কাগজে যদি কিছু কাজটাজ খালি থাকে তা হলে তাই করব।

সুপ্রিয়া পিসি বললেন, শুনেছিস মিহির, শুনেছিস? কিটুর মতো ভাল ছেলে আর হয় না। আমি বললাম গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দে, আর সে এক কথায় রাজি! আর তুই? তোকে কিছু বলাই বৃথা।

মিহির বলল, বলা যদি বৃথা হয় তা হলে বলো কেন?

—শুনলি কিটু, শুনলি? সুপ্রিয়া পিসি বললেন, কবি হবি হ। চুপচাপ কবি হয়ে থাক, কাক পক্ষীতেও যাতে টের না পায়, তা নয় তো ঢাক ঢোল বাজিয়ে মদ গাঁজা চরস সব টেনে, হিরোইন খেয়ে বেলেল্লাপনা করে না বেড়ালেই নয়?

কিটু বলল, ওটার নাম হিরোইন নয়, হেরোইন।

সুপ্রিয়া পিসি বললেন, তফাতটা কি শুনি? দুটোই সাংঘাতিকভাবে মানুষকে বেহুঁশ করে দেয়। বল তুই, দেয় না?

কিটুকে স্বীকার করতেই হল তা দেয়।

নতুন রান্না খেয়ে তারিফ করতে করতে রাত এগারোটার সময় বাড়িতে এসে দেখল বাঘাকাকা এসে গেছেন। বাঘাকাকার মুখ গম্ভীর। বাঘাকাকা বললেন, কিছু লাভ হল না শিলিগুড়ি গিয়ে। নবীন সূর্যের পাত্তা নেই। একটা না দুটো ইসু বেরিয়ে ছিল মাত্র, ১৯৮৬ সালে, তারপর বন্ধ হয়ে যায়। যিনি সম্পাদক ছিলেন তিনি আসামের এক চা বাগানে গুদাম ঘরের স্টক ক্লার্ক হয়ে চলে গেছেন। আমার চেনা ডাক্তারকেও পেলাম না, তিনি অল ইন্ডিয়া সার্ভিসের লোক, এখন দিল্লিতে পোস্টেড। আদালতে গিয়ে পুরনো রেকর্ড থেকে কিছু পাব ভেবেছিলাম, কিন্তু প্রায় বাইশ পৃষ্ঠা পড়েও ঠিক ব্যাপারটা বোঝা গেল না। মনে হল ডাক্তার হালদারকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। তিনি ডাক্তারি করতেই গিয়েছিলেন কিন্তু যে বাড়িতে ডাক্তারি করতে গিয়েছিলেন সে বাড়িরই কোনও একজন গয়না ইত্যাদি সরিয়ে কৌশলে ওঁকে মিথ্যে চুরির দায়ে ফেলে দেন। আরও একটা কথা, ডাক্তার হালদার ডাক্তার নন।

—ডাক্তার নন?

—না। আদালতের কাগজপত্র থেকে বোঝা গেল তাঁর শাস্তি হয়েছিল ঐ অপরাধেই।

উনি কোনও এক সময় ডাক্তার ছিলেন, এটা ঠিক—কিন্তু তিনি একটা বেআইনি অপারেশন করতে গিয়ে এক ভদ্রঘরের গৃহিণীর মৃত্যুর কারণ হন। ঐ সময় খোঁজ করে দেখা যায় আগে ঐ গুরুতর অপরাধের জন্য তাঁর ডিগ্রি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ডিগ্রি কেড়ে নেওয়ার পর সাধু সেজে ডাক্তারি করার অপরাধে তাঁর জেল হয়। তারপর তিনি নির্দিষ্ট সময়ে জেল থেকে বেরিয়ে কোথায় যে চলে যান তা পুলিশ জানে না। শিলিগুড়ির যে ঠিকানা তিনি দিয়েছিলেন সে ঠিকানায় তাঁর খোঁজ করেছি, কিন্তু কেউ কোনও হদিশ দিতে পারেনি। যাই হোক নবীন সূর্য কিছু ভুল করেছিল। চুরির অভিযোগটার কথাই লিখেছিল, কিন্তু আগে যে হালদার সত্যি সত্যি ডাক্তার ছিলেন এবং তাঁর ডাক্তারি লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এটা সেই কাগজ লেখেনি, কিংবা ঠোঙা তৈরির সময় সে অংশটা কাটা পড়েছিল।

কিটু বলল, তা হলে বাঘাকাকা, আমরা তো যে লোডশেডিঙে ছিলাম সেই লোডশেডিঙেই রয়ে গেলাম?

বাঘাকাকা বললেন, আমি এখনও হাল ছাড়িনি। ঐ যে জামা পাওয়া গিয়েছিল তার দর্জির নামটা পাওয়া গেছে। ঠিকানাও পাওয়া গেছে। তা থেকে কিছু হদিশ মিলতে পারে। আমাদের যে আসল লোক ডাক্তার হালদার কিংবা নতুন সাধু এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই। কিন্তু দু'একটা ব্যাপারে খটকা রয়ে গেছে।

কিটু তখন তার ভুবনচরার অভিজ্ঞতা বিশদভাবে বলল। শুনতে শুনতে বাঘাকাকা কেবলই বলতে লাগলেন, চমৎকার! চমৎকার!! আমি ভারী খুশি হয়েছি, কিটুবাবু। তুমি অনেকটাই এগিয়েছ। নোংরা ঘেঁটে যেসব নমুনা সংগ্রহ করেছ তা থেকে এটা স্পষ্ট যে সাধু দাড়ি কামাতেন। যাওয়ার সময় আয়নাটা ইচ্ছে করেই ফেলে গেছেন। পুরনো ব্লেডও ফেলেছেন, কোনও দরকার নেই বলেই। তা ছাড়া ম্যাক-এব ঘড়ির বিজ্ঞাপনটাও ভারী ইন্টারেস্টিং। পনেরো লাখ টাকার উপর একটা ঘড়ির দাম! এটা পুরনো বলেই কি? পুরনো তো অনেক কিছুই থাকে, সেগুলোর কিন্তু অত দাম হয় না। পাহাড় পর্বত এসব পুরনো তবে প্রচুর পাওয়া যায়। কিন্তু ঘড়ি, ঐ বিশেষ ঘড়ি বিরল এবং তার চাহিদা আছে, অতএব সেটা দামি। আমার কাগজ দেখা হয়নি দু-তিন দিন। কোনও বিশেষ খবর আছে?

—না বাঘাকাকা। কিটু বলল, তোমার খাওয়া হয়েছে তো?

—চমৎকার খেয়ে এসেছি শেয়ালদা স্টেশনের একটা রেস্তোরাঁ থেকে। পেট একেবারে ভরপুর।

এরপর বাঘাকাকা গুন গুন করে গান গাইতে লাগলেন। কিটু অবাক হয়ে গেল এটা ভেবে যে বাঘাকাকার অত বয়স সত্ত্বেও কি চমৎকার শক্তি রয়েছে, আর এই বয়সেই তার প্রায়ই দুর্বল বোধ হয়, মনে উৎসাহ থাকে না। কী যে করবে সে বুঝতে পারে না। সে দেখল বাঘাকাকা খবরের কাগজগুলো থেকে কয়েকটা কাগজ বেছে নিয়ে গেলেন শোয়ার ঘরে।

সে রাতে কিটু নানা আবোলতাবোল কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমোতেই পারল।

না ভাল করে। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে পারল না, বাঘাকাকা তার ভুবনচরার অভিজ্ঞতার কথা শুনে বার বার 'চমৎকার! চমৎকার!!' বললেন কেন? ও এমন কী বলেছে যাতে এই রহস্যের সমাধান হতে পারে? ম্যাক-এব ঘড়িটার বিজ্ঞাপনটা ইন্টারেস্টিং, এর মানেই বা কী?

পরদিন সকালে উঠে কফি করে এনে কিটুকে জাগিয়ে দিয়ে বাঘাকাকা বললেন, ১৬ই ডিসেম্বর এবং ১৭ই ডিসেম্বর রিচার্ডসন সাহেব ইস্টার্ন হোটেলে আসছেন, প্রায় দশ দিন সময় হাতে রয়েছে। ঐ সময় একটা ইন্টারভিউ নিতে হবে ওঁর সঙ্গে। ইন্টারভিউটা আফজলবাবু নিলেই ভাল হয়। ও ইন্টারভিউ নিতে গেলে রিচার্ডসন সাহেব ঝামেলা পাকাবে না বলেই মনে হয়।

—কিন্তু কেন? কিটু প্রশ্ন করল।

—দেখাই যাক না ব্যাপারটা কী। তা ছাড়া আফজলবাবু নিশ্চয় ঐ দু দিনের জন্য ১২১৩ কিংবা ১২১১ নম্বর ঘরটা যদি বুক করতে পারো তো ভারী একটা উপকার হয়।

হঠাৎ কিটুর মাথায় একটা আইডিয়া এসে গেল। সে বলল, ফাঁদ, বাঘা-কাকা?

—এটা আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল। মানে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনটা আমরা দিলেই ভাল করতাম। তাতে খরচা একটু বেশিই হত। একটা ঘর ইস্টার্নে দিনে দেড় হাজারের কমে বোধহয় হবে না, এ খরচাটা করতেই হবে। টাকার জন্য ভাবার দরকার নেই। এই কাজে খরচার কথা ভাবলে চলে না, মিহিরবাবুর নামটা যাতে কলঙ্কিত না হয় সেটা আমাদেরই দেখতে হবে।

—ডাক্তার আদিত্যর নামটাও যাতে কলঙ্কিত না হয় সেটা দেখাও আমাদের কর্তব্য।

বাঘাকাকা বললেন, ওঁর ব্যাপারে আমাদের বিন্দুমাত্র দায়িত্ব নেই। উনি নিজে মদ খান, কিন্তু অন্য একজন মদ খাওয়ায় তিনি মাধবলালবাবুর মৃত্যুকে রহস্যজনক করে তুললেন। তিনি ডাক্তার হিসেবেও খুব ভাল নন। একজন তীব্র বিষ খেয়ে মারা গেছেন তিনি সেটা বুঝতেই পারেননি, কেবল তাঁর মনে হয়েছিল মৃত্যুটা সন্দেহজনক! এ কী রকম ডাক্তার? আর মিহিরবাবুর উপর তাঁর রাগ, কেন, না মিহিরবাবু মদ খান! আর তিনি নিজে কী? মিহিরবাবুকে বিনা কারণে বিপদে ফেলার তাঁর কোনও অধিকার ছিল না। তাঁকে বাঁচানোর কোনও প্রশ্ন ওঠে না। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য মিহিরবাবুকে উদ্ধার করা, বদনাম দূর করা।

কিটু বলল, মিহির উদ্ধার হতে চায় না, বাঘাকাকা!

বাঘাকাকা ভারী আশ্চর্য হয়ে বললেন, কী হল ব্যাপারটা?

কিটু তখন মিহিরের সব কথা বলল। বাঘাকাকা বললেন, এই পাগলামির তো কোনও শেষ নেই! এ তো নিজের সর্বনাশ করা!

কিটু বলল, এ ব্যাপারে মিহির তোমার সঙ্গে একমত হবে না বাঘাকাকা। ওর এক অদ্ভুত মত আছে, আছে অদ্ভুত লজিক।

বাঘাকাকা বললেন, তবু ফাঁদ···ফাঁদই বলা যাক, পাততে হবে। ব্যাপারটা মিহিরবাবুরও নয়, এমনকি ডাক্তার আদিত্যেরও নয়। ব্যাপারটার মধ্যে যখন ঢুকে পড়েছি এর শেষ দেখা চাই। সব জিনিসেরই একটা সৌন্দর্য থাকে, সেই সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায় যখন সেটাকে ইচ্ছে করে বিকৃত করা হয়।

কিট্টু বলল, ফাঁদ পাতবে? কার জন্য?

বাঘাকাকা বললেন, ম্যাক-এব ঘড়ির জন্য। বুঝতেই পারছ, ডাক্তার হালদারের চোখে যদি ম্যাক-এব ঘড়ি কেনার বিজ্ঞাপনটা পড়ে তা হলে তিনি কি আর ইস্টার্ন হোটেলের ১২১২ নম্বর ঘরটিতে একবারও আসবেন না? সমস্ত দুনিয়ার কোনও এক কোণে পালিয়ে থাকলে কাউকে খুঁজে বার করা ভারী শক্ত কাজ, কিন্তু তাঁকে যদি ফাঁদের মধ্যে নিয়ে আসার লোভ দেখানো যায় তা হলে অনেক সহজে কাজটা হয়। এই সহজ কাজটা আমাদের হয়ে একজন সাহেব ব্যক্তি করেছেন। এখন আমাদের কাজ হবে সাধু ডাক্তারের জন্য ঐ হোটেলের একটি ঘরে অপেক্ষা করা।

কিট্টু ঘাড় নেড়ে বলল, আইডিয়াটা ভালই, বাঘাকাকা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কী জানো—পাশের ঘরে অপেক্ষা করলেই কি তুমি বুঝতে পারবে কে আসছে কে যাচ্ছে? পাশের ঘর থেকে তো তুমি দেওয়াল ভেদ করে কিছু দেখতে পাবে না।

—তা বটে। বলে বাঘাকাকা ভাবতে লাগলেন।

কিট্টু মনে মনে খুশি হল।

একটু পর বলল, তা ছাড়া পাশের ঘর তুমি পাবেই এমন গ্যারান্টিই বা কোথায়। এখন টুরিস্ট সিজন, এখন কলকাতার মতো শহরেও বেশ কিছু টুরিস্ট এসে পড়ে।

—কী করা যায় তা হলে বলো না। বাঘাকাকা বললেন।

এবারে কিট্টু আরও খুশি হল। সে ভেবে ভেবে অবশ্য কিছু হদিশ করতে পারল না। বাঘাকাকা বললেন, আমরা অবশ্য ইস্টার্নের সামনে কমলালেবু বিক্রি করার ভান করে পাহারা বসাতে পারি। ফুটপাথে তো জুতো জামা সবই বিক্রি হয়। ভিখিরি সেজে চিৎপাত হয়ে চিৎকার করে বিদেশি পর্যটকদের কাছে ভিক্ষে চেয়ে কলকাতার কালচারকে বিশ্বের দরবারে প্রচার করতে পারি। আর সেই সময় তীক্ষ্ণ নজর রাখতে পারি আগন্তুকদের প্রতি। কপালে কাটা দাগ দেখলেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি, অথবা একটু অহিংস উপায়ে তাকে অনুসরণ করতে পারি।

কিট্টু বলল, আইডিয়াটা খুব মন্দ নয়। কিন্তু এর মধ্যে একটা বিপদ আছে। কপালে কাটা দাগ দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়াটায় একটা ঝুঁকি থেকেই যাবে। ঝাঁপিয়ে পড়লে সে তো ভ্যাড়ার মতো ব্যা ব্যা করে ভালমানুষের মতো পেছন পেছন আসবে না। ঝাঁপিয়ে পড়লে প্রতিআক্রমণও তো করতে পারে। আর কলকাতার রাস্তায় সঙ্গে সঙ্গে দশ হাজার লোক জুটে গিয়ে মারতে শুরু করে দেবে, এমনকি তাদের আমাদের প্রতি দয়া নাও হতে পারে। হয়তো দেখবে তারা আমাদেরই

ধরে মারছে।

বাঘাকাকা বললেন, কথাটা ঠিকই বলেছ। অতটা আমি ভাবতে পারিনি। আচ্ছা কিট্টুবাবু, সাহেবের সঙ্গে কথা বললে কেমন হয়? এটা কি করা যায় না? সাহেবকে কি বলা যায় না যে, একজন চোর ঘড়ি চুরি করেছে, সে বিক্রি করতে আসবে এবং সেই চোর ধরতে আমাদের সাহায্য করুন।

কিন্তু কিট্টুর উত্তর শোনার আগেই বাঘাকাকা বললেন, বোধহয় সাহেব রাজি হবেন না—তিনি তো ভারতে এসেছেন ঘড়ি কিনে নিয়ে নিজের দেশে বা অন্য কোনও দেশে গিয়ে ডবল কি তিন ডবল দামে সে ঘড়ি বিক্রি করবেন বলে। তাঁর ঘড়ি নিয়ে ব্যবসা, ঘড়ি পেলেই হল, সে ঘড়ি কীভাবে সংগৃহীত তা তাঁর জানার দরকার কী? ঘড়ি চোরাই হতে পারে, কেউ কুড়িয়ে পেতে পারে, ডাকাতি করে সংগ্রহ করতে পারে, উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করতে পারে। সত্যি, আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার ব্যাপারে ওঁর স্বার্থ কী?

কিট্টু বলল, তা হলেও একবার ওঁর সঙ্গে কথা বললে বোধহয় ভাল হত। কিংবা পুলিশকে বললেও কাজ হতে পারে।

—পুলিশ? বাঘাকাকা বললেন, পুলিশকে বলা কি সোজা কথা! তা ছাড়া এ তো একটা আন্দাজের ব্যাপার। যে মামলা মিটে গেছে সে মামলায় পালিশ আসবে কেন? দেখি চেষ্টা করে কী করা যায়। একবার ইস্টার্ন হোটেলে গিয়ে সাহেবের বর্তমান ঠিকানাটা পাওয়া যায় কি না দেখা যাক।

ইস্টার্ন হোটেলের ম্যানেজারকে রিচার্ডসনের ঠিকানার কথা বলাতে তিনি ঘাড় নেড়ে বললেন, না সে হয় না। ঠিকানা হল গিয়ে ব্যক্তিগত ব্যাপার। ওটা পাওয়া যাবে না। তবু কিট্টু বলল, একটা বিশেষ জরুরি ব্যাপারে তাঁকে একটা খবর দেওয়া দরকার। আপনাদের ক্লায়েন্টেরই স্বার্থে। যদি পরে ওঁর কিছু বিপদ ঘটে তা হলে কিন্তু সমস্ত দায়িত্ব আপনাদেরই নিতে হবে। কিট্টু তার কার্ড বার করে ম্যানেজারকে দিলে ম্যানেজার অনেকক্ষণ ভেবে বললেন, এ ব্যাপারে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারি না, দায়িত্বও নয়। তখন কিট্টু বলল, আপনি এক কাজ করুন, আগাম রিজার্ভেশনের খাতাটা রেখে আপনি অন্যদিকে তাকিয়ে থাকুন। আমি খাতাটা দেখব আর রিচার্ডসন সাহেবের ঠিকানাটা মনে মনে নোট করব। আপনি যে আমাদের ঠিকানা দিয়েছেন সেটা প্রকাশ হবে না। ম্যানেজার বললেন, অত গোপনতা বা ষড়যন্ত্রের দরকার নেই। আপনি একটা কাজ করুন। একটা অ্যাপ্লিকেশন করুন। আমি না হয় একটু রিস্ক নিয়ে সরকারিভাবেই জানিয়ে দিই। আমার গেস্টএর স্বার্থে আমি এটা করতে পারি বোধহয়?

কিন্তু খাতা খুঁজে তিনি বললেন রিচার্ডসনের নামে কোনও বুকিং নেই।

—এটা তো ভারী মুশকিল হল! কিট্টু বলল, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন ১২১২ ঘরে তিনি দুদিন থাকবেন, ১৬ আর ১৭ ডিসেম্বর। আর তাঁর নামে বুকিং নেই? হতেই পারে না।

ম্যানেজার বললেন, ১২১২ নম্বর ঘর? চেক করি একবার। তারপর একটা

খাতা দেখে হাহা করে হাসলেন। বললেন, দেখুন কী অদ্ভুত ব্যাপার। ঐ দিনে ঐ ঘর যিনি ভাড়া নিয়েছেন তাঁর নাম রিচার্ডসন নয়, প্রিচার্ডসন।

কিট্টু বলল, কী করে ভুলটা হল?

বাঘাকাকা বললেন, ভুল নয় ঠিকই হয়েছে। পি রিচার্ডসন হয়েছে প্রিচার্ডসন। ম্যানেজার বললেন, এক নতুন ক্লার্ক এসেছেন। এর মধ্যেই তিনি অনেক গোলমাল পাকিয়েছেন। যাক, আপনাদের ঠিকানা দিচ্ছি। উনি এখন লণ্ডনে রয়েছেন, এই যে ঠিকানা আর ফোন নম্বর। দেখবেন যেন আমরা বিপদে না পড়ি।

—সে ভয় নেই। বলল কিট্টু।

বাড়িতে ফিরেই কিট্টু টেলিফোন করল লণ্ডনের রিচার্ডসনের নম্বরে। একটি নারীকণ্ঠ জানালেন, রিচার্ডসন মহাশয় বেরিয়েছেন, ফিরতে রাত হবে। কিট্টু হিসেব করে দেখল রিচার্ডসনকে ফোনে পাওয়ার সবচেয়ে সুবিধেজনক সময় হল লণ্ডনের রাত এগারোটা, অর্থাৎ কলকাতার ভোর সাড়ে চারটে।

ফোনটা ঠিক ছিল, আর একবার ডায়াল করতেই পাওয়া গেল রিচার্ডসনকে। রিচার্ডসন সব শুনে বললেন, আমরা অনেস্ট বিজনেস করি। চোরাই মাল কেউ বিক্রি করলে আমাদের বোঝার উপায় থাকে না, তবে আগে থেকে জানতে পারলে নিশ্চয়ই সাহায্য করব চোর ধরতে। কিট্টু বলল দুদিন সে ওঁর সঙ্গে বসে থাকতে পারে কি না সহকারি সেজে। রিচার্ডসন জানালেন, না—তাঁর কাছে যাঁরা আসবেন তাঁরা অনেক সময়েই জানতে দিতে চান না অন্যাকে, অতএব তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি সম্ভব নয়। তবে পনেরো তারিখ রাত্রিবেলা যদি কিট্টু লাহিড়ি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাহলে অন্য কিছু ভাবা যেতে পারে।

কী পরিষ্কার শোনা গেল কথাগুলো। কিট্টু লক্ষ করেছে সব সময়েই বিদেশের সঙ্গে কথা খুব স্পষ্ট শোনায়। কেন তা সে বুঝতে পারে না।

বাঘাকাকা বললেন, এই ফাঁদে যদি ঘুঘু পা দেন তা হলে তো কথাই নেই। কিন্তু এর মধ্যে আমাকে একবার মাদ্রাজ যেতে হচ্ছে।

—মাদ্রাজে কেন? এই ব্যাপারে?

বাঘাকাকা বললেন. একবার বিশ্বলালবাবুর আস্তানার সন্ধান করতে হয়। ওঁর নীরবতার কী কারণ হতে পারে তা জানা দরকার।

—ঠিকানাই তো নেই ওঁর। ওঁর টেলিগ্রাম ফেরত এসেছে।

—ও, হ্যাঁ, তাই তো। মনে হল বাঘাকাকা কথাটা বলার সময় একটু ইতস্তত করলেন। তারপর বললেন, দ্যাখ তো আবার ভুলে বসেছি ব্যাপারটা। নিজের মাথাটা একটু ঠুকে বললেন, মেমারি সেলগুলো ঠিকমতো কাজ করছে না।

তারপর একটু থেমে বললেন, ব্যাপারটা তবু একটু গিয়ে দেখা দরকার। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জানাও যেতে পারে কিছু। বিশ্বলালবাবুর এ-রকম অন্তর্ধানের কোনও সঙ্গত কারণ নেই। অবশ্য এটা ঠিক, বাড়ির সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্কই ছিল না। উভয় পক্ষেরই এ ব্যাপারে একই রকম মনোভাব। বিশ্বলালবাবু অন্তর্ধানও করেননি ঠিক। তিনি যেখানে উঠে গেছেন সে জায়গার

ঠিকানা বাড়ির কাউকে জানাননি।

—কিন্তু, কিটু বলল, ওঁর সন্ধান করার দরকারটা কী?

বাঘাকাকা বললেন, দরকার নেই বলছ? আমার মনে হয় আছে। উনি ঐ বাড়ির সবচেয়ে বঞ্চিত ব্যক্তি। অন্য দুজন ছেলে তবু মাধবলালবাবুর সম্পত্তি ভাগাভাগি করবেন, কিন্তু বিশ্বলাল তা করবেন না। তিনি এলেও তাঁকে দু ভাই এবং মনে হয় বোনও ঐ বাড়িতে উঠতে দেবেন না। বুঝলে, স্বার্থ বড় ভয়ানক জিনিস। বিশ্বলালবাবুর প্রতি আমার একটু সহানুভূতিও আছে, আর সবচেয়ে বড় যা আছে তা হল কৌতূহল। আমি একটু ওঁকে দেখে আসতে চাই। যে ধাঁধায় ঢুকে পড়েছি, তা থেকে বেরুনোর পথ হয়তো বিশ্বলালবাবু দেখাতে পারবেন না, তবু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে ওঁর সঙ্গে দেখা হওয়াটা দরকার। একটা কিছু হয়তো তিনি বলতে পারেন যাতে অন্ধকারটা দূর না হলেও কিছুটা কাটে। আমার সঙ্গে তুমিও যেতে পারো ইচ্ছে করলে।

কিটু ভাবল একবার মাদ্রাজ ঘুরে এলে বোধহয় মন্দ হয় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল সেই ট্রেনে ওঠা, সারাটা পথ উদ্বেগে কাটানো, জিনিসপত্র চুরি হয় কি না খেয়াল রাখা, বিচ্ছিরি সব খাদ্য খাওয়া, তার উপর মাদ্রাজে গিয়েও বিশ্রাম পাওয়া যাবে না, সেখানে ঘুরতে হবে কোথায় কখন কে জানে। সে তাই বলল, এই কাজটা তুমিই সেরে ফেল।

বাঘাকাকা বুঝলেন কিটুর মনোভাব। তিনি বললেন, ঠিক আছে আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব। ওখানে আমার এক জেল-খাটা বন্ধু আছে, ইভনিং মার্কেটে ইলেকট্রনিক্সের জিনিসপত্র বিক্রি করে। সে বাংলা জানে ভাল। আমি তামিল জানি না। ওকে সঙ্গে নিলে কাজটা সহজ হবে।

টিকিট? এখন কি রিজার্ভেশন পাবে মাদ্রাজের?

বাঘাকাকা মৃদু হাসলেন। বললেন, পকেটে টাকা থাকলে রিজার্ভেশন পাওয়া এই ভারতের রেলপথে শক্ত নয়। কিছু না পাওয়া গেলে ড্রাইভার কিংবা গার্ড সাহেবের সঙ্গে ভাব জমাতে হবে; তাতেও কিছু খরচ হবে, কিন্তু যেতে যখন হবে তখন উপায়ই বা কী।

এর কয়েকদিন পর প্রকৃতি এসে দুবার ঘণ্টা বাজাল। বেচারার জ্বর হয়েছিল কদিন। এর মধ্যে এত সব ঘটনা ঘটেছে সে তার কিছুই জানে না। প্রকৃতির এই হয়—কখনও সে গোয়েন্দা কাহিনীর ভেতর ভাল করে ঢুকতেই পারল না। কিটু তাকে সংক্ষেপে সব জানানোর পর প্রকৃতি হঠাৎ মেঝেতে শুয়ে পড়ে গড়াতে লাগল, আর বলতে লাগল, ইঃ একদম মাথায় কিছু ঢুকছে না। এত জটিল সব ব্যাপার। ক্লু নেই কোথাও।

কিটু বলল, পাগলামি করছিস কেন, মেঝেতে গড়াস না, ভারী ঠাণ্ডা এখন, সবে জ্বর থেকে উঠেছিস। কিটু অবশ্য ইস্টার্ন হোটেলের ফাঁদ-এর কথাটা বলল না। প্রকৃতি ছেলে মানুষ, কাকে কী বলে ফেলবে। হঠাৎ তাই এই সাবধানতা।

একটু পর প্রকৃতি বলল, আর ভুবনচরায় যাবে না কিটুদা? সরযূ, মানে সুরেষের স্ত্রী এম এল এ দাদুর বাড়িতে কি এখনও আছে?

কিটু জানে না। জানতেও চায়নি। তবে ভুবনচরা জায়গাটা তার ভাল লেগে গেছে, ভাল লেগেছে নতুন পরিচিত মানুষরা। ডাক্তার আদিত্যকে তার ভালই লেগেছে, ভাল লেগেছে রানাদির আন্তরিক ব্যবহার। জায়গাটার সবুজ রূপ তার মনে এনে দিয়েছে নতুন একটা আনন্দের ভাব। বাঙলার প্রকৃতি কত ভাল। কত চমৎকার। সেখানে মাধবলালবাবুর বাড়ির ব্যাপারটাই তার কাছে অসহ্য। ভাবলেই তার খারাপ লাগে। সরযু ঐ বাড়িতে কী করছে, আদৌ আছে কি না তাও জানে না। জানতেও চায় না সে।

সে হঠাৎ বলল, চল প্রকৃতি আমরা কোথাও বেড়িয়ে আসি। পরশু রবিবার, চল একটা ট্রেনে করে চলে যাই পঞ্চাশ-ষাট কিলোমিটার, তারপর সারাদিন একটা নতুন পরিবেশ, নতুন লোকের সঙ্গে কথা বলে চলে আসি আবার। যাবি?

প্রকৃতি ইতস্তত করল। বলল, মা যেতে দেবে কি না কে জানে।

কিটু বলল, কেন যেতে দেবে না। আমার কথা বলিস, ঠিক যেতে দেবে।

প্রকৃতি বলতে যাচ্ছিল, তোমার সঙ্গে যাওয়ার কথা শুনলে তো মা আরও আপত্তি করবে! কিন্তু কথাটা বলল না।

কিটু এখন ভুলতে চেষ্টা করছে সব। সে কলকাতাতেই আর থাকতে চায় না।

আর ঠিক যখন ভাবছে কলকাতাটা বিচ্ছিরি জায়গা ঠিক সেই সময় আবার শুরু হয়ে গেল পাওয়ার কাট। রেডিওর খবরে বলা হল, কলকাতা অঞ্চলে বিদ্যুৎ ঘাটতি একশো আশি মেগাওয়াট।

রবিবারটা দুজনের বেশ ভালই কাটল। তারা বাগনানের কাছে একটা স্টেশনে নেমে প্রায় দশ কিলোমিটার হেঁটে বাড়িতে ফিরল, কিছুটা শারীরিক ক্লান্তি নিয়ে, কিন্তু মানসিকভাবে বেশ তাজা বলে মনে হল কিটুর।

১২

কিন্তু বাড়িতে ফিরে একা একা সে আবার ক্লান্ত বোধ করতে লাগল। সব ভাবনাই কোথায় গিয়ে যেন থেমে যেতে লাগল। দু-একখানা বই নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল—একেবারেই মন বসাতে পারল না। সে মিহিরের কথা ভাবতে লাগল। বেচারা মিহিরকে বোধ হয় সমস্ত জীবনই একটা গ্লানি নিয়ে থাকতে হবে। ও অবশ্য এখন কেয়ার করে না। বরং ভাবে এতে তার বাহাদুরি বেড়েছে অনেক! সে তার মনটাকে একটু অন্য দিকে নেওয়ার আশায় সে খাটের কাছে রাখা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সংবাদপত্রে সে-কালের কথার একটি খণ্ড নিয়ে পড়তে লাগল। কিট্টু লাহিড়ি ভাবছে যদি তাকে গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে সংবাদপত্রের প্রতিনিধি কিংবা সাব-এডিটরের চাকরি নিতে হয় তা নানা রকম বিষয় নিয়ে কিছু কিছু পড়া দরকার। পাতা ওলটাতে ওলটাতে তার প্রথমেই নজরে পড়ল একটি খবর—কালীর স্থানে জিহ্বাবলি।

কিট্টু পড়তে শুরু করল: শুনা গিয়াছে যে গত ৮ চৈত্র মঙ্গলবারে পশ্চিম-দেশীয় এক ব্যক্তি কালীঘাটে শ্রীশ্রীকালীঠাকুরাণীর সম্মুখে আপন জিহ্বা ছুরিকাদ্বারা ছেদনপূর্বক বলিদান করিল তাহাতে রক্ত নির্গত হইয়া ভূমি পর্যন্ত পতিত হইল এবং সে ব্যক্তি রক্তাক্ত কলেবর হইয়া একেবারে মূর্ছাপন্ন হইল। এ ব্যক্তির অসমসাহসী কর্ম দেখিয়া ও শ্রবণ করিয়া যাঁহারা কনিষ্ঠাঙ্গুলির এক দেশ ছেদনপূর্বক ভগবতীকে কিঞ্চিৎ রক্ত দর্শন করাইয়াছিলেন বা করাইবেন তাঁহারা অবাক হইয়াছেন বা হইবেন।

এই সম্বাদ এত বিলম্বে প্রকাশ করা গেল তাহার কারণ অগ্রে বিশ্বাস হয় নাই তৎপরে বিশেষানুসন্ধানে নিশ্চয় জানিয়া প্রকাশ করিলাম।

নিজের জিভ কাটার খবর পড়ে কিট্টু তারিখটা লক্ষ করল। ১৮২৭ সাল—প্রায় একশো সত্তর বছর আগেকার কথা। মানুষ কত কুসংস্কারাচ্ছন্নই না ছিল! নিজের জিভ নিজে কাটার মধ্যে যে সর্বনাশী অজ্ঞতা ছিল। কিট্টু ভাবলা আজ-কাল আর এ-সব হয় না! কিন্তু তারপরই তার মনে হল, হয় না? আজও তো ধর্ম এবং সংস্কারের নামে নরবলি হয়, আজও তো শিশু বিসর্জন দেওয়া হয়। ধর্মের ভয় দেখিয়ে পাণ্ডাদের নানা রকম অত্যাচার তো এখনও বন্ধ হয়নি!

কিন্তু এই সবের পরও তার মনে হতে লাগল তখনকার আমলের সম্পাদকের খোলাখুলি কথা—"সংবাদ এত দেরিতে প্রকাশ করার কারণ অগ্রে বিশ্বাস হয় নাই তৎপরে বিশেষানুসন্ধানে নিশ্চয় জানিয়া প্রকাশ করিলাম।" এর মধ্যে বোঝা গেল ঐ সময়ের সম্পাদক সংবাদ যাচাই না করে প্রকাশ করতেন না। কিন্তু এখন সম্পাদকরা কম ক্ষেত্রেই সংবাদের সত্যতা যাচাই করেন। অবশ্য তা করতে গেলে অনেক বেশি পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় তো বটেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খবরের প্রতিযোগিতায় অন্য সংবাদপত্রের সঙ্গে পিছিয়ে থাকতে হবে। বিক্রি কমে যাবে।

ভুল হলে সেটা স্বীকারও করে না অনেক সংবাদপত্র। এই তো গণপ্রভাতে স্থানীয় এম এল এ-র মৃত্যু বলে খবর বেরিয়েছিল, কিন্তু তারপর তো সেটা সংশোধন করেনি তারা?

পরদিন সকাল নটা নাগাদ টেলিফোন বাজল। কিট্টু বই নামিয়ে রেখে রিসিভার ধরল। সুপ্রিয়া পিসি ফোন করছেন।

—কি রে কিট্টু রাত্রে কতবার ফোন করলাম বেজেই গেল। কাল কখন এলি?

—একটু রাত হয়েছিল।

—ভুবনচরায় গিয়েছিলি?

—না পিসি বাগনানে।

—ওখানে কি কারু লাশ-টাশ পাওয়া গেছে? শুনলাম তোর বাঘাকাকা উধাও?

—উধাও কেন হবেন উনি?

—তোর নাকি খাওয়া-দাওয়াও জুটছে না? আমাকে বলিসনি কেন?

—খাওয়া-দাওয়া জুটছে না কে বলল?

সুপ্রিয়া পিসি ও কথার জবাব না দিয়ে বললেন, শোন, আমি সব ব্যবস্থা করেছি। রোজ একবার সকাল এগারোটা নাগাদ আমি আসব। সঙ্গে দু-বেলার খাবার নিয়ে আসব। তুই একদম রান্না-ফান্না করবি না। কোনও অসুবিধে তোর হবে না। আমি আছি, ভয় কিসের? আর ঐ শেয়ালকাকা না এলো তো বয়েই গেল। এর পর তোর একটা বিয়ের বন্দোবস্ত করতে হবে। তোর পিসে বলছিল তিনি একটা মেয়ের সন্ধান পেয়েছেন, দারুণ নাকি কপি করতে পারে পুরনো বই থেকে।

কিট্টু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। যখন পিসেমশাই মেয়ে দেখেছেন তখন অন্তত দু-বছরের জন্য নিশ্চিন্ত। কিট্টু বলল, বেশ তো! কিন্তু পিসি, বাঘাকাকাকে তুমি শেয়ালকাকা বল কেন বল তো?

সুপ্রিয়া পিসি বললেন, লোকটা তোর সর্বনাশ করছে বুঝতে পারছিস না?

কিট্টু বলল, আমার সর্বনাশ করছে? বাঘাকাকা? আমার তো কোনও অসুবিধেই হচ্ছে না পিসি। দিব্যি সকালে চমৎকার ব্রেকফাস্ট, নিত্যি নতুন লাঞ্চ, বিকেলের চা এবং সঙ্গে টা! আবার রাত্রে নতুন কিছু একটা পদ।

সুপ্রিয়া পিসি বললেন, আরে বোকা ঐতেই তো তোর সব্বোনাশ হচ্ছে। ওর উপর তুই অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিস। এর পর তুই যখন ওকে ছাড়া এক মিনিট চলবে না তখন সে তার নিজমূর্তি বার করবে। আরে, তুই গোয়েন্দা হয়েও এই সহজ কথাটা বুঝছিস না কেন বুঝতে পারি না আমি।

কিট্টু প্রসঙ্গান্তরে গেল। বলল, পিসি, মিহির কেমন আছে? দু-একদিন ওর সঙ্গে দেখা হয়নি আমার।

—সে কি কথা? ও যে বলল তোর কাছে আসছে। সে তো সেই সকালের কথা। আসেনি?

—না পিসি।

—ওকে আমি আজ রাত্রে না খাইয়ে রাখব। মিথ্যে কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। ও বলেছে তোকে কি একটা বই নাকি ও উৎসর্গ করেছে, সেটা প্রকাশকের কাছ থেকে নিয়ে তোকে দেবে।

—তাই হয়তো দেরি হচ্ছে পিসি।

সুপ্রিয়া পিসি বললেন, ওর হয়ে আর সাফাই গাইবি না। আজ ওকে আমি না খাইয়ে রাখব। দেখি ও কি করে। ও কেন বলল তোর কাছে প্রথমে আসবে?

— ফ্রিজের ঘরটা তালা দিয়ো পিসি!

সুপ্রিয়া পিসি হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, আজকাল ফ্রিজ-ট্রিজও চোর চুরি করছে। তালা দেওয়া দরকার। একটা ভাল তালাও বাড়িতে নেই।

কিটু বলল, না না ফ্রিজ চুরির ব্যাপার নয়। তুমি মিহিরকে না খাইয়ে রাখবে কেমন করে? ফ্রিজ আছে, খাদ্য আছে, ও ফ্রিজ খুলে…।

—তা বটে। তা হলে একটা সাধারণ তালাই লাগাব। আর একটা কথা—মিহির এলে ওকে চা ছাড়া কিচ্ছু দিবি না। বলবি বাড়িতে গিয়ে খা। বাড়িতে এলে বাছাধন টের পাবেন! হ্যাঁ, আমি এমনিতে ভাল মানুষ, কিন্তু দরকার হলে আমি নিষ্ঠুরও হতে পারি।

পরে সুপ্রিয়া পিসি একগাদা খাবার নিয়ে হাজির। তা থেকে অনেকটা আবার ফ্রিজে রাখলেন। বললেন, কেঁচোকাকা কবে ফিরছে। মাদ্রাজ থেকে শুনলাম?

—কেঁচো কাকা?

—ঐ তোর বাঘাকাকা। কেঁচোরাও বাঘ, জেনে রাখ।

—গেছেন মাদ্রাজে। কবে ফিরবেন জানি না।

—হুঁম! বললেন সুপ্রিয়া পিসি। সাবধানে থাকবি। আমি আজ চলি। কাল আবার আসব।

—আমি যদি হঠাৎ বেরিয়ে যাই?

—আচ্ছা একটা ফোন করে জেনে নেব। আর একটা কথার তো উত্তর দিলি না। বাগনানে কেন গিয়েছিলি?

—কুত্তা হত্যা। ওখানকার জমিদারের কুকুরকে কে বা কাহারা ভোজালি দিয়ে তিন টুকরো করে পালিয়েছে।

—আর তুই কুত্তা হত্যার তদন্ত শুরু করলি? সামান্য এক কুত্তার জন্য নিজের প্রাণ বিপন্ন করছিস? জানিস, যারা কুত্তা হত্যা করতে পারে তারা মানুষকে আরও সহজে হত্যা করতে পারে? ভারি বিপদ বাধালি। তোর বাবাকে একটা চিঠি লিখে নালিশ জানাতেই হচ্ছে!

সুপ্রিয়া পিসি চলে গেলেন। কিটু অলসভাবে দু খানা খবরের কাগজ নিয়ে পাতাগুলো উল্টে বাংলা ক্রস-ওয়ার্ড নিয়ে বসল।

সূত্রগুলো তার খারাপ লাগে না। একটা সূত্র তার চোখে পড়ে গেল—খাবারের খোঁজে তদন্তকারী পুলিশ? পাঁচ অক্ষর। এই নিয়ে সে দু-এক মিনিট

মাথা ঘামিয়েছে কি ঘামায়নি, এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল। আফজল বলছে, কিট্টু ভাই, নতুন কিছু খবর আছে?

—না।

—বাঘাকাকা ফিরলেন?

—না।

—মুশকিল! আফজল বলল, আমি কি যে লিখব বুঝতে পারছি না। শৈলেনবাবু খুব চাপ দিচ্ছেন।

—বাঘাকাকা না ফিরলে আর কিছু করব না। মানে কি যে করব সেটাই বুঝতে পারছি না।

—কিছু একটা করা যায় না?

কিট্টু বলল, বড্ড ক্লান্ত লাগছে। যে রহস্যের শেষ নেই, সে রহস্যের সমাধান করব কেমন করে?

—ঠিক আছে। আফজল বলল, তোর ক্লান্তিটা কাটুক।

দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে টিভি খুলতেই ক্রিকেট!

ঘণ্টা তিনেক খেলা দেখার পর সে টিভি বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। সত্যিই ভারি ক্লান্ত হয়েছিল সে। ঘুম ভাঙল রাত আটটা নাগাদ দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠলে।

কিট্টু আস্তে আস্তে উঠল।

আবার ঘণ্টার আওয়াজ।

কিট্টু উপর থেকে সুইচ টিপে দরজা খুলে দিল।

মিহির লাফাতে লাফাতে উপরে উঠে এল। কিট্দা এই দ্যাখো বালিশে টাইম-বোমা!

কিট্টু ভয় পেয়ে গেল। বলল, সে কি? কি ব্যাপার?

মিহির বলল, এই দ্যাখো বইটা—আমার নতুন বই। তোমার নামে উৎসর্গ করলাম, আজই পেলাম। কেমন নামটা?

—বালিশে টাইম-বোমা?

—মুখ অত বিরস কেন দাদা, পছন্দ হয়নি বুঝি?

—বইটা এত পাতলা কেন? বলতে বলতে কিট্টু নেড়েচেড়ে দেখল। মাত্র বারো পৃষ্ঠা?

মিহির বলল, বইটা একটু মোটা করব ভেবেছিলাম। পয়সায় কুললো না। বইমেলায় না হলে বেরুত না। বইয়ের নামটা কেমন হয়েছে বললে না তো?

—চমৎকার! কিট্টু বলল। আমাকে উৎসর্গ করাতে আমি অভিভূত। তবে আমি তো যোগ্য পাত্র নই। তোমার শক্তিদা সুনীলদা তারাপদদা এঁদের দিলে না কেন?

—ওঁরা…। একটু থেমে বলল, ওঁরা সব দূরের মানুষ। ওঁরা বিরাট, বিশাল, ওঁদের কাছে যাওয়া বন্ধ করেছি।

—কেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন না তোমার হবে?

—কে শক্তিদা ? ওঁকে আমি গুলি করব।

—কেন ?

—উনি তো বলেছিলেন আমার হবে ? সেদিন কোথায় এক ইণ্টারভিউয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ তরুণ কবিদের নাম বলতে বললেন, যাচ্ছেতাই হচ্ছে। আজকাল কবিরা কেউ কবিই নয়। কারুর কিসসু হবে না।

—আমার তো মনে হচ্ছে উনি ঠিকই বলেছেন।

—আচ্ছা কিটুদা আমার একটা কবিতা শোনাই, তারপর বোলো !

মিহির পড়তে শুরু করল—

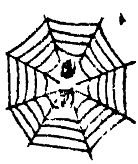
ভাগিরথীর উপর জুটেছে এক সাদা হাতি
তার ল্যাজ ধরে টানাটানি করে
কোথাকার সূর্যলোকবাসী ভগবানের
তিন নম্বর নাতি !
এই ভাবে ঘটাং ঘং ঘটাং হায়
ট্রেনের বাতানুকূলের সব টিকিটই
হুস্ ফুরিয়ে যায়।
জঙ্গলে জঙ্গলে হাতির দল
মাড়িয়ে চলেছে অগাধ জল
ঘন ঘন দেয় ট্রাংক কল
চলো যাই ভাগিরথী
দেখে আসি সাদা হাতি।
কেন তোরা মাথা নেড়ে অত চেল্লাস
আয় দেখি তোর পেটে করি খানাতল্লাস !

কিটু লাফিয়ে উঠল। বলল চমৎকার হয়েছে। চমৎকার হয়েছে রে মিহির। মিলে গেছে !

মিহির গর্বের সঙ্গে বলল, আমি একটু মিলে বিশ্বাস করি। মিল থেকে যে ছন্দ আপনা হতে গড়ে ওঠে সেটা কষ্টকল্পিত গদ্যে তেমন হয় না। আমরা বোধ হয় আবার মিলের দিকেই ফিরে যাচ্ছি কিটুদা !

কিটু বলল, কি সব আবোল-তাবোল বকছিস। আমি একটা ক্রস-ওয়ার্ড করছিলাম। সূত্রটার মাথামুণ্ডু পাচ্ছিলাম না। এবারে তুই মিলিয়ে দিয়েছিস—উত্তর হবে খানাতল্লাস !

মিহির গুম হয়ে গেল।



১৩

মাদ্রাজ থেকে বাঘাকাকা ফিরে এসে যা জানালেন তাতে কিটু স্তম্ভিত হয়ে গেল। কয়েক মাস হল বিশ্বলালবাবু মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। যে কোনও দিন তিনি মারা যেতে পারেন। কয়েক বছর হল নানা জায়গায় এটা সেটা কাজ করেছেন। কিন্তু কোনও কাজই পাকা নয়। শিক্ষিত লোক, কিন্তু সার্কাসের মেয়ে শান্তার সঙ্গে জীবনটাকে জড়িয়ে ফেলার পর বিশ্বলালবাবু নিজেও সার্কাসে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সার্কাসের যে নিয়ম, সে কাজ ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ কাজ করার শক্তি থাকে। তখন যা পাও জমিয়ে রাখো, কেননা সার্কাসের সবচেয়ে অসুবিধে দড়ির উপর দিয়ে চলা, ঝপাং করে লাফানো, ভালুকের সঙ্গে নাচা, সাইকেল নিয়ে ভেল্কি দেখানো। ওখানে ততক্ষণ মাইনে যতক্ষণ কাজ করার ক্ষমতা। শান্তা ছিলেন অ্যাক্রোব্যাট। দড়ির উপর দিয়ে একটা বড় লাঠি নিয়ে ব্যালান্স করা, দড়ির উপর দিয়ে সাইকেল চালানো, এসবে ছিল তাঁর অপূর্ব দক্ষতা। এজন্য কোনও সময় তিনি পেয়েছেন প্রভূত বাহবা, এবং হাততালি। বিশ্বলাল নিজেও ঐ সার্কাসে কেরানির চাকরি নেন। দুজনে মিলে মন্দ চলছিল না, কিন্তু বিপদ যখন এল তখন তাঁদের দাঁড়াবার জায়গা নেই। সার্কাস থেকে শান্তার চাকরি গেল তখনই যখন তিনি অন্তঃসত্ত্বা হলেন। খেলু খতম হয়ে গেল। সার্কাসের মালিক বললেন, চলে যাও, আবার যখন আসবে খেলা দেখাতে তখন যদি ঠিক মতো খেলা দেখাতে পারো তবেই আবার নেওয়া হবে। সেই রকম চুক্তিপত্রেই শান্তা সই করে সার্কাসে যোগ দিয়েছিলেন। অতএব তাঁদের যা কিছু জমানো টাকা ছিল সব নিয়ে তাঁরা মাদ্রাজে একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট ভাড়া নিলেন। জায়গাটার নাম তিরুবন মিউর, বাঙালিরা বলে ত্রিভুবনময়ূর—শহরের এক প্রান্তে প্রায় তবু শহরের সব সুবিধেই আছে। ভাড়া অবশ্য বেশ বেশি, কিন্তু হঠাৎ সস্তায় কোথায় আর বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। অতএব বেশি ভাড়াতেই রাজি হতে হল।

দুজনের নতুন জীবন শুরু হল। একজন বাড়িতে থাকেন অন্যজন বাইরে যান চাকরির খোঁজে। আত্মসম্মান বেশি বলে নিজের ভুবনচরার বাড়িতে স্থায়ী-ভাবে বেকার অবস্থায় আসতে চান না। সামান্য কাজ কখনও জোটে, কখনও জোটে না। খরচ হতে থাকে জমানো টাকা। এইরকম সময়ে বিশ্বলালের সঙ্গে পরিচয় হয় এক বাঙালি ভদ্রলোকের। কখনও কখনও কিছুই করবার যখন থাকত না তখন বিশ্বলালবাবু এগমোর স্টেশনে গিয়ে কুলির কাজও করতেন। এই সময় এক ভদ্রলোক এক কুলির মাথায় জিনিসপত্র চাপিয়ে যখন ট্যাক্সি ধরতে যাচ্ছিলেন, যখন ঐ কুলি তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে উধাও হবার চেষ্টা করে। বিশ্বলালবাবু সেটা বুঝতে পেরে দৌড়ে সেই চোর কুলিটাকে ধরে ফেলেন। বাঙালি ভদ্রলোকের নাম অমল সেনগুপ্ত, বৈজ্ঞানিক। তিনি মাদ্রাজের ডি এইচ

নামের একটি ওষুধের কারখানায় মুখ্য কেমিস্ট। প্রতিষ্ঠানটির পুরো নাম ডবলহেলথ। বিশ্বলালবাবুর কথা শুনে অমলবাবুর দয়া হয়। তিনি তাঁকে ওষুধের প্যাকিং ডিপার্টমেন্টে দিনে ত্রিশ টাকা মাইনের কাজে লাগিয়ে দেন। এইভাবে মাস কয়েক কাটার পর বিশ্বলালবাবুকে ঐ ডিপার্টমেন্টেই একটি স্থায়ী কাজে নেওয়া হয়। কাজ হয় শিশির মধ্যে ওষুধ ভরা এবং ক্যাপ লাগানো। কাজটা কঠিন নয়, তবে দায়িত্বপূর্ণ। দৈনিক মজুরির চেয়ে আয় প্রায় দেড় গুণ হয়ে গেল, তা ছাড়া কোম্পানির কোয়ার্টারও পেয়ে গেলেন। ওঁরা অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী তিন বছরের ছেলে অর্জুনকে নিয়ে কয়েক মাস আগে ঐ কোয়ার্টারে উঠে এসেছিলেন।

কয়েক মাস আগে বিশ্বলালবাবু পনের দিনের ছুটি পান। ঐ সময় কারখানায় মেরামতি কাজ চলছিল বলে কাজকর্ম ছিল না, তাছাড়া উনি অনেকদিন কাজ করছিলেন বলে ছুটিও পাওনা হয়েছিল। তিনি স্ত্রী শান্তাকে বলেন, তিনি একবার ভুবনচরায় যাবেন হেস্তনেস্ত করতে। বাবার উপর তাঁর ছিল অসম্ভব রাগ এবং অভিমান। কিন্তু তার চাইতেও বড় অভিমান এবং রাগ ছিল অভিনববাবু এবং তাঁর স্ত্রীর উপর। বিশ্বলালবাবুকে তাঁরা একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। বিশ্বলালবাবু শান্তাকে বলতেন, দাদা তবু একটা মানুষ, মাথাটি খারাপ এই যা, কিন্তু বড়বৌদি, ওরে বাবা। তিনি একেবারে ছদ্মবেশী কেউটে সাপ!

এ সমস্তই বাঘাকাকা জেনে এসেছেন মাদ্রাজ থেকে। তিনি আরও যা জেনেছেন তা যেমন আশ্চর্য তেমনি দুঃখের। বিশ্বলালবাবু পনের দিনের ছুটি নিয়ে ভুবনচরায় যান। সেখানে দু তিন দিন থাকেন। তারপর তাড়াতাড়িই ফিরে যান মাদ্রাজে। ঐ সময় থেকে তাঁর মনের মধ্যে কি রকম অস্থিরতা প্রকাশ পেতে থাকে। দিনরাত হয় ছটফট করেন, নয়তো ঝিম মেরে পড়ে থাকেন। কোনও কথা বললে ঠিকমতো জবাব দেন না। মাঝে মাঝে ক্লাবের লাইব্রেরিতে গিয়ে খবরের কাগজ পড়েন—আগে যা কখনই করতেন না। বাড়িতেও তিনি খবরের কাগজ পড়তেন না। তারপর কারখানার কাজ করবার সময় একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়েন। ডাক্তার তিন দিন বিশ্রাম নিতে বলেন, কিন্তু তাতেও তাঁর অস্থিরতা কাটে না। তবে কাজে যোগ দেন। ঐ সময় একদিন কারখানায় চা খাওয়ার জন্য অন্যমনস্ক হয়ে ক্যান্টিনের দিকে যাওয়ার সময় কারখানারই একটা ছোট ভ্যানের ধাক্কায় আহত হন। ভারী জখম অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। এখনও তাঁর জ্ঞান হয়নি ঠিক মতো। ডাক্তার বলেছেন, হঠাৎ মৃত্যুর ভয় কিছুটা কেটে গেলেও বাঁচার সম্ভাবনাও খুব আছে তাও বলা যায় না। এর মধ্যে অবশ্য শান্তাদেবীকে কর্তৃপক্ষ প্যাকিং ডিপার্টমেন্টেই একটি কাজ দিয়েছেন, ছেলে অর্জুনকে দেখাশোনার জন্য একজন কাজের লোকও কারখানা থেকেই ঠিক করে দেওয়া হয়েছে চিকিৎসার সবরকম ব্যবস্থাই করা হয়েছে।

বিশ্বলালবাবুকে কিটু দেখেনি কখনও, শান্তাকেও নয়। সব কথাই তার শোনা। তবু বিশ্বলালের জন্য তার মন কেমন ভারী হয়ে গেল। শান্তা সম্পর্কে

সে ধারণা করে নিয়েছিল ভারী বদ মেয়ে। কিন্তু তার মনে হল শান্তা বা বিশ্বলাল কেউই মাধবলালবাবুর কাছ থেকে সুবিচার পাননি। যেমন সুবিচার পাননি বিমানবাবু। আবার সমস্ত জীবন ভরে দুঃখ ভোগ করছেন অভিনববাবুও। সবই দেখতে গেলে মাধবলালবাবুরই কীর্তি!

কিন্তু খবরটা, বিশ্বলালবাবুর এই দুর্ঘটনার খবরটা পৌঁছে দেওয়া দরকার ভুবনচরায়। কিট্টুর এই কথা শুনে বাঘাকাকা বললেন, খবরটা ওঁরা পেয়ে যাবেন দুএকদিনের মধ্যে। আমি মাদ্রাজ থেকেই অভিনববাবুকে একটা চিঠিতে জানিয়েছি। তবে আজকালকার যা হাল তাতে চিঠি কবে পৌঁছুবে তা কেউ জানে না।

কিট্টু জিজ্ঞেস করল, তুমি মাদ্রাজে গিয়ে কেমন করে বিশ্বলাবাবুর ঠিকানাটা খুঁজে পেলে?

বাঘাকাকা বললেন, অসুবিধে একটু হয়েছিল ঠিকই। পোস্টকার্ডের ঠিকানায় মাদ্রাজ ৪১ লেখা ছিল, ওটা অনেকটা সাহায্য করেছিল, তা ছাড়া আই জি কলোম এর আসল ব্যাপারটা বুঝতে একটু বেগ পেতে হয়েছিল, প্রথমে ভেবেছিলাম আই জি কলোনি হবে। কিন্তু তা তো আর হতে পারে না, আই জিরা দল বেঁধে কলোনি করবেন তা হয় না। তবে তিরুবন মিউর অঞ্চলে একটু ঘুরতেই আমার বন্ধু কুপু যার কথা আগেই বলেছি, সে একটি জায়গা দেখিয়ে বলল, ঐ পাড়াটার নাম মিগ কলোনি। এটাও আমার বুঝতে একটু অসুবিধে হল। মিগ তো রুশ বিমানের নাম, তাদের আবার কলোনি হয় কেমন করে? অবশ্য কাছে গিয়ে দেখলাম লেখা আছে, মিডল ইনকাম গ্রুপ হাউসিং কলোনি। পোস্টের ছাপে কলোনির জায়গায় কলোম ছাপ পড়েছিল। বিশ্বলালবাবু ঠিকানায় হাউসিং কথাটা লেখেননি, কেন না অনেকেই সেটা লেখা বাহুল্য বলে মনে করেন। সেখানে খোঁজ নিতেই জানা গেল হঠাৎ এক রাতে বিশ্বলালবাবু তাঁর ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যান। কয়েক দিন আগে স্ত্রী পুত্রকে কোথায় রেখে আসেন! সামান্য কিছু জিনিসপত্র যা ছিল তা নিয়ে কাউকে না জানিয়ে উধাও হন। বাড়ি ভাড়া বাকি পড়েছিল ছমাস, নানা দোকানেও ধার হয়েছিল বেশ কয়েক হাজার টাকা। পুলিশকে খবর দেওয়াও হয়েছিল কিন্তু পুলিশ খুঁজে পায়নি বিশ্বলালবাবুকে। তবে ওঁকে ভাল বলতে হবে, শান্তাদেবী বললেন, চাকরি পাওয়ার এক বছর পর ওঁর ব্যাঙ্কের একটা ফিক্সড ডিপোজিটের জমার মেয়াদ শেষে তিনি ধারের সমস্ত টাকা শোধ করে দিয়েছিলেন। না, সেদিক দিয়ে বিশ্বলালবাবুকে ঠিক অসৎ বলা যায় না।

কিট্টু বলেছিল, তোমার মাদ্রাজ যাওয়ার ফলে মাধবলাল হত্যার ব্যাপারটা তা হলে কিছু এগোল না।

না। বাঘাকাকা বললেন, তবে লাভ একটা হয়েছে। বিশ্বলালবাবু যে স্ত্রী শান্তার জন্য কতখানি স্বার্থত্যাগ করেছেন সেটা বুঝতে পারলাম। বলতে পারো আমাদের এই স্বার্থসর্বস্ব পৃথিবীতে কিছু লোক থাকেন যাঁদের জন্য পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সার্থক বলে মনে হয়। বিশ্বলালবাবু হলেন সেই বিরল

জাতের একজন। ওঁর সঙ্গে আমার কয়েক মিনিট দেখা হয়েছে। দেখা হয়েছে, কিন্তু কথা হয়নি। তিনি ভুল বকছিলেন, অনেক কথা বলছিলেন। দু'একবার··· বাবা··· বাবা··· বাবাকে··· বাবাকে··· আমি এই কথাই নাকি তিনি বার বার একটু জ্ঞান হলেই বলতেন। ঠিক মতো কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না। তবে ভেবে দ্যাখো, তাঁর জীবনটা কীভাবে কেটেছে। একটি নারীর প্রেমের জন্য তিনি তাঁর পিতার আশীর্বাদ এবং ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হলেন এটা কম কথা নয়।

কিটু বলল, কিন্তু একটা কথা বাঘাকাকা, তিনি সম্পত্তি চাননি এমন তো নয়। তিনি মাঝে মাঝে টাকাও নিতেন। কয়েক মাস আগে এসে বাড়িতে হামলা করেও গেছেন! বাড়িতে দুশো সাপ ছেড়ে দেবেন এমনও ভয় দেখিয়ে গেছেন!

বাঘাকাকা জোরে হাসলেন, তিনি বললেন, যিনি বলতে পারেন দুশো সাপ বাড়িতে ছেড়ে দেবেন তিনি কিছুতেই মতলববাজ প্যাঁচালো লোক হতে পারেন না। সরল লোকেরাই এমন শিশুসুলভ হুমকি দিতে পারে।

—তা ঠিক। কিটু বলল, তোমার এই মাদ্রাজ ভ্রমণ শিলিগুড়ি ভ্রমণের মতোই বৃথা গেল বলে মন খারাপ হচ্ছে না?

বাঘাকাকা বললেন, তা একটু একটু মন খারাপ হচ্ছে না তা নয়। দু দুটো অনুমান ফস্কে গেল। আর মাত্র একটা কর্ম বাকি আছে।

—ইস্টার্ন হোটেলের ১২১২ নম্বর ঘর?

বাঘাকাকা বললেন, ওটা স্রেফ আন্দাজি ব্যাপার। তবু চেষ্টা করতে হবে। কাল রাতে রিচার্ডসনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। ওঁকে ভাল করে বুঝিয়ে বলতে হবে। কিটুবাবু, আমার মনে হয় যদি তুমি আফজলবাবুকে নিয়ে যাও তাহলে আরও ভাল হয়। একজন সাংবাদিকের কথা হয়তো সায়েব মশাই শুনতে পারেন।

পরদিন রাত নটায় কিটু ইস্টার্নে ফোন করবার প্রায় একুশবার চেষ্টা করল, কিন্তু একবারও তার চেষ্টা সফল হল না। সে আফজলের খবরের কাগজের গাড়িটা পেয়ে গেছে। সঙ্গে আফজল এনেছে সম্পাদক মশাইয়ের একটি চিঠিও। তারা তাড়াতাড়ি ইস্টার্ন হোটেলে যখন গেল তার ঘণ্টা দুয়েক আগেই রিচার্ড-সন সায়েব এসে ভ্রমণক্লান্তি কাটানোর জন্য একটু হুইস্কি পান করছিলেন। কিটু নিজের পরিচয় রেসেপশন থেকেই দিয়েছিল, বলেছিল আফজলের কথাও। হাসিখুশি, সহযোগিতার কথা, ভদ্রতা, সৌজন্য প্রকাশ সবই হল, কিন্তু কাজের কাজ হল না। সায়েব কেবলি বলেন, না, ঘরে অন্য লোক রাখা আদৌ সম্ভব নয়। তখন কিটু প্রস্তাব করল সে বেয়ারা সেজে মাঝেই মাঝে ঘরে আসবে, বিশেষ করে সন্দেহজনক ব্যক্তি কাউকে দেখলে রিচার্ডসন সাহেব যদি একটা ঘণ্টা বাজান তা হলেও তো আরও চমৎকার হয়, কিন্তু রিচার্ডসন সায়েব যদি বা রাজি হলেন, ম্যানেজার মশাই বললেন, আপনাদের আমি সাহায্য করতে পারি, কিন্তু মশাই এভাবে নয়। আমাদের নিজস্ব বেয়ারারা ভারী গোলমাল করবে। এরপর কিটু প্রস্তাব করল টেলিগ্রাফ পিওন সেজে এলে ম্যানেজারের বা রিচার্ডসন সায়েবের আপত্তি আছে কি না। এ ব্যাপারে গেলে কারুরই আপত্তি নেই, কিন্তু

ম্যানেজার হেসে বললেন, কাল থেকে তো টেলিকমিউনিকেশন কর্মীদের ধর্মঘট শুরু, অতএব টেলিগ্রাফ পিওন ঘরে ঢুকলে সেটা হবে রীতিমতো সন্দেহের ব্যাপার।

আফজল বলল, টেলিকমিউনিকেশন স্ট্রাইক ? কে বলল ?

ম্যানেজার মশাই বললেন, কাগজে পড়েছি আজই।

—কোন্ কাগজ ?

ম্যানেজার বললেন, গণপ্রভাত !

আফজল লজ্জিত হয়ে বলল, তাই নাকি ?

—তাহলে ডাক্তার ? কিটু বলল, যদি রিচার্ডসন সাহেব কিছু মনে না করেন তাহলে সন্দেহজনক কেউ এলে তিনি অসুস্থতার ভান করে রেসেপশনকে একজন ডাক্তার ডেকে দিতে বলবেন, আর কিটু একটা ডাক্তারি ব্যাগ হাতে করে ঐ ঘরে যাবে। দরজার বাইরে বাঘাকাকা আর আফজল থাকবেন।

রিচার্ডসন সায়েব আর ম্যানেজার মশাই দুজনেই এই প্রস্তাবে বিশেষ আপত্তি করলেন না, যদিও রিচার্ডসন সায়েব বললেন, এ ব্যাপারে কোনওরকম পাবলিসিটি তিনি চান না। তিনি ব্যবসায়ী মানুষ, ঘড়ি বেচা আর কেনা তাঁর ব্যবসা। কলকাতা তাঁর কাছে সোনার খনির মতো। বছরে একবার আসেন আর অন্তত কুড়িটি জাতঘড়ি তিনি সংগ্রহ করেন। তাঁর কোনও ক্লায়েন্ট ঘড়ি বেচতে এসে পুলিশের হাতে ধরা পড়বেন এটা জানাজানি হলে তাঁর ব্যবসার অসুবিধে হতে পারে।

আফজল ভাবল, সৎ কোনও লোককে তো ধরা হচ্ছে না, অসৎ লোককেই ধরার কথা—আসলে সায়েব মশাই নিজের বেআইনি কাজ করেন, চোরাই ঘড়িও কেনেন। অথচ দেখে শুনেও কিছু করা যায় না। এই দেশ থেকে কত সম্পত্তি এইভাবে বিদেশে চলে যাচ্ছে।

ঠিক হল পর পর দু-দিন কিটু বাঘাকাকা এবং আফজল হোটেলের রেসেপশনে বসে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে নজর রাখবে অতিথিদের উপর। ডাক্তার হালদারের চেহারা সম্পর্কে তাদের একটা আন্দাজ হয়েছে, একটু মোটা সোটা, রং ফরসা, কপালে কাটা দাগ, পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির মত উঁচু।

প্রথম দিনটায় সব সমেত তেইশ জন ১২১২ নম্বর ঘরে গেলেন, বেরুলেন। কোনওরকম কিছুই ঘটল না। ওরা সবাই হতাশ হয়ে গেল। পরদিন হোটেলে ওদের পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে গেল, ট্রাফিক জ্যামের জন্য। রেসেপশনে এসে শুনল ইতিমধ্যে দু'জন ওপরে গেছেন। কেউ বেরুননি। রিচার্ডসন সায়েব কোনও ডাক্তার চাননি।

ওরা বসে আছে। এমন সময় ওরা দেখতে পেল রেসেপশনের দিকে এগিয়ে চলেছেন, আরে ইনি যে সেই অভিনব আচার্য মশাই। প্রায় আগাগোড়া শালে দেহটাকে জড়িয়ে রাখলে কি হবে, তাঁর লাঠিটাও চেনা, আর তাঁর খোঁড়া অবস্থায় হাঁটার বিশেষ ভঙ্গি তো আফজল আর কিটুর পরিচিত। রেসেপশন থেকে বেরিয়ে তিনি ধীরে ধীরে লিফটের দিকে গেলেন। হাতে একটা ঝোলা। বোঝা

গেল ওতেই রয়েছে সেই অমূল্য রতন। বাঘাকাকা বললেন, একদম গোলমাল হুড়োহুড়ি ধস্তাধস্তি করবে না। তোমরা দাঁড়াও, আমি দেখি অহিংস উপায়ে কিছু করা যায় কি না। না কিটুবাবু, তুমি ব্যাগে রাখা পিস্তলে হাত দিও না। খোঁড়া লোক পালাবেন না, কারণ পালাতে পারবেন না। বলে তিনি দ্রুত গিয়ে লিফটের সামনে দাঁড়ালেন। কিটু আর আফজল লক্ষ করল লিফটে চড়ার পর বাঘাকাকা অভিনববাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে কিছু বলছেন। তারপরই লিফট উপরে চলে গেল। মিনিট তিনেক পর ঐ লিফটটা নেমে এল, অভিনববাবুকে তখন দেখাচ্ছে উদ্‌ভ্রান্ত। তিনি বলছেন, আমার ঘড়ি আমি বেচব, তাতে কার কি? আপনি কে?

বাঘাকাকা বললেন, আজ্ঞে আমরা আপনাদেরই পারিবারিক আদেশ পালন করছি।

—পারিবারিক আদেশ?

বাঘাকাকা বললেন, হ্যাঁ পারিবারিক আদেশ। আপনারা মাধবলাল আচার্য'র হত্যার ব্যাপারে সত্য উদঘাটন করার জন্য যাঁকে বলেছিলেন তিনি এখানেই আছেন, 'এসো কিটুবাবু! কিটু আর আফজল অন্য দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছিল। তারা দু'জনেই একসঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল।

—আপনিই আপনার পিতা মাধবলাল আচার্যকে হত্যা করেছেন। আপনাকে আমরা পুলিশের হাতে দেব!

—আমি? আমি খুন করেছি আমার বাবাকে? আমি? বলতে বলতে অভিনববাবু অকস্মাৎ জ্ঞান হারিয়ে পড়লেন। ওরা বলল, ডাক্তার—একজন ডাক্তার! একটু জল। বাঘাকাকা বললেন, কিটুবাবু তুমি ওঁর থলেটা কাছে রাখো যত্ন করে, ওটাতেই···। কিটু ঘাড় নাড়ল। অভিনববাবুর ঝোলাটা নিতে গিয়ে দেখল জ্ঞান হারালেও তিনি দু'হাতে বেশ শক্ত করে ধরে রেখেছেন থলেটিকে। অনেক কষ্টে তাঁর হাত থেকে থলেটাকে উদ্ধার করা হল। মুখে চোখে জল দিতেই অভিনববাবু বললেন, আমার থলে, আমার থলে।

—ওটা ঠিক আছে। আপনি ভাববেন না।

—আমার মাথা ঘুরছে। গা গুলোচ্ছে। অভিনববাবু বললেন। তারপর এলিয়ে পড়লেন আবার।

আফজল গাড়ি নিয়ে এল। ওরা ধরাধরি করে নিয়ে গেল কিটুর বাড়িতে। সঙ্গে আফজলও রইল। বাঘাকাকা ওঁদের পাড়ার ডাক্তার মহিমবাবুকে ডেকে আনলেন। মহিমবাবু সবে হাসপাতাল থেকে ফিরেছেন। মহিমবাবু অভিনববাবুকে পরীক্ষা করে বললেন, হার্ট খুব সবল নয়। একটা ইনজেকশন এখনই দিচ্ছি। গরম দুধ খাইয়ে ঘণ্টা কয়েক বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবেন। একটা ট্র্যাংকুইলাইজারও দিচ্ছি, দু'টো ট্যাবলেটই যথেষ্ট।

অভিনববাবুকে কিটুদের বাড়ির একটা ঘরে খাটের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছিল। আফজল বলল, ডাক্তারের কাজ হয়ে গেল, এবার পুলিশে খবর দিতে হয়।

বাঘাকাকা বললেন, অভিযোগটা কি ?

আফজল বলল, অভিযোগ দু'টো। এক নম্বর হল বাবাকে খুন করেছেন অভিনববাবু। এটা সবাই জানে, অভিনববাবুর সঙ্গে তাঁর বাবার সদ্ভাব ছিল না। দু'জনেই দু'জনের উপর চটা ছিলেন। মোটিভ ? মোটিভ হচ্ছে ম্যাক-এব ঘড়ি, যার দাম পনেরো লাখ টাকারও বেশি। দু'নম্বর হল তাঁর বাবার ঘড়ি বিদেশিকে বিক্রি করার চেষ্টা।

বাঘাকাকা বললেন, কোনটাই ধোপে টিকবে না। খুনের কোনও প্রমাণ নেই। আর বাবার ঘড়ি বেচার অধিকার ছেলের থাকেই। তবে অন্য ছেলে মেয়েরা এঁর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন। কিন্তু সেটা পুলিশের দ্রষ্টব্য নয়। বরং একজন ভদ্রলোককে মানহানি, বলপূর্বক অপহরণ, বন্দি করা, মারধোর করা এই সব অভিযোগ থেকে আমরাই বোধহয় রেহাই পাব না।

—মারধোর ? আফজল অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, মারধোর আবার কখন করলাম ?

—করনি তো ? বাঘাকাকা বললেন, সে তো আমি জানি করনি, তুমি জানো করনি, কিট্টুবাবু জানে করনি, কিন্তু যখন উকিল মশাই গম্ভীরভাবে এর সঙ্গেও খুনের চেষ্টার কথাটা যোগ করবেন তখন ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে ?

আফজল ভয়ানক ভয় পেয়ে গেল। বলল, বুঝতে পারছি একটা ভুলই হয়ে গেছে আমাদের।

বাঘাকাকা ব্যাপারটা লঘু করবার চেষ্টা করলেন, বললেন, অত ভেবো না। আমরা ভুল কিছু করিনি। আমরা আমাদের পরিচিত অসুস্থ ব্যক্তিকে বাড়িতে এনেছি, ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করিয়েছি। এরপর তাঁকে বাড়িতেও ফেরত দিয়ে আসব।

—কিন্তু ওঁকে খুনি বলে পুলিশকে ধরিয়ে দেব না ? কিট্টু প্রশ্ন করল।

—ঠিক তাই। আমাদের এই সন্দেহের ফলে পুলিশ যদি এক নিরপরাধ ব্যক্তিকে ধরে সেটা ভারী বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে।

—নিরপরাধ ব্যক্তি ! কিট্টু বলল, ইনি নিরপরাধ ?

বাঘাকাকা বললেন, বলছি তো, ইনি ওঁর বাবাকে খুন করেছেন তা প্রমাণ না করতে পারলে আমাদের কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দিতে হতে পারে। এটা একটা সহজ সরল কথা। এটা কিট্টুবাবু, তোমার অজানা থাকবার কথা নয়। আফজলবাবু, খবরের কাগজের রিপোর্টারদের এ কথাটা ভাল করেই জানতে হয়।

দু'জনেই এতে লজ্জা পেয়ে গেল।

কিট্টু প্রশ্ন করল, তা হলে আমাদের কর্তব্য কি ?

বাঘাকাকা মৃদু হেসে বললেন, সত্য অনুসন্ধান করা। এঁকে মানে মানে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া, এবং এঁর বিরুদ্ধে নতুন করে প্রমাণ সংগ্রহ করা। অর্থাৎ যাকে বলে সন্দেহের কাঁটা ওঁর দিকেই নির্দেশ করছে প্রবলভাবে, তখন ওঁকেই হত্যাকারী ভেবে নিয়ে এগোলে কাজটা সহজ হয়ে আসবে। এতদিন আমাদের

কাছে কোনও সত্যিকারের সন্দেহভাজন ব্যক্তি ছিল না, সেই নতুন সাধু এবং নার্স রাধাময়ীর ব্যাপারটা অবশ্য রহস্যজনকই। অভিনববাবুই আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় সন্দেহজনক ব্যক্তি, ইনি ঘড়ি গায়েব করে গোপনে বিক্রি করতে এসেছিলেন এটাই একটা বড় প্রমাণ ওঁর বিরুদ্ধে। খুনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও এই ঘটনাটির ফলে সন্দেহ ওঁকেই ঘিরে ফেলে। ওঁর থলেতে কি আছে জানি না। ম্যাক-এর ঘড়ি আছে বলে ধরে নিচ্ছি। কিন্তু একটা ঘড়ি এত ভারী হয় না। সঙ্গে অন্য কিছুও আছে হয়তো।

—খুলে দেখি? কিটু প্রশ্ন করল।

—মোটেই না। বাঘাকাকা বললেন, ওঁর থলের ভেতরে একটা কাপড় দিয়ে মোড়া প্যাকেট আছে। নতুন সুতো দিয়ে সেলাই করা। ওটা যত্ন করে নিরাপদ জায়গায় রাখতে হবে। এটা অক্ষত অবস্থায় ওঁর হাতে দিতে হবে। ওটা খুললে পরে আমরা ওঁর জিনিস চুরি করেছি বলে একটা অভিযোগ করতে পারেন। মনে রাখতে হবে প্রথমেই ওঁকে হাসপাতালে না নিয়ে আমাদের এখানে আনাটা আইনের চোখে খুব চমৎকার নয়। এর মধ্যে আমাদের মতলব থাকার সম্ভাবনা আদালত গ্রাহ্য করবে না।

কিটু আর আফজল একসঙ্গে প্রশ্ন করল, তা হলে এখন কি করা?

বাঘাকাকা বললেন, উনি একটু সুস্থ হলেই ওঁকে বাড়িতে ফেরত পাঠাতে হবে। আফজলবাবুর গাড়িটা কি পাওয়া যাবে?

আফজল বলল, দেখি চেষ্টা করে। টেলিফোনে কাজ হবে না, আমাকে নিজেই যেতে হবে একবার অফিসে, শৈলেনবাবুকে বলে কয়ে ব্যবস্থা করতে হবে।

বাঘাকাকা বললেন, চট করে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। একটা ওমলেটের সঙ্গে বেক্‌ড বীন দিয়ে দু-খানা স্যান্ডউইচ করলে মিনিট দশেকের বেশি লাগবে না। তারপর বললেন, ডাক্তার বলেননি, তবে এই ধরনের রোগীর ঘন ঘন জল পান দরকার। সঙ্গে গ্লুকোজ থাকলে ভাল হয়, তবে সেটা দেওয়া যাবে না এখনই, অভিনববাবুর ডায়েবেটিস থাকতে পারে। ভাল হয় লেবুর রস—

বাঘাকাকা ব্যবস্থা করতে গেলেন। কিটু আর আফজল বসে রইল। খাওয়ার পর বেশ বড় বড় কাপে করে ভাল চা-পান করার পর ওদের মনে হল, বাঃ এই-রকম সহজ খাদ্য মাঝে মাঝে তো খেয়ে দেখা উচিত।

কিছুক্ষণ পর আফজল উঠল। বলল, শৈলেনবাবু এসে গেছেন এতক্ষণে। উনি লোক ভাল, তবে আমি এখনও একটা ভালমতো 'স্টোরি' দিতে পারিনি বলে প্রায়ই হুঙ্কার দেন, প্রায়ই খুঁত খুঁত করেন। দেখি চেয়েচিন্তে গাড়িটা রাত দশটা পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব কি না। আমরা এখন থেকে চারটে নাগাদ বেরুলে হবে তো?

বাঘাকাকা বললেন, পাঁচটার আগে নয়। ওঁর বেশ বিশ্রাম দরকার।

কিন্তু ঘণ্টা খানেক পরই অভিনববাবু ককিয়ে উঠলেন। বললেন, আমি··· আমি কোথায়? আমার থলে? কিন্তু তারপরই আবার বেহুঁশ হয়ে পড়লেন।

বাঘাকাকা তাঁকে একটা ছোট্ট কাপে করে কমলালেবুর রস খাইয়ে দিলেন।

তারপর ক্লান্তিতে এবং আলস্যে একটা চেয়ারে বসে নিজেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

কিট্টুরও বেশ ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল।

কিট্টুর সবে ঘুম এসেছে, হঠাৎ সে একেবারে চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি চোখে মুছে জল দিয়ে এসে বলল, বাঘাকাকা, বাঘাকাকা !!

বাঘাকাকা চমকে জেগে উঠে বললেন, কি হল কিট্টু বাবু ? কিট্টু বলল, অভিনববাবু এলেন কার সঙ্গে ? ঘুমিয়ে হঠাৎ কথাটা আমার মনে হল।

বাঘাকাকা বললেন, এলেন কার সঙ্গে মানে ? তারপর একটু পর বললেন, বুঝেছি ভুবনচরা থেকে একজন খোঁড়া ব্যক্তি যিনি লাঠির সাহায্য ছাড়া চলতে পারেন না তিনি রিকশ, বাস, ট্যাক্সি করে সঙ্গে বহু লক্ষ টাকার জিনিস নিয়ে একা আসবেন না, তাই তো, তার মানে ওঁর সঙ্গে কেউ ছিলেন ? তিনি কে, এইটেই তো তুমি ভাবছ ?

—ঠিক তাই।

—ঠিক কথাই বলেছ তুমি কিট্টুবাবু। কথাটা খুবই জরুরি। এমন লোক ওঁর সঙ্গে এসেছেন যাঁকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন। যাঁর সঙ্গে এলে কেউ সন্দেহ করবে না। কিন্তু ভারী আশ্চর্য, তাঁকে আমরা তাঁর সঙ্গে দেখিনি। কিন্তু কেউ নিশ্চয় তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এ একটা কথার মতো কথা। আমার এটা একবারও মনে হয়নি।

ঘণ্টা দুয়েক পরে পাশের ঘর থেকে গোঙানির আওয়াজ শোনা গেল, এ আমি কোথায় ? আমার থলে···আমার থলে···ও ডাক্তার, ও ডাক্তার এ আমি কোথায় ?

তাড়াতাড়ি কিট্টু অভিনববাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বাঘাকাকাও এসে একটা চেয়ারে বসলেন। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আবার অভিনববাবু কঁকিয়ে উঠলেন। বাঘাকাকা তাড়াতাড়ি আরও একটু কমলালেবুর রস তাঁর মুখে ঢেলে দিলেন। অভিনববাবু বলে উঠলেন, আমার থলে···থলে। বলে হাত বাড়ালেন। হাতটা কাঁপতে কাঁপতে বুকের উপর পড়ে গেল। বাঘাকাকা বললেন, থলে আমাদের কাছে আছে। কোনও ভয় নেই। আপনি ভাল জায়গাতেই আছেন। আপনাকে ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছেন আপনার হৃৎপিণ্ড দুর্বল, বেশি উত্তেজিত হবেন না। আপনি সাময়িকভাবে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

এবারে অভিনববাবু খাটের উপর বালিশে ভর দিয়ে বসে পড়লেন। বললেন, থলি···থলি···।

বাঘাকাকা বললেন, কিট্টুবাবু, ওঁকে থলেটা দিয়ে দাও। নইলে উনি নিশ্চিন্ত হবেন না। শান্তি পাবেন না।

কিট্টু থলেটা নিয়ে এল। অভিনববাবু থলেটার ভেতরটা দেখে নিয়ে সেটাকে জড়িয়ে ধরলেন। একটু পর বললেন, আপনারা আমাকে ধরেছেন। আমার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ এনেছেন। আমি সজ্ঞানে বলছি আমি মনে মনে বহু-

বার বাবাকে খুন করার কথা ভেবেছি। একবার নয়, হাজার বার। হাজার বার নয়, লক্ষ বার। তাঁকে দেখলেই, তাঁর কথা ভাবলেই আমার বিরক্তি হত। তিনি খুন হওয়ায় আমি সত্যি খুশি হয়েছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি তাঁকে খুন করিনি।

একটু সুস্থ হয়েছেন অভিনববাবু।

বাঘাকাকা বললেন, আপনি নার্স রাধাময়ীর সাহায্যে আপনার বাবার আলমারিতে রাখা পুরনো ঘড়িটি আর গয়নাগাঁটি সরিয়েছেন, তাই না?

অভিনববাবু বললেন, না না সেটা সত্যি নয়।

—কোন্‌টা সত্যি নয়? বাঘাকাকা প্রশ্ন করলেন, আপনি আপনার বাবার ঘড়ি আর আলমারির দামি গয়নাগাঁটি সরাননি?

—সরিয়েছি। অম্লান মুখে বললেন অভিনববাবু, বেশ করেছি সরিয়েছি।

—আহা আপনি বেশ করেছেন কি না সেটা অন্য কথা, বাঘাকাকা বললেন আপনি সরিয়েছেন গয়নাগাঁটি।

—নিশ্চয়ই সরিয়েছি। আমার সে অধিকার আছে।

বাঘাকাকা বললেন, কিন্তু কেন সরালেন?

অভিনবাবু বললেন, পারিবারিক সম্পত্তি রক্ষা করতে। ওঁর যা স্বভাব, হয়তো দান করতে করতে সব শূন্য হয়ে যেত। তারপর যখন তাঁর উইলে আমাদের কাউকে একটি নগদ পয়সাও দিয়ে যাননি, তখন আমার মনে হল, যেটুকু পারি নিজেদের জন্য সরিয়ে রাখি।

বাঘাকাকা বললেন, কিন্তু এ-সব পারিবারিক সম্পত্তি। আপনি একা এ-সব ভোগ করবেন তাই কি স্থির করেছিলেন?

—কেন করব না বলতে পারেন? অভিনববাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, আর কে বাবাকে দেখেছে? আর কে এই গ্রামে থেকে দুঃখ ভোগ করেছে? বিমান বাড়ি ছেড়েছে, বিশ্বলাল বাড়ি ছেড়েছে, বিনতাও তার দাবি ছেড়ে দেবে বলেছে, নিজের ইচ্ছেয়। তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। এ বাড়ির সম্পর্ক নেই।

—আপনি তা হলে এ কাজ একাই করেছেন?

—হ্যাঁ।

—আলমারির চাবি কোত্থেকে পেলেন?

—একটা ডুপ্লিকেট চাবি করানো হয়েছিল বছর দুয়েক আগে।

—আপনি করেছিলেন সেটা?

—ধরুন তাই।

কিট্টু হঠাৎ প্রশ্ন করল, আপনি কেমন করে জানলেন আপনার বাবার উইলে কি আছে?

অভিনববাবু হাসলেন। বললেন, সেটা ডাক্তার আদিত্য আমাকে আগেই জানিয়েছিলেন।

—অথচ যখন আলমারি খোলা হয় তখন আপনি এঁরই বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন খুনি বলে। বললেন বাঘাকাকা।

অভিনববাবু বললেন, সেটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক ছিল না কি? অভিনয় কেমন চমৎকার হয়েছিল। আপনি দেখলে ভারী খুশি হতেন!

—অভিনয়? কিটু অবাক হল।

—ওই সময় ওটাই স্বাভাবিক ছিল না কি? অভিনববাবু বললেন, আশা করি আপনারা আর সত্যের অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করবেন না, সেটা আপনাদের দ্বারা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। যা সত্যি সেটা আমিই বলে দিতে পারব।

কিটু বলল, আপনার কথা আমি টেপ করে নিতে চাই।

—না। অভিনববাবু বললেন, ঐ সব যন্ত্রপাতিতে আমার আপত্তি আছে। আপনারা সত্য জানতে চান, আমি তা জানাব আমার যতটুকু জানা আছে। আমি আপনাদের যা বলব তার একটি শর্ত থাকবে, সেটি হল আপনারা আর কাউকে সেটা প্রকাশ করতে পারবেন না।

—এই শর্তটা একটু কঠিন! কিটু বলল।

—তা হলে আমি মুখে কুলুপ আঁটলুম।

—ঠিক আছে। কিটু বলল, আপনি বলুন, এ-কথা প্রকাশ পাবে না। কিন্তু আমাদের বন্ধু আফজলকে এটা আমরা জানাতে চাই।

—বাস্‌, হয়ে গেল। অভিনববাবু বললেন, আর তাহলেই গণপ্রভাতের পাঠকবৃন্দের আমাদের পারিবারিক কেচ্ছা জানতে একদিনও লাগবে না।

—না না, তা কেন। কিটু বলল, খবরের কাগজের লোক তো, ওরা সত্য যেমন প্রকাশ করতে পারে তেমনি করতে পারে গোপনও। আপনি এখন সুস্থ বোধ করছেন তো?

—সুস্থ বোধ করতে আরও ভাল করে পারতাম যদি বাবার দামি জিনিসগুলো বেচে কিছু টাকা পেতে পারতাম, কিন্তু আপনারা তা হতে দিলেন না। রিচার্ডসন সায়েব আবার কবে আসবেন জানি না।

—ভয় পাবেন না, কিটু বলল, একজন রিচার্ডসন সায়েব তো নেই এই দুনিয়ায়, বহু সায়েবই এই দেশকে এখন পুরনো সব জিনিসের গুদামঘর বলে মনে করে। ব্রিটিশরা যখন এ দেশ শাসন করেছিল তখন যে সব সূক্ষ্ম আর চমৎকার জিনিস কিনেছিল এ দেশের শয়ে শয়ে রাজা মহারাজা জমিদার, সে ঐশ্বর্য তাদের নিজেদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। এও এক ধরনের শোষণ, তবে এর মধ্যে ব্যবসার ভান আছে। ওরা এখান থেকে যে দামে কেনে ওদের দেশে গিয়ে তার দাম হয়ে যায় দ্বিগুণ, তিন গুণ, এমন কি কখনও আরও বেশি।

—এত? অভিনববাবু বললেন, তা হলে তো, তা হলে তো··· । বলে একটু চুপ করে একটু জল খেয়ে বললেন, তা হলে তো আপনারা কাজটা ভালই করেছেন। এগুলো সরাসরি বিদেশে গিয়ে বিক্রিও করা যায় আর লাভও করা যায় অনেক গুণ। তাহলে এক ঢিলে দুই পাখিও মারা যায়!

—এক ঢিলে দুই পাখি?

—হ্যাঁ। অভিনববাবু বললেন, দুই পাখি নয়, বলতে পারেন তিন পাখি!

—কী ব্যাপার? কিটু প্রশ্ন করল।

অভিনববাবু বললেন, একটা কথা আপনাদের জানাই, আমার এই পা, এই খোঁড়া পা নিয়ে আমি গত প্রায় চল্লিশ বছর ভুবনচরায় আটকে পড়ে আছি। কত কি করব ভেবেছিলাম, করতে পারিনি—ফুটবল ক্রিকেট খেলব ভেবেছিলাম, খেলতামও, ভালও বাসতাম, কিন্তু তা হয়নি। দুটো অপরারেশনেও পা ঠিক হয়নি। এখন নাকি এর একটা নতুন ধরনের অপারেশন উদ্ভাবিত হয়েছে—পৃথিবীর কয়েকটি জায়গায় এটা হয়। কিন্তু বুঝতেই পারছেন আমি, আমার নিজস্ব সামর্থ্য বিশেষ নেই খরচ করার। আমার ভগিনীপতি অশ্বিনী লিখেছে কানাডার মণ্ট্রিয়লে এ রকম অপারেশন করা যায়, সাফল্যের সম্ভাবনা খুব ভালই। কিন্তু খরচ যা হবে তার পরিমাণও কম নয়। প্রায় ছ লাখ টাকা সব মিলিয়ে। এ টাকা আমার নেই। আমার টাকার দরকার সে জন্যই। আপনারা যে আমাকে দামি জিনিসগুলো বিক্রি করতে দেননি সেটা ভাল হয়েছে, কারণ আমি সেগুলো বিদেশে গিয়ে বিক্রি করলে যদি ডবল দামও পাই তাহলেই খরচটা তা থেকে কেবল উঠে আসবে তা নয় অনেক বেশি টাকা দেশেও নিয়ে আসতে পারব। তাহলে এক ঢিলে দুটো পাখি মরল, কেমন? এবার বলি তৃতীয় পাখির কথা, সুস্থ হয়ে উঠবার পর আমি ফিরে এসে দু বছর ধরে যতটা পারা যায় হেঁটে হেঁটে ভারত ভ্রমণ করব। এটাই আমার তিন নম্বর পাখি।

কিটু বলল, আপনাকে একটা প্রশ্ন করব? অবশ্য যদি কিছু মনে না করেন।

অভিনববাবু বললেন, মনে করার স্টেজ অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। আপনারা সকাল থেকে যেরকম ব্যবহার করেছেন সেটা একরকম ছিল, কিন্তু এই যে মোলায়েম ব্যবহার এটা আমার হৃৎপিণ্ডের উপর চাপ দেয়। কি প্রশ্ন করতে চান করুন, আমি প্রস্তুত।

কিটু বলল, ভুবনচরা থেকে আপনি একা আসেননি। সঙ্গে কে ছিলেন?

—ডাক্তার আদিত্য। বলেই তিনি চমকে উঠলেন, বললেন, এহে বড় ভুল হয়ে গেছে। ডাক্তার আদিত্য আমাকে ইস্টার্নে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি পার্ক করে ফিরে এসে রেসেপশনে অপেক্ষা করবেন এই রকম কথা ছিল। আর এর মধ্যে আপনারা··· ।

কিটু বলল, গাড়ি পার্ক করা ভারী শক্ত কাজ ঐ অঞ্চলে, বিশেষ করে অফিসের দিনে। তিনি নিশ্চয়ই এসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ফিরে গেছেন।

—ফিরে গেছেন? বলে অভিনববাবু বালিশে হেলান দিলেন আবার। বললেন, তিনি কি ভাবছেন কে জানে?

কিটু বলল, তিনি যখন হোটেলে এসে দেখবেন আপনি নেই, ওখানকার রেসেপশনিস্টের কাছে যখন শুনবেন একজনকে অসুস্থ অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বাইরে, তখন তিনি বোধহয় পুলিশের কাছে যাবেন।

—পুলিশ? ভীতকণ্ঠে বললেন অভিনববাবু, পুলিশ কেন?

—ঐটেই তো স্বাভাবিক, নয় কি ?

কিট্টু বলল, তা ছাড়া আর কি করবেন তিনি।

—আর পুলিশই বা কি করবে ? বললেন অভিনববাবু।

কিট্টু পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে গেল। বলল, এখন ঐ দুশ্চিন্তা থাক, কেন না করে লাভ নেই। আমি আপনাকে আর একটা প্রশ্ন করছি। আপনি যে বললেন আপনি অভিনয় করছিলেন আপনার বাবার মৃত্যুর পর যেদিন আলমারি খোলা হয়, সেটা কেন তা ঠিক বোঝা গেল না। আপনি লোকের সামনে পুলিশের সামনে ডাক্তার আদিত্যের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ করলেন। সেটা কি ঠিক হয়েছিল ?

—না। অভিনববাবু বললেন, ঐ সময় আমার মাথার ঠিক ছিল না। আমি যে ঘড়ি আর গয়না সরিয়েছি সেটা যাতে কেউ সন্দেহ না করে সে জন্য আমি ঐভাবে চিৎকার করেছিলাম। তবে মাথার ঠিক না থাকলেও যা করেছিলাম তাতে কাজ হয়েছিল। পুলিশ যদি একটু বুদ্ধি করে বাড়িটা সার্চ করত তা হলে আমারই শোয়ার ঘরের বইয়ের আলমারির ভেতরে জিনিসগুলি পেয়ে যেত। পরে অবশ্য আমি ডাক্তার আদিত্যকে ক্ষমা প্রার্থনা করে চিঠি পাঠিয়েছি। তিনিও তা মেনে নিয়েছেন, আমাদের বাড়িতেও এসেছেন। আসলে ওঁর একটা মনের জোর আছে, কারণ সেটা তাঁর চরিত্রের জোরের জন্যই সম্ভব হয়েছে। অসাধারণ সৎ লোক তিনি। ওঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। কেবল আমি বা আমরা নই, সমস্ত গ্রামবাসীই তাঁকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি।

ঠিক এমনি সময়ে রাস্তায়, বাড়ির ঠিক সামনে গাড়ি থামার আওয়াজ হতেই বাঘাকাকা উপর থেকে সুইচ টিপে দরজা খুলে দিলেন। বললেন, আফজলবাবুর গাড়ি।

আফজল উপরে এসে বলল, সব রেডি তো ? একটু পরেই ডাক্তার আদিত্য আসছেন।

—ডাক্তার আদিত্যকে কোথায় পেলে ? কিট্টু প্রশ্ন করল।

—আমি অফিসে যেতেই দেখি উনি আমার জন্যই অপেক্ষা করছেন। এই বাড়িতে ফোনেরও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু টেলি-যোগাযোগ হয়নি। আমি যেতেই তিনি বললেন ভারী সর্বনাশ হয়ে গেছে আফজল··· । আর আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, অভিনববাবুকে কে বা কাহারা ইস্টার্ন হোটেল থেকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে, এই তো ? তারপর আমি সব কথা বলাতে উনি নিশ্চিন্ত হলেন, বললেন, দু-একটা কাজ সেরে এখানেই আসবেন ছটা নাগাদ।

ডাক্তার আদিত্য কয়েক মিনিট পরই এসে পড়লেন। অভিনববাবুকে পরীক্ষা করলেন কোনও যন্ত্রপাতি ছাড়াই। স্টেথোস্কোপের অভাবে বুকে কান দিয়ে আওয়াজ শুনলেন, পিঠে আঘাত করলেন, চেয়ারে বসিয়ে ডান পায়ের হাঁটুতে পেপারওয়েট দিয়ে আঘাত করলেন, নাড়ি দেখলেন, জিভ দেখলেন, চোখ দেখলেন, তারপর, হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিক, আর সব ভালই। তবু আজ যদি এখানে বিশ্রাম নিতেন তো ভাল হত।

অভিনববাবু বললেন, কিন্তু এঁরা কি আমাকে এখানে থাকতে দেবেন ?

তারপর উত্তেজিত হয়ে বললেন, না না সে হয় না। বাঘা…বাঘা…।

বাঘাকাকা বললেন, আমাকে কিছু বলছেন ?

—না। লজ্জিতভাবে বললেন অভিনববাবু, বাঘা, মানে আমাদের বাড়ির, ইয়ে কুকুরের নাম।

—তা তার কথা হঠাৎ মনে হল কেন ? কিটু বলল।

—আহা, ওর যে এখন নেশার সময়। রোজ টানে।

—রোজ টানে। রোজ কি টানে।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, ঐ ওঁদের কুকুর, আর আমার একই স্বভাব। আমরা একইভাবে চিন্তা করি। গ্রেট মেন থিংক অ্যালাইক। তারপর হেসে বললেন, বাঘাকে মাঝে মাঝে আমার মানুষ বলেই মনে হয়। এমন রাম-ভক্ত জীব আমি দুটি দেখিনি। আবার হাসলেন ডাক্তার আদিত্য। বললেন, আমারও অবিলম্বে ভুবনচরায় ফেরা দরকার। আমি রামভক্ত নই, আমি জিনভক্ত। গুঁই মশাই এসে বসে থাকবেন। তাহলে এক কাজ করুন। অভিনববাবু, আপনি এখানে ইচ্ছে করলে থাকতে পারেন, এঁরা অবশ্য যদি আপত্তি না করেন।

কিটু বলল, কিছু আপত্তি নেই, কিছু আপত্তি নেই। অভিনববাবু বললেন, আমি আপনাদের কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ। আমি ডাক্তার আদিত্যকে কেবল একটা অনুরোধ করব। আপনি যদি দয়া করে আমাদের বাড়িতে গিয়ে আমার দেরাজ থেকে রামের বোতল বের করে আউন্সখানেক রাম বাঘাকে দেন তাহলে ও বেঁচে যায়, আমিও নিশ্চিন্ত হই। সঙ্গে একটু জল মিশিয়ে দিতে পারেন।

—নিশ্চয় নিশ্চয়। বললেন ডাক্তার আদিত্য, আমি বাঘার কষ্ট বুঝি। আমি আপনার বাড়িতে তাহলে বলব আপনি আগামীকাল বিকেলের দিকে বাড়িতে ফিরতে পারেন। কাল আমিও আসতে পারি হয়তো। আজ একটা কাজ শেষ করতে পারিনি।

ডাক্তার আদিত্য একটা ওষুধের নাম লিখে দিয়ে চলে গেলেন। রাত্রে অভিনববাবুকে সেটা খাওয়াতে হবে। বাঘাকাকার মুখে দেখা গেল চমৎকার এক হাসি। ওঁর নামের সঙ্গে কুকুর বাঘার নামের মিলই তার কারণ বলে কিটুর মনে হল।

কিটু আফজলকে সব কথা বলল। আফজল বলল, চিফ রিপোর্টার শৈলেনবাবু বলছিলেন এই কাহিনী নিয়ে একটা ধারাবাহিক লেখা লিখতে, মানে পর পর চারদিন। লোকেরা খুব খাবে।

কিটু এই ভাষাটা বোঝে। লোকেরা খাবে—খবরের কাগজের কর্মীদের ভাষায় এর অর্থ হল লোকেরা খুব খুশি হবে, পড়বে আর তারিফ করবে।

কিটু বলল, এখনও ডাক্তার আদিত্য সন্ধেবেলার অভ্যেসটা ছাড়েননি মনে হচ্ছে। উনি বোধহয় দু বছর মদ না খেয়ে থাকার ব্যাপারটা ভুলে গেছেন।

—ভোলেননি। অভিনববাবু বললেন, উনি কেয়ার করেন না। তারপর একটু হেসে বললেন, উনি ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।

কিন্তু কিট্টুর মনে হল, তা যদি হবেন তাহলে মিহিরের মদ খাওয়ার ব্যাপারে উনি চটে উঠেছিলেন কেন? মিহিরের মদ খাওয়াও তো ব্যক্তি স্বাধীনতার পর্যায়েই পড়ে।

অভিনববাবুর কথা তখনও শেষ হয়নি, তিনি বললেন, হাসপাতাল গড়ে তোলার জন্য আমিই ওঁকে সাহায্য করব বলেছিলাম। বাবার টাকার কোনও দরকার নেই, আমি বলেছিলাম ঘড়ি আর দামি গয়না বিক্রি করে যা পাওয়া যাবে, আমার চিকিৎসার খরচের পর যা থাকবে তার একটা মোটা অংশই আমি তাঁকে দেব। তা ছাড়া জমি তো দেবই। ডাক্তার আদিত্য অতি মহানুভব ব্যক্তি, উনি টাকার ব্যাপারে একেবারেই ব্যবসাদার-ডাক্তারের মতো নন।

কিট্টু ভাবল, তা ডাক্তার আদিত্যকে তো প্রথমেই ভাল লেগে গিয়েছিল। অবশ্য মাঝে মাঝে তার মনে হয়েছে তিনি দু-মুখো! মদ পানের বিরুদ্ধে যিনি লেকচার দেন তিনিই সন্ধেবেলা মদ নিয়ে বসেন, মদ ছাড়া তাঁর চলে না।

একটু পর কিট্টু বলল, একটা ব্যাপারে আমরা কিন্তু ভারি ধাঁধায় পড়ে রয়েছি, এর সদুত্তর না পাওয়া গেলে মিহিরকে সন্দেহমুক্ত করা যাচ্ছে না। ডাক্তার আদিত্যকেও কেউ কেউ সন্দেহ করতে পারে।

—সদুত্তর? কিসের সদুত্তর?

কিট্টু বলল, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন অসুবিধেটা কোথায়। আপনার বাড়িতে সায়ানাইড ঢুকল কেমন করে। কে ঢোকাল? অর্থাৎ অন্য কথায়, হত্যাকারী কে?

অভিনববাবু বললেন, মিহিরবাবুকে সন্দেহ করছে? পুলিশ তো তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে। আর ডাক্তার আদিত্য? ওঁকে পুলিশও সন্দেহ করেনি।

—আপনি তো ওঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন।

অভিনববাবু বললেন, বললাম না ওটা ছিল অভিনয়, আর আমার মাথার ঠিক ছিল না? কিন্তু ভয় নেই, গ্রামের লোক ওঁকে ডাক্তার হিসেবে যতটা ভক্তি শ্রদ্ধা করে মানুষ হিসেবে করে তার চেয়ে অনেক বেশি। অতএব নিশ্চিন্ত থাকুন।

—সত্য তা হলে প্রতিষ্ঠিত হবে না?

অভিনববাবু বললেন, দরকার কি? পৃথিবীতে চোর ছ্যাঁচোড় খুনে গুন্ডাদের কার্যকলাপের বিশদ বিবরণই কি সত্য প্রকাশের একমাত্র ক্ষেত্র? জগতে কি আর কোনও বস্তু নেই? আরও একটু কি উঁচুতে যাওয়া যায় না? অপরাধই কি একমাত্র সত্য?

এবারে কিট্টু হঠাৎ দুর্বল হয়ে পড়ল। ঠিক এই কথাগুলোই সে বহুবার ভেবেছে। অনেক দিনই ভেবেছে। সে বলল, সেটা ঠিকই বলেছেন, কিন্তু আপনারও কি মনে হয় না কথাটা? বাড়ির মধ্যে বিষটা আনল কে? যেমন-তেমন বিষ নয়, সাংঘাতিক বিষ?

অভিনববাবু চুপ করে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, মনে হয়না তা নয়, মনে প্রায়ই হয়। কিন্তু ভেবে ভেবে কোনও সমাধানই মাথায় আসে না।

সে জন্য ভাবাই ছেড়ে দিয়েছি।

—আচ্ছা আপনি রাধাময়ী নার্সকে সন্দেহ করেন না একবারও? কিংবা সেই নতুন সাধু? দু-জনে একই রাতে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল না? কিছু মনে হয় না আপনার?

—না। ও'রা নিরপরাধ। অভিনববাবু বললেন।

আপনাদের না বলে চলে গেল নার্স, হঠাৎ উধাও হয়ে গেল ভোজবাজির মতো, তার প্রতি আপনার সন্দেহ না হওয়ার কারণ কি বলবেন?

—রাধাময়ী আমাকে তো বলে গিয়েছিল। অভিনববাবু বললেন।

—বলে গিয়েছিল? এবারে ভারি বিস্মিত হল কিট্টু। আফজল একটু দূরে বসে কথাবার্তা শুনছিল, সেও চমকে উঠল।

—হ্যাঁ বলেই গিয়েছিল। সে যাবার কয়েকদিন আগে আমাকে নিভৃতে বলেছিল তার চলে যেতে দুঃখ হচ্ছে খুবই, বাড়িটা তার ভাল লেগেছিল, এমনকি বাবাকেও তার বেশ ভাল লোক বলেই মনে হয়েছিল—এতেই বুঝতে পারবেন মেয়েটি কত ভাল ছিল। বাবাকে যার ভাল লাগে তার বিচারশক্তি হয়তো তেমন পাকা ছিল না, তবে সে খুবই যত্নের সঙ্গে তার কাজ করত। সে বাড়ির অন্য কাজেও সাহায্য করত, যদিও সেটা তার করার কথা নয়। ও চলে যাওয়ায় আমাদের ভারি কষ্ট হয়েছে।

—কিন্তু সে আপনাকে তার চলে যাওয়ার কথা বলেছিল?

—বলেছিল। তারিখটাও বলে দিয়েছিল। বলেছিল সে ৬ই অক্টোবর খুব সম্ভবত চলে যাবে। কিন্তু সে যে অত রাত্রে যাবে, কাউকে না বলে যাবে সেটা আমি অনুমান করতে পারিনি। তা ছাড়া, ৬ই অক্টোবর রাত দশটাতেও যখন সে যায়নি তখন ভেবেছিলাম ঝড় বৃষ্টিতে সে যাওয়া স্থগিত রেখেছে।

—একথা কাউকে আপনি বলেননি?

—না।

—পুলিশকে বলতে পারতেন?

—পুলিশ জিজ্ঞেস করলে তবে তো বলব।

কিট্টু এ-রকম জটিল চরিত্রের লোক আগে দেখেনি। সে হঠাৎ কি বলবে ভেবে পেল না।

কিট্টু প্রশ্ন করল, আপনি ভাল বোধ করছেন তো? চা কিংবা কফি চলবে?

—একটু চায়ের কথা ভাবছিলাম, পেলে মন্দ হত না। বাঘাকাকা চটপট চা করে আনলেন।

কিট্টু বলল, নার্স রাধাময়ী চলে যাওয়ার সময় জিনিসপত্র কিছু চুরি করে নিয়ে গেছে কি?

—নার্স রাধাময়ী? অভিনববাবু একটু তিক্তকণ্ঠে বললেন, নার্স রাধাময়ী আমাদের বাড়ির জিনিসপত্র সরাবে এটা আপনার মনে হল কেন?

এ যে আবার উল্টো জেরা। কিট্টু বলল, না, এমনি ভাবছিলাম। নার্স রাধাময়ী এই চমৎকার বাড়ি থেকে, আপনাদের আশ্রয় ছেড়ে পালাবার একটা

যুক্তিসঙ্গত কারণ আন্দাজ করার চেষ্টা করছিলাম।

—আপনার আন্দাজই সত্য, এইটেই আপনি বলতে চান?

কিট্টু বলল, না তা নয়। তবে কোনও সত্যে পৌঁছনোর আগে অনেক আন্দাজ করতে হয়, অনেক আন্দাজ বাতিলও করতে হয়।

—আপনার এই আন্দাজটা বাতিল করুন। আর একটা জিনিস জেনে রাখুন সে তার জমানো টাকা এবং তার সামান্য কয়েকটা গয়না আমার কাছে রেখে গেছে। বলে গেছে, সব ভালভাবে মিটে গেলে সে এসে ওগুলো নিয়ে যাবে।

কিট্টু ক্রমশ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ছিল। সে প্রশ্ন করল, সব ভালভাবে মিটে গেলে মানে? কি সব ভালভাবে মিটবে?

অভিনববাবু বললেন, বিয়ে। রাধারানীর বিয়ে হলেই সে তার দামি জিনিস সব নিয়ে যাবে। এতদিনে তার বিয়ে হওয়ারও কথা। বিয়ের চিঠিও পেয়েছিলাম, যদিও পোস্ট অফিসের কল্যাণে সময় পেরিয়ে গিয়ে। আমি তার নামে একটা গিফ্‌ট চেক পাঠিয়েছি রেজিস্ট্রি করে।

—তার মানে আপনি তার ঠিকানাও জানেন?

—তা না জানলে আর গিফ্‌ট চেক পাঠালাম কোন ঠিকানায়? বিয়ের চিঠিতেই ঠিকানা থাকে।

—তা বটে। কিট্টু বলল।

—আপনার কাছে রাখা জিনিসপত্র সে নিতে আসছে না কেন?

অভিনববাবু বললেন, একটু স্থিতি হয়ে বসতে পারলেই এসে নিয়ে যাবে। যত দূর আন্দাজ করছি তারা হাওড়ার দিকে একটা বাড়ি খুঁজছে।

—কার সঙ্গে বিয়ে হল? কিট্টু বলল, আপনি তাকে চেনেন?

—হ্যাঁ তা চিনি।

—তিনি কে?

—একজন ডাক্তার।

আবার ডাক্তার! কিট্টু ভাবল। ভুবনচরার আচার্য পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক যাদেরই তারা অধিকাংশই ডাক্তার বা ওষুধের সঙ্গে জড়িত। কিট্টু ভাবল এর মধ্যে কোনও রহস্য নেই, কেউ ইচ্ছে করে এরকম একটা ব্যবস্থা করেনি, কেবল ঘটনাগুলো ঘটে গেছে।

—বিয়ের কথা আগে থেকেই ঠিক ছিল?

—খুব আগে থেকে নয়। বড় জোর মাস তিনেক।

—আপনারাই ঘটকালি করলেন? আফজল প্রশ্ন করল।

—না না। অভিনববাবু জোরে বললেন, আমরা নয়—ওরা নিজেরাই…।

—এই ডাক্তারটি কে? কিভাবেই বা তার সঙ্গে যোগাযোগ হল? তিন মাসের মধ্যে রাধাময়ী কিভাবে বাইরে বেরোতে পারল?

অভিনববাবু বললেন, বাইরে বেরোনোর তার দরকার হয়নি।

—দরকার হয়নি? আফজল বলল, দরকার হয়নি মানে?

—কারণ ডাক্তার মহাশয় বাড়িতেই আসতেন যে।

—কিন্তু তা কি সম্ভব? কিট্টু বলল, ডাক্তার আদিত্য তো বিবাহিত? সুখী পরিবার। তাঁর পক্ষে···।

অভিনববাবু এবার হেসে ফেললেন।

বললেন, উনি ছাড়া কি দুনিয়ায় ডাক্তার নেই?

বাঘাকাকা বললেন, এই ব্যাপার? চমৎকার।

অভিনববাবু বললেন, আপনাদের স্পাই এ সব কথা বার করতে পারেনি বুঝি?

—স্পাই আবার কে? কিট্টু প্রশ্ন করল।

—তাও আমাকে বলে দিতে হবে নাকি? ঐ যে সরমা যাকে আপনারা আমাদের বাড়িতে ঢুকিয়েছিলেন সব কথা জানার জন্য, সে এ সব জানতে পারেনি?

—সরমা? কিট্টু প্রশ্ন করল।

বাঘাকাকা বললেন, ও বুঝেছি সরযু। তা সে যে স্পাই তা আপনারা জানলেন কোত্থেকে?

অভিনববাবু বললেন, অতি সহজেই বুঝেছি। প্রথমে অবশ্য বুঝিনি সেটা ঠিকই, কিন্তু হঠাৎ পাড়াগাঁয়ে যেখানে কেউ প্রাণ থাকতে যেতে চায় না, সে বলে কিনা কলকাতায় তার কাজ করতে ভাল লাগে না, লোকেরা তাকে শান্তিতে থাকতে দিতে চায় না, সেজন্য পালিয়ে এসেছে। তারপর যখন বলল, মাইনের ব্যাপারে তার কোনও বিশেষ দাবি নেই, তখনও সন্দেহ হয়নি। এর পর যখন সে সত্যি সত্যি বাড়িতে কাজ করতে শুরু করল তখন বুঝলাম এ তো ঝিগিরি করতে আসেনি, এসেছে অন্য কোনও মতলবে!

—খুব বুঝি আজে বাজে জিজ্ঞাসা-টিজ্ঞাসা করত?

—না না, অভিনববাবু বললেন, ভারী চুপচাপ মেয়েটি। নীরবে কাজ করত।

—তাহলে কেমন করে বুঝলেন সে স্পাই?

—বললাম তো, চুপচাপ কাজ করত। যা বলা হত তাই করত, অনেক সময় না বললেও কাজ করত—তখন বুঝে নিতে কষ্ট হয়নি যে সে অন্য কোনও মতলবে আমাদের বাড়িতে ঢুকেছে। তারপর যখন শুনলাম গোয়েন্দার উপর ভার পড়েছে তদন্তের তখন এই আর কি দুই আর দুই চার, এইভাবেই সহজ সিদ্ধান্ত করে নিলাম।

তারপরেও আপনি তাকে বিদেয় করলেন না কেন?

অভিনববাবু বললেন, বুঝলাম সে স্পাই, আপনাদেরই সৌজন্যে ওকে আমরা পেলাম। কিন্তু আমার বাড়িতে স্পাইগিরি করে পাবে কি সে যে আমরা বিচলিত হব? তা ছাড়া অত চমৎকার কাজের লোককে খামোখা ছাড়ব কেন?

বাঘাকাকা বললেন, তা হলে খুব যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের মিলন হয়েছে বলতে হবে। রাধাময়ীকে নার্সিং থেকে চলে যেতে হয়েছে, কেননা তার ডিপ্লোমা

ছিল কেবলই কাগজে। কিন্তু ডাক্তার হালদারের ছিল আসল ডিগ্রি, কিন্তু একটা বেআইনি অপারেশন করায় তাঁর প্র্যাকটিস বন্ধ করা হয়েছে সারা জীবনের জন্য। একেবারে রাজযোটক।

অভিনববাবু বললেন, বেআইনি অপারেশন যেটা, সেটা এখন আর বেআইনি নয়। ফলে ডাক্তার হালদারের প্রতি যে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল সেটা বদলানোর জন্য আবেদন করেছিলেন। মনে হয় এর মধ্যে সেটা ফয়সালা হয়ে গেছে। বিচার ডাক্তার হালদারের পক্ষেই যাবে বলে একটা আভাসও পাওয়া গেছে।

কিটু ভাবছিল, এ সমস্ত তথ্য জানার জন্য বাঘাকাকা কত কষ্টই না করলেন! কোনও দরকার ছিল না এসবের। অভিনববাবুকে জিজ্ঞেস করলে তিনিই বলে দিতেন।

অভিনববাবু ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। বাঘাকাকা বললেন, আপনাকে একটু মুরগির সুপ করে দিই, দুটো ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুট দিয়ে খেয়ে নিন। অনেকক্ষণ পেটে বিশেষ কিছু পড়েনি।

অভিনববাবু শুয়ে পড়লেন, পায়ের উপর কম্বল চাপা দিয়ে দিল আফজল।

অভিনববাবু বললেন, থ্যাংকস। এতক্ষণ খিদের কথা মনে ছিল না, কিন্তু সুপের নাম শুনে খিদেটা ভালই চাগিয়ে উঠল।

কিটু, আফজল আর বাঘাকাকা পাশের ঘরে গেল। বাঘাকাকা বললেন, আমাদের জন্যও সুপ করছি, সঙ্গে ওমলেট, কিমা দিয়ে, আর জিরো কেক। বাঘাকাকা বেরিয়ে গেলেন। কিটু বলল, ভারী বোকা বনে গেলাম!

আফজল বলল, অভিনববাবু তো প্রত্যেককেই দারুণ সব সার্টিফিকেট দিলেন। রাধাময়ী অ্যাবাভ সাসপিশন, নতুন সাধু ওরফে ডাক্তার হালদার অ্যাবাভ সাসপিশন, কেবল তাই নয়, ওঁরা সব ভাল মানুষ।

আফজল বলল, তুমি বিশ্বলালের কথা বললে না কেন?

কিটু বলল, অভিনববাবু অসুস্থ। কিভাবে তিনি রিঅ্যাক্ট করবেন, ভেবে কিছু বলিনি। হাজার হলেও নিজের ভাইয়ের এই অবস্থা শুনলে তিনি বিচলিত হতে পারেন, শক পেতে পারেন। আজ ওঁর উপর দিয়ে অনেকগুলো ধকল গেছে।

আফজল বলল, বিশ্বলালের কথা শুনলে খুসিও হতে পারেন উনি। বলা যায় না। ভাইয়ে ভাইয়ে যা সম্পর্ক।

বাঘাকাকা ডাকলেন খাওয়ার ঘরে।

কিটু বলল. একবার কাকিমাকে বোধহয় খবর দিলে ভাল হত।

বাঘাকাকা বললেন, আজ থাক। আজ অভিনববাবু একটু বিশ্রাম নিন। মশারি টাঙিয়ে দিয়ে এসেছি। পাশেই জল রেখেছি। ওঁর জন্য ওষুধও আমি কিনে এনেছি।

আফজল কিটুকে বলল, আজ কথা হচ্ছিল শৈলেনবাবুর সঙ্গে। কথায় কথায় তোমার প্রসঙ্গ উঠল। ওঁরা খবরের কাগজের জন্য একজন রিপোর্টার খুঁজছেন, শিক্ষিত, চটপটে, যে ভাল লিখতে পারে, বয়স বেশি হবে না, বাংলা বানানগুলো

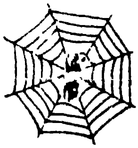
ঠিকমতো লিখতে পারবে, কল্পনাশক্তি আছে, অপরাধ জগতের সঙ্গে পরিচয় আছে। জানই তো আমাদের কাগজ ক্রমশ ক্রাইম রিপোর্টের জন্য জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। যদি তোমার ইচ্ছে হয় যোগ দিতে পার।

কিট্টুর যেন বিশ্বাস হল না কথাটা। বলল, তাই নাকি? অফার বলছ? কিন্তু আমার তো অত গুণ নেই! বাংলা বানান জানি না, চটপটে নই, কল্পনাশক্তিও নেই মিহিরের মতো। তবে কাজটা আমি করতে চাই। গোয়েন্দাগিরি আমার কর্ম নয়।

তারপর বলল, এই কেসটার কথাই ধর না। আমি নিজে কিছুই করতে পারিনি। অন্ধকারের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি। এখনও কিছু পরিষ্কার হল না। সাধু বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে গেল। যার কথা ভাবি আগে প্রত্যেককেই মনে হত সে খুন করেছে, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি তাদের কেউই খুন করেনি।

হঠাৎ বাঘাকাকা বললেন, কালই, কাল সকালেই একবার ভুবনচরায় যেতে হবে। পুলিশ যে সব জিনিস নিয়ে গিয়েছিল আচার্য বাড়ি থেকে সেগুলো সব ফেরত দিয়েছে। এখন সেগুলো আমার একটু দেখা দরকার। একবার দেখা দরকার! আহা, এ কথা আগে মনে হয়নি কেন? আগে মনে হয়নি কেন? আমার মন ক্রমশ কি রকম যেন হয়ে যাচ্ছে।

ভারী উত্তেজিত দেখাচ্ছিল বাঘাকাকাকে।



১৪

পরদিন সকালে হাসপাতাল ডিউটিতে যাওয়ার আগেই মহিম ডাক্তার এসে অভিনববাবুকে পরীক্ষা করে বললেন, সব ঠিক আছে। কাল বোধহয় বিশেষ ধকল গেছে, এখন প্রায় স্বাভাবিক। গাড়ি করে এখনও ওঁকে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। ডাক্তার চলে যেতেই অভিনববাবু বললেন, আমার জন্য আপনাদের অনেক কষ্ট হল, খরচও বেশ হল। এ-সবের জন্য আপনাদের কিছু নিতেই হবে।

কিট্টু বলল, আপনি আমাদের অতিথি। আপনি এ কথা বলছেন কেন? বাঘাকাকা বললেন, তা ছাড়া আপনাকে আমরা জোর করেই ধরে এনেছি।

অভিনববাবু বললেন, সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ, সত্যিই কৃতজ্ঞ। তবে এখানে আমার ভাল লাগলেও আমাকে একটু তাড়াতাড়িই ভুবনচরায় যদি পৌঁছে দিতেন তো ভাল হত।

কিট্টু বলল, সকালবেলাটা বিশ্রাম করে দুপুরে কিছু খেয়ে নিয়ে বিকেলের দিকে আপনাকে ভুবনচরায় পৌঁছে দিতে পারব। আফজল যদি ওর গাড়িটা আনতে পারে তো ভাল হয়।

বাঘাকাকার কিন্তু ইচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভুবনচরায় যাওয়া। উনি কেমন যেন অস্থির হয়ে ছটফট করছেন। যেন ভুবনচরায় তক্ষুনি পৌঁছলেই ভাল হয়।

এরপর দুটো টেলিফোন-কল এল পর পর। বারাসত থেকে ডাক্তার আদিত্য ফোন করে অভিনববাবুর স্বাস্থ্যের কথা জানতে চাইলেন। সব ভাল শুনে বললেন উনি দুপুরের পর গাড়ি নিয়ে আসবেন।

অন্য টেলিফোন-কলটি এল আফজলের কাছ থেকে। খবরের কাগজের গাড়িটা পাওয়া যাবে না, কাল দুটি গাড়ি মেরামতে গেছে, আর ড্রাইভার নন্দগোপাল দাদার বিয়ের জন্য তিনদিন ছুটি নিয়েছে। কিট্টু আফজলকে বলল সে যদি ভুবনচরায় যেতে চায় তাহলে দুপুরবেলা চলে আসে, আর সে যেন তার আহার কিট্টুর বাড়িতেই সমাধান করে। আফজল বলল, দেখা যাক কি করা যায়, বড়বাজারে আরও একটা বড় ভেজালের ব্যাপার ধরা পড়েছে তবে আমি সেখানে ফোটোগ্রাফার নিয়ে যাচ্ছি। পারলে তাড়াতাড়িই ফিরে আসব।

কিন্তু বাঘাকাকা কেবলই উসখুস করতে লাগলেন। বলতে লাগলেন দেরি হয়ে যেতে পারে, দেরি হয়ে যেতে পারে—তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। কি যে হয়েছে কে জানে।

এই কথার কি অর্থ তা কিট্টু বুঝতে পারে না। সে বাঘাকাকার দিকে তাকিয়ে থাকে, দেরি হয়ে যাবে, কিন্তু কিসের দেরি? প্রশ্নটা সে অবশ্য ভাষায় প্রকাশ করল না। কিন্তু কিট্টুর মুখে উদ্বেগ যেন পাকাপাকিভাবে সেঁটে রইল। বাঘাকাকা সেটা লক্ষ করলেন, মনে মনে ভাবলেন কিট্টুকে কিছু বলবেন, কিন্তু বলতে পারলেন না। তিনি নিজেই গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। তারপর

হঠাৎ বললেন, আমি একাই যাব।

—কোথায়, বাঘাকাকা?

—ভুবনচরায়।

—কেন?

—সত্যের সন্ধানে।

—সত্য ওখানে আছে?

—আছে বলেই মনে হয়।

তারপর একটু থেমে বললেন, না না কথাটা ঠিক হল না। ওখানে আছে কি না এখনও জানি না। থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে।

কিটু বলল, ব্যাপারটা কি খুলে বলবে?

বাঘাকাকা রহস্যময় হাসি হাসলেন। বললেন, ব্যাপারটা খুলে বলবারই মতো। খোলারই ব্যাপার এটা।

—খোলারই ব্যাপার, কি খোলার ব্যাপার?

—ওষুধের শিশি!

—বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা।

—আমিও আগে বুঝতে পারিনি।

কিটু বুঝতে পারল বাঘাকাকার কাছ থেকে কথা আদায় করা বেশ শক্তই হবে। সে তখন বলল, একটা কথার জবাব দেবে বাঘাকাকা?

—প্রশ্নটা করেই দ্যাখো না কিটুবাবু।

—আচ্ছা ভুবনচরায় তোমার দুজন শাগরেদ ছিল, তুমি বলেছিলে—একজন সরষু, অন্যজন কে?

—এটা খুব সহজ প্রশ্ন। বিদ্যাচরণ গুঁই।

—বিদ্যাচরণ গুঁই? কিটু অবাক হল। ওঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিল নাকি?

—পরিচয় হয়েছিল একবার—দিন দশেকের জন্য ওঁকে জেল হাজতে থাকতে হয়েছিল, ঐ সময় পরিচয়। ভারী সাত্ত্বিক লোক।

ভারী সাত্ত্বিক লোক। কথাটা ওঁর সম্পর্কে সে আগেও শুনেছে। মদের দোকানের মালিক বিদ্যাচরণ গুঁই সম্পর্কে তাঁর জামাতা রামমোহন ধর বলেছিলেন কথাটা। কিন্তু কেন তিনি সাত্ত্বিক এই কথাটি কিটু জানত না। সে জিজ্ঞেস করল কথাটা বাঘাকাকাকে। বাঘাকাকা বললেন, উনি সাত্ত্বিক লোক কেন জান? তিনি সকালে ঘুম থেকে উঠে দু চামচ গঙ্গার জল পান করেন। আবার রাত হলে ঘুমের সময় আর একবার। এমনকি জেলখানাতেও উনি তাঁর এই অভ্যেসটি ত্যাগ করেননি।

—আচ্ছা উনি জেলে গিয়েছিলেন কেন?

—উনি বারাসতে পথরোধ করবার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলে।

—বারাসতে পথরোধ? কেন পথরোধ?

বাঘাকাকা বললেন, মদ্যপান নিবারণ কমিটির উনি একজন পাণ্ডা। বারাসত

অঞ্চলে উনি মদ্যপান নিবারণের একজন সক্রিয় কর্মীও। একাধারে তিনি পান্ডা এবং কর্মী। কেবল কর্মী নন নেতাও বটে। তিনি এজন্য বেশ টাকাও খরচ করেন।

—অথচ…অথচ…। কিট্টু চুপ করল। সে ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছে না ব্যাপারটা।

বাঘাকাকা বললেন, অথচ ওঁরই একটা মদের দোকান আছে, এই কথাটাই তুমি ভাবছ তো?

কিট্টু বলল, হ্যাঁ। নিজের দোকানটা তা হলে তিনি চালান কেন?

বাঘাকাকা বললেন, এই অঞ্চলে প্রায় ষাটটা দোকান আছে মদের। এগুলির অনেক মালিকই মদ্যপান বন্ধের জন্য আন্দোলন করেন। তুমি ভাবছ বিদ্যাচরণ গুঁই মহাশয়ের এবং অন্যান্যদের মাথা খারাপ—মোটেই নয়। ওঁরা দেখেছেন এবং ভালভাবেই জানেন মদের দোকান বন্ধ করে দিলে মদ বিক্রি অনেক বেড়ে যায়, লাভ বাড়ে চার গুণ।

কিট্টু এই ধরনের কথা শুনেছে আগে, কিন্তু সেটা সে গল্পকথা বলেই মনে করত। বাস্তবেও যে হয় সেটা জানতে পেরে সে স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণের জন্য।

একটু পর কিট্টু বলল, আচ্ছা বাঘাকাকা, মাধবলাল আচার্যের বাড়িতে অন্নদা নামের একজন কাজের লোক থাকেন না? ওঁর বিষয়ে কিছু জানতে পেরেছ?

বাঘাকাকা বললেন, অন্নদামাসি তো? ওঁর কথা কিছুটা জেনেছি। তবে উনি ঠিক কাজের লোক নন।

কিট্টু বলল, শুনেছিলাম উনি কাজের লোক।

বাঘাকাকা বললেন, কাজ করলে তবেই বলা যায় কাজের লোক। কাজ না করলে কি তা বলা যায়?

কিট্টু বলল, কাজ করেন না উনি?

বাঘাকাকা বললেন, উনি ঐ বাড়িতে ষাট বছর ধরে আছেন—না ষাট নয় পঁয়ষট্টি বছর ধরে আছেন। ঐ বাড়িতেই ওঁর জন্ম। ঐ বাড়িরই একজন তিনি। অল্প বয়সে বিধবা হন। নিঃসন্তান এই অন্নদামাসি সকলেরই মাসি। উনি কানে ভাল শুনতে পান না। কাজ করতে চান, কিন্তু কাজ করলে গুলিয়ে ফেলেন, একটু আপন-ভোলা মানুষ। সে জন্য তাঁকে কাজ বিশেষ করতে দেওয়া হয় না। তিনি অবশ্য দিনের অধিকাংশ সময় ঝিমোন।

—কেন?

—তিনি আফিঙ খান। দিনের মধ্যে তিন চারবার তাঁর আফিঙ চাই।

—ওঁর সঙ্গে মাধববাবুর সম্পর্ক ছিল কি রকম?

—খুব ভাল নয়। আবার খারাপও নয়।

—তাহলে অন্নদামাসিও তো ওঁকে খুন করতে পারেন। আফিঙখোর মানুষ হয়তো মাধববাবুর প্রতি রেগে গিয়ে বিষ দিয়ে…।

—না কিটুবাবু না, সেটা সম্ভব নয়। বাঘাকাকা বললেন, সায়ানায়েড বড় দুষ্প্রাপ্য বিষ।

অন্নদামাসির একটা অস্ত্র তো হাতেই ছিল, আফিঙ।

—না, কিটুবাবু, না। অন্নদামাসি ভারী কোমল স্বভাবের। ভারী কৃতজ্ঞ এই বাড়ির লোকজনদের উপর। সকলেই ওঁকে ভালবাসে। তা ছাড়া সত্য এখন অন্য একটা দিক নির্দেশ করছে। আমার তাড়াতাড়ি ভুবনচরা যাওয়া দরকার।

কিটু বলল, সবাই এক সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা পরে গেলে কি সত্য অদৃশ্য হয়ে যাবে?

—যেতে পারে কিটুবাবু, যেতে পারে। কি যে হতে পারে তা তো বলা সম্ভব নয়।

—কিন্তু সত্যটা কোথায়?

বাঘাকাকা উত্তর দেওয়ার আগেই দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। বাঘাকাকা বললেন, সুপ্রিয়া পিসি বলে মনে হচ্ছে?

বাঘাকাকা সুইচ টিপে দিতেই নীচের দরজা খুলে গেল। তারপর পাওয়া গেল সুপ্রিয়া পিসির কণ্ঠস্বর—ওরে তোরা সব ঘুমোচ্ছিস নাকি? চোদ্দবার টেলিফোন করেছি, কেউ ধরলি না? তোদের বাড়িতে কে এসেছে রে? মহিম ডাক্তার আজ সকালে ওঁর প্রেশার চেক করতে গিয়ে বলল। কে যেন এসেছে, কে সেই লোক? কী ব্যাপার?

—সুপ্রিয়া পিসি। কিটু বলল, আমাদের টেলিফোন বাজেনি—।

—তার মানে বাজে টেলিফোন! যাক গে সে কথা—আমি চালের আর চিনেবাদামের গুঁড়ো আর ক্ষীর দিয়ে এক নতুন রকমের সরা পিঠে বানিয়েছি। তোরা খেয়ে নিবি একসময়।

বলে একটা বিরাট ঝোলা থেকে একটা হাঁড়ি বার করে টেবিলে রাখলেন।

কিটু বলল, মিহির কোথায়? সে এই ভারী জিনিসটা নিয়ে আসতে পারত না?

সুপ্রিয়া পিসি বললেন, তবেই হয়েছে আর কি। ওর উপর ভার দিলে হাঁড়িটা চলে যেত বেহালায়। সেখানে তার সব চেলা-চামুণ্ডা জুটেছে—বাড়ি খ্যাদানো সব বুদ্ধিজীবী আর কবিদের তিন দিন ধরে কি সব কাণ্ডকারখানা চলছে, সকালে বেরোয় আর রাত বারোটায় ফেরে। পিঠের হাঁড়ি ওকে দেব, আমি?

কিটু বলল, ওর আজকাল ভারী সুনাম হয়েছে পিসি।

সে কথা কানেই গেল না সুপ্রিয়া পিসির। তিনি বলেই চললেন, হাঁড়ি ফাঁক করে তাতে হাঁড়িয়া বানিয়ে হুলুস্থুল কাণ্ড করত—সেই কারণেই ওকে হাঁড়ি দিইনি, বুঝলি?

—হ্যাঁ সুপ্রিয়া পিসি।

সুপ্রিয়া পিসি বললেন, আমি এখন যাচ্ছি। এ হাঁড়ি ফেরত দিতে হবে না। এটাকে ভেঙে ফেলে দিবি যদি দরকার না থাকে। আর টেলিফোনওলাদের বলে টেলিফোনটাকে ঠিক করে নে।

বলে সুপ্রিয়া পিসি বেরিয়ে গেলেন। তারপরই রিকশার আওয়াজ পাওয়া যাওয়াতে বোঝা গেল তিনি রিকশাকে এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রেখেছিলেন।

পিঠেগুলোকে বাঘাকাকা নানা পাত্রে ভরে ফ্রিজে ভরলেন, বললেন, এখন পিঠে খাওয়ার সময় নয়। দুপুরের খাওয়াটা চটপট সেরে ফেলা দরকার।

আবার দরজায় ঘণ্টা বাজল। বাঘাকাকা বললেন, সুপ্রিয়া পিসি! আবার ?!

দরজা খুলতেই নীচের থেকে আওয়াজ, কিট্টু একবার নীচে আয় তো। একটা কথা জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেলাম রে। তোদের ওখানে যে রয়েছে সে অসুস্থ। কিন্তু লোকটা কে রে ?

কিট্টু বলল, ইনি ভুবনচরার অভিনববাবু। তারপর সংক্ষেপে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল যতটা বলা সম্ভব।

—বাপ! বললেন সুপ্রিয়া পিসি, সাসপেক্ট। শুনে বুঝলি—ওর সঙ্গে মিশিশ নে। নিজে বাবাকে খুন করে মিহিরের উপর দোষ চাপিয়েছে—ওর একটা কথা বিশ্বাস করবি নে। লোকটা খোঁড়া হলে হবে কি—ও ডুবে ডুবে জল খায়। ওকে বাড়ি থেকে যত তাড়াতাড়ি পারিস পাচার করে দে। নইলে হয়তো তোকেই বিষ খাইয়ে মারবে। আর হ্যাঁ—ওকে একটা সরা পিঠেও দিবি নে বুঝলি ? ভারী বিপজ্জনক লোক।

বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই সুপ্রিয়া পিসি বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে এসে গেল আফজল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তারা প্রস্তুত হয়ে রইল ডাক্তার আদিত্যের জন্য। বাঘাকাকা কেবলই উসখুস করতে লাগলেন আর ঘড়ির দিকে তাকাতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত ডাক্তার আদিত্য এলেন বিকেল চারটে নাগাদ। বললেন, রাস্তায় আবার গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অভিনববাবু এখন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তিনি তাঁর থলেটা জড়িয়ে ধীরে ধীরে লাঠি ঠক ঠক করতে করতে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন। কিট্টু, আফজল আর বাঘাকাকাও গাড়িতে বসে পড়ল।

প্রায় সন্ধেবেলা তারা গিয়ে পৌঁছুল ভুবনচরায়।

দরজার সামনে গাড়িটাকে রেখে ওরা বাড়ির ভেতর গেল। দেখতে পেল একজন বৃদ্ধা তাদের দিকে বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে আছেন। চোখ দুটোয় একটু ঘোলাটে ভাব। কিট্টু বুঝতে পারল ইনিই হলেন অন্নদামাসি, এবং চোখের ঘোলাটে ভাবটা এসেছে আফিঙ থেকে।

কিট্টু ভাবল, না ইনি হত্যাকারী হতে পারেন না। কিছুতেই নয়।

বাঘাকাকা বললেন, পুলিশ কাডাইলাম-এর যে তিনটি ওষুধের শিশি নিয়ে গিয়েছিল সেগুলো ফেরত দিয়েছে, সেগুলো কোথায় ?

সে জিজ্ঞেস করল বিনতা দেবীকে।

বিনতা দেবী বললেন, একটা শিশি খালি হয়ে গিয়েছিল সেটা ফেলে দেওয়া হয়েছে।

বাঘাকাকা প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন। ফেলে দেওয়া হয়েছে, কোথায় ?

বিনতা দেবী বললেন, ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে।

বাঘাকাকা বললেন, ওয়েস্টপেপার বাস্কেটটা কোথায় ?

—ঐ তো ওখানে। দেখিয়ে দিলেন বিনতা দেবী। বারান্দার এক পাশে রাখা একটা ওয়েস্টপেপার বাস্কেট। তাতে নানা রকম কাগজের টুকরো, ওষুধের ফয়েল, ছেঁড়া চিঠি এই সব।

বাঘাকাকা ওয়েস্টপেপার বাস্কেটটিকে উপুড় করে ফেললেন। তারপর সেই সব কাগজপত্র হাতড়াতে লাগলেন। একটা হতাশার ভাব তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠল।

তিনি বললেন, নেই। নেই !! সেই শিশি এখানে নেই। আমার সবচেয়ে বড় আশা এবং ভরসা। সবচেয়ে বড় ক্লু। সবচেয়ে বড় প্রমাণ—

কিট্টু বলল, কিসের প্রমাণ ?

বাঘাকাকা তখনও তাঁর ধুয়ো ভোলেননি। তিনি বললেন, সত্যের প্রমাণ।

কিট্টুর মাথায় কিছুই আসছে না। সে চুপ করে রইল। তারপর একটু ভেবে বলল, যে খুন করেছে সে সরিয়ে ফেলেছে হয়তো তোমার সত্যকে।

—না কিট্টুবাবু। খুনির কাজ নয়। বাঘাকাকা বললেন, না না, এটা আমাদের দেরি হয়ে যাওয়ার জন্যই হয়েছে। এই ওয়েস্টপেপার বাস্কেট থেকে কাগজপত্র নোংরা সব ফেলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ হারিয়ে গেছে। ও আর পাওয়া যাবে না।

কিট্টু বলল, পুলিশের কাছ থেকে ওষুধের শিশিগুলো পাওয়া গেছে কাল, তাই না ? তার মানে সঙ্গে সঙ্গে সে-সব ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দেওয়া হয়েছে ?

বিনতা দেবী একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, না—ওষুধের সব শিশি তো ওখানে ফেলা হয়নি। যে শিশিটা একদম খালি ছিল কেবল সেটাই এই বাস্কেটে ফেলা হয়েছে গতকাল।

—কিন্তু সেটাও তো এখানে নেই, বাঘাকাকা বললেন।

—অসম্ভব কথা। বিনতা দেবী জোর গলায় বললেন, সে ওষুধের শিশি এখান থেকে কে সরাবে ? এবং সবচেয়ে বড় কথা, কেন সরাবে ?

—তা হলে সেটা গেল কোথায় ? কিট্টু প্রশ্ন করল।

ইতিমধ্যে অন্নদামাসি সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বললেন, ব্যাপারটা কি—তোমরা সব ফিসফিস করে কথা বলছ কেন ?

ফিসফিস করে কথা ? কিট্টু অবাকই হল। বেশ জোরে জোরেই কথাবার্তা হচ্ছিল এতক্ষণ। তারপরই তার মনে পড়ল অন্নদামাসি ভাল শুনতে পান না।

কিট্টু একটু জোরে বলল, কৌটো পাওয়া যাচ্ছে না।

এমন সময় দাশু এসে হাজির। সে বলল, কিসের কৌটো ?

—বিষের কৌটো পাওয়া যাচ্ছে না ? অন্নদামাসি প্রায় আঁতকে উঠলেন, বিষের কৌটো কে নিয়েছে ? আমার বিষের কৌটো—আমি লুকিয়ে রাখি মাটির তলায়—যাতে কেউ হাত দিতে না পারে। রাত্তিরবেলা আমি খুঁড়ে বার করি

আর একদিনের মতো আফিঙ কৌটো থেকে বার করি যাতে ছেলেপুলেদের বা অন্য কারু হাতে না পড়ে। তা সে বিষের কৌটো পাওয়া যাচ্ছে না? কে সরাল সেটা? বলে হুড়মুড় করে তিনি ছুটলেন একদিকে। তাঁর পেছন পেছন সবাই ছুটল। তিনি একটা ঘরে ঢুকলেন, সেই ঘরেই মিহির সেই ঝড়ের রাত্রে শুয়েছিল। তারপর একটা লোহার লাঠি দিয়ে ঘরের একটা কোণ খুঁড়তে শুরু করলেন। দু তিন মিনিট পর তিনি একটা কৌটো বার করে বললেন, না না কিচ্ছু হয়নি, কৌটো তো এখানেই আছে। আমার আফিঙের কৌটো। এটা তো হারায়নি।

তারপর কৌটোটাকে চেপে ধরে বললেন, না, ওই জায়গাটায় আর রাখা হবে না। সাংঘাতিক বিষ—ছোটদের হাতে পড়লে সর্বনাশ। আমাকে অন্য জায়গায় লুকুতে হবে, কাউকে জানাব না, কোথায়···।

বাঘাকাকা কিট্টুকে বললেন, মিলে যাচ্ছে।

কিট্টু বলল, কী মিলে যাচ্ছে?

বাঘাকাকা বললেন, মনে নেই, মিহিরবাবু কি বলেছিল? সেই ঝড়ের রাতে সে মাটি খোঁড়ার আওয়াজ পেয়েছিল? আমরা ভেবেছিলাম ভুবনচরার সেই বিখ্যাত কালো প্যাঁচার ব্যাপার? যাক একটা ব্যাপার অন্তত পরিষ্কার হল।

আফজল বলল, মেঝেটা অবশ্য নোংরা হল—।

বাঘাকাকা বললেন, কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে ওয়েস্টপেপার বাস্কেট থেকে শিশিটা সরিয়ে ফেলল কে?

আফজল বলল, কেনইবা সরাল?

কিট্টু বলল, তাতে কি এমন ছিল?

বিনতা দেবী বললেন, তাতে কিছুই ছিল না। সম্পূর্ণ ফাঁকা শিশি।

আফজল বলল, ব্যাপারটা দারুণ রহস্যময়।

একটু পর হঠাৎ বিনতা দেবী বললেন, হয়েছে, হয়েছে।

—কী হয়েছে? কিট্টু প্রশ্ন করল।

বিনতা দেবী বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি বোধহয় ব্যাপারটা। দাশু?

দাশু কাছেই কোথায় ছিল, সে বলল, বাবা রে বাবা। আমি একটা খালি শিশি ঐ বাস্কেট থেকে নিয়েছি তার জন্য এত গোলমাল কেন? ফেলে দেওয়া শিশি নিয়ে আমি ডাক্তার ডাক্তার খেলি তো।

—সেটা কোথায়? এনে দাও না লক্ষ্মীটি! বললেন বিনতা দেবী।

দাশু ছুটে গেল। একটু পর সে এনে হাজির করল একটা শিশি। তার মধ্যে গোটা দশেক তেঁতুল বীচি ভরা।

বাঘাকাকা আগ্রহের সঙ্গে শিশিটাকে নিলেন। কার্ডাইলাম-এর শিশি।

তারপর সেটার গায়ে কি লেখা আছে নিবিষ্টভাবে পড়তে লাগলেন।

তারপর সেটাকে পকেটে পুরলেন। বললেন, কার্ডাইলাম-এর এই শিশিটাই কি পুলিশ ফেরত দিয়েছিল?

—হ্যাঁ। বললেন বিনতা দেবী।

—কেমন করে জানলেন ঐ শিশিটাই ? এর আগেও তো এই ওষুধ মাধবলালবাবু খেয়েছেন ?

বিনতা দেবী বললেন, এই শিশিটার গায়ের কাগজ এখনও আছে তো, তাই বুঝতে পারলাম—আগেকার শিশিগুলো দাশু ধুয়ে ধুয়ে একেবারে পরিষ্কার করে রেখে দিয়েছে। নানা ওষুধের শিশি। কেবল এই শিশিটারই ভাগ্য ভাল, এর গা থেকে কাগজ ধুয়ে ফেলেনি।

দাশু গর্বের সঙ্গে বলল, কালই ধুয়ে ফেলব।

—এবার বাকি দুটো শিশি কোথায় একটু দেবেন আমাকে ? বাঘাকাকা বললেন।

বিনতা দেবী বললেন, বাকি দুটো শিশি ? সে তো এখানে নেই। দাদা তো আজই সকালে ও দুটো শিশি নিয়ে গেলেন। বললেন, ডেট ওভার হয়নি। একটা শিশি আস্ত আছে, খোলা হয়নি। আর একটাতে চারটে ক্যাপসুল আছে, দামি ওষুধ—এগুলোকে দোকানে নিয়ে যাই।

—মানে, ওঁর শ্বশুরের দোকান ? বাঘাকাকা বললেন।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, হ্যাঁ। বিমানবাবু ভালই করেছেন। ও ওষুধ আর এ বাড়ির কারু কাজে লাগবে না। নষ্ট করে লাভ কি ?

কিট্টু বলল, কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না। এক একটা শিশিতে থাকে ছটা ক্যাপসুল, কিন্তু একটা ক্যাপসুল মাধবলালবাবু খাওয়ার পর থাকার কথা পাঁচটা ক্যাপসুল। তাহলে একটা ক্যাপসুল কোথায় গেল ?

আফজল বলল, মিহির বোধহয় মাধবলালবাবুকে দুটো ক্যাপসুলই খাইয়ে দিয়েছিল। ঐ সময় মিহিরের তো কাণ্ডজ্ঞান ছিল না তেমন ?

বাঘাকাকা বললেন, না তা হবে কেন ? পুলিশ একটি ক্যাপসুল পরীক্ষা করে দেখেছে অবশ্যই। কিন্তু আমাকে তো এক্ষুনি বারাসতে যেতে হবে ডাক্তার আদিত্য।

—এখনই ? কেন ?

—ভয়ানক দরকার। বিমানবাবুর শ্বশুরের ফার্মাসিতে গিয়ে শিশি দুটো জোগাড় করতে হবে।

বাঘাকাকার কণ্ঠস্বরে এমন একটা ভাব ছিল যে ডাক্তার আদিত্য আর আপত্তি করলেন না। বললেন, আমি একটু বাড়িতে ঘুরে যাব, গুঁই মশাই আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবেন।

এমন সময়—কুকুরের কুঁই কুঁই গলা শোনা গেল। অভিনববাবু বললেন, মাফ করবেন, বাঘাকে একটু রেশন দিয়ে আসি। আমি আর বারাসত যাব না, আপনারাই যান। ডাক্তার আদিত্য সকলকে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসলেন। দু মিনিটের মধ্যেই নিজের বাড়ির সামনে গাড়ি থামালেন।

ডাক্তার আদিত্য বাড়িতে ঢুকলেন, কিন্তু বেরুলেন তৎক্ষণাৎ নয়, অন্তত পাঁচ মিনিট পর। সঙ্গে বিদ্যাচরণ গুঁই। চলে গেলেন গুড বাই জানিয়ে। ডাক্তার আদিত্য মনে হল নিজের প্রতি সামান্য সুরারোপ করেছেন। অভ্যেস যাবে

কোথায়। তিনি বললেন, কিছুতেই কন্ট্রোল করতে পারি না, একটু পেটে ঢালতেই হয়।

গাড়ি ছুটে চলল—অবশ্য ভাঙা, গর্তওয়ালা পথে যতটা জোরে যাওয়া সম্ভব। বিমানবাবুর শ্বশুরের ডাক্তারখানায় বিমানবাবুকে দেখা গেল। বাঘাকাকা তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। তারপর বিমানবাবুকে বললেন, কাডাইলাম-এর শিশি দুটো আছে তো? বিক্রি হয়নি তো?

বিমানবাবু একটু অবাক হয়ে বললেন, কিছু গোলমাল হয়েছে নাকি? এদিকে কাডাইলাম-এর তেমন চাহিদা নেই, ঐ তো আলমারিতে রেখে দিয়েছি। খুব দামি ওষুধ বলে অন্য একটা কম্পানির ওষুধ একটা আছে, সেটা বেশি চলে।

বাঘাকাকা বললেন, ঐ দুটো শিশি আমাকে দিতে হবে।

বিমানবাবু একটু শঙ্কিতভাবে প্রশ্ন করলেন, ঐ ওষুধের কিছু গোলমাল আছে নাকি?

বাঘাকাকা বললেন, সম্ভবত গোলমাল নেই। তবে রিস্ক নেওয়া উচিত নয়। এগুলো আমি নিয়ে যাচ্ছি আপাতত। এর যা দাম তা আমি…।

বিমানবাবু বললেন, না না, তার দরকার হবে না। আপনার দরকার হলে আপনি নেবেন বইকি। কোনও ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করাবেন বোধহয়?

বাঘাকাকা বললেন, না না ল্যাবরেটরিতে নয়।

তারপর শিশি দুটো নিয়ে তার গায়ে লেখাগুলি নিবিষ্ট মনে পড়লেন। তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, যা ভেবেছিলাম তাই, বিশ্বলালবাবুই খুন করেছেন তাঁর বাবাকে।

এ কথা শুনে সকলেই চমকে উঠল।

কিটু ভাবল বাঘাকাকা একটা শিশির ওষুধ নয় কেবল লেখা দেখেই কেমন করে বুঝতে পারলেন বিশ্বলালবাবুই তাঁর বাবাকে খুন করেছেন?

বাঘাকাকা বললেন, যদি ··যদি এই শিশি দুটো, না ঠিক হল না, যদি এই শিশি তিনটের কথা না মনে হত, যদি এই শিশি তিনটে না পেতাম, তা হলে··· তা হলে···। তারপর একটু থেমে বললেন, ব্যাপারটা এখন জলের মত সহজ।



১৫

এর কয়েক দিন পরের কথা।

সুপ্রিয়া পিসির বাড়ি জমজমাট। শেষ পর্যন্ত মিহির সত্যিই নির্দোষ প্রমাণিত, কেননা আসল হত্যাকারী যে বিশ্বলালবাবু সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে। সেই আনন্দে সুপ্রিয়া পিসি একটা আনন্দভোজের আয়োজন করেছেন। এই আনন্দ উৎসবে সকলেই খুশি। বাড়িতে যেন আনন্দের হুল্লোড় পড়ে গেছে। এর মধ্যে মিহিরই কেবল গোমড়া মুখ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার মনের উৎসাহ কোথায় চলে গেছে।·তার বাঘাকাকার উপর দারুণ রাগ। কেন তিনি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে গেলেন। তার রাগ কিট্টুদা আর আফজলদার উপরও। তার রাগ তার মায়ের উপর—কেন তিনি তাকে পুলিশের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করলেন। তার রাগ ডাক্তার আদিত্যের উপরও, কেন তিনি কিট্টুদের অমনভাবে সত্য অনুসন্ধানের জন্য প্ররোচনা দিলেন। এই সত্য কি উদ্ঘাটিত না হলেই চলত না? কার কি ক্ষতি হত সত্যটি উদ্ঘাটিত না হলে? এখন কি হবে? তার ভক্তবৃন্দ যখন জানতে পারবে মাধবলাল আচার্যর হত্যার ব্যাপারে সে কিছুই করেনি, কোনও সু কিংবা কু মতলব তার ছিল না ওই খুনের ব্যাপারে তখন তাকে সকলে কেমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে ভেবেই তার মনটা কেমন ঠাণ্ডা এবং বিষময় হয়ে ছিল। সকলের উপরে তার রাগ থাকলেও তার বাবার উপর রাগ মোটেই হয়নি। উনিই একমাত্র মানুষ যিনি এই একবারই বলেছিলেন তাঁর পুরনো বন্ধু পুলিশের কর্তার কাছে যেতে। বাস। তারপর এত দিনে একটি কথাও তিনি বলেননি। ওর সম্পর্কে খোঁজও নেননি। বাবার এই চরিত্র মিহিরের ভারী ভাল লাগে। বেশ নিশ্চিন্ত ভাব। এই না হলে বাবা! বাবাদের এইরকম হওয়াই উচিত।

এই আনন্দ উৎসবে আসেননি ডাক্তার আদিত্য। আসেননি ভুবনচরার অভিনব আচার্যও। সুরজ এবং সরযু দুজনেই এখন কোথায় নাগাল্যাণ্ডে গিয়ে ব্যবসা করছে। তারা নাকি বাঘাকাকাকে বলে গেছে চুরি ছিনতাই এসব তারা আর করবে না। খুন-জখম হত্যা এসব তারা পরিত্যাগ করে এমন একটা ব্যবসায়ে যোগ দিয়েছে যাতে টাকাও অঢেল আর তাতে মানুষ আকচার মরলেও কেউ কিছু বলে না। তারা এক বিরাট ভেজাল-সম্রাটের হয়ে কাজ করছে। বছর দুয়েক কাজ-টাজ শিখে নিয়ে তারা স্বাধীনভাবে ব্যবসা করবে।

প্রকৃতিও এসেছে। এসেছে প্রকৃতির মা আর বাবাও। প্রকৃতি অনেকটা জানে, অনেকটা জানে না। সে কেবল জানে বিশ্বলালবাবুই খুন করেছেন। কিন্তু কীভাবে সেটা তার মাথায় ঢোকেনি। বিশ্বলালবাবু কয়েক মাস আগে ভুবনচরায় গিয়েছিলেন, এবং তিনি ওষুধের শিশিতে বিষের ক্যাপসুল একটা রেখে দিয়েছিলেন, এটুকু বোঝা যায়, কিন্তু মিহিরদা তো বলেছে সে নতুন একটা শিশি

খুলে তা থেকেই একটা ক্যাপসুল বার করে মাধবলাল আচার্যর প্লেটে রেখেছিল। নতুন শিশির ক্যাপসুলে তো বিষ থাকতে পারে না, তাহলে বাড়িরই কেউ ওই ক্যাপসুল বদলে দিয়েছিল। কিন্তু কে সে? প্রকৃতি এই সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। এই সমস্যার সমাধান করেছেন বাঘাকাকা। এতে কিটু লাহিড়ি প্রথম দিকে খুব মুষড়ে পড়েছিল। সে দেখেছে বাঘাকাকা প্রায় সব সময়েই আসল ব্যাপারটা কি সেটা বুঝে ফেলেন। নইলে ও যা যা জানে বাঘাকাকাও তো সেই সবই জানেন। অবশ্য বাঘাকাকা মাদ্রাজে গিয়ে যা জেনেছিলেন কিংবা শিলি-গুড়িতে যা জেনেছিলেন তার সবই জানিয়েছিলেন তাকে। কিন্তু দু-একটা কথা তিনি বলেননি। যেমন বিশ্বলালবাবু মাদ্রাজের যে ওষুধ কম্পানিতে কাজ করতেন তার নাম ডবল হেলথ। আর সেই কম্পানিরই ওষুধ কাডাইলাম। কেবল তাই নয় সেই ওষুধের কারখানার ল্যাবরেটরিতে ওষুধ ভরার কাজ করতেন বিশ্বলালবাবু। এ সবই তিনি বলেছেন, কিন্তু যাকে বলে চোখে আঙুল দিয়ে তিনি দেখিয়ে দেননি। তিনি নিজেও অবশ্য দুটো ব্যাপারের যোগসূত্র বুঝতে পারেননি প্রথমে। তিনি বুঝতে পারলেন সেদিন, যেদিন অভিনববাবুর জন্য ওষুধ কিনতে গিয়েছিলেন পাড়ার দোকানে। সেই দোকানের শো-কেসে, সাজানো কাডাইলাম দেখেছিলেন, এবং দেখেছিলেন সেই ওষুধের কম্পানির নাম ডি এইচ। অর্থাৎ ডবল হেলথ। ওই কারণেই তিনি সেদিন আক্ষেপ করেছিলেন তাঁর স্মৃতিশক্তি কমে গিয়েছে বলে।

বিশ্বলালবাবুর পক্ষে কাডাইলাম-এর শিশিতে মাত্র একটা সায়ানাইড-ভর্তি ক্যাপসুল রাখা খুব কঠিন কর্ম ছিল না। তিনি ওই কারখানার ওই বিভাগেই কাজ করতেন। সায়ানাইড সংগ্রহ করাও তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল না। ল্যাবরে-টরিতে সায়ানাইড পাওয়া যেতে পারে একটু কষ্ট করলেই। তা ছাড়া তামিল আতঙ্কবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও এই বিষ সংগ্রহ করা সম্ভব। যাই হোক, বিশ্বলালবাবু স্থির করেন তাঁর বাবাকে শেষ করতে হবে। প্রচণ্ড রাগ, অভিমান, ঘৃণা এসব তো ছিলই, আর ছিল আরও একটা মতলব। এক ঢিলে দু পাখি মারা। বিশ্বলালবাবুর ছিল খোঁড়া দাদা অভিনববাবুর প্রতি ঈর্ষা। এক ঢিলে বাবাকে মারবেন। বাবা যখন মরবেন তখন তিনি থাকবেন সেই মাদ্রাজে। কেউ তাঁকে সন্দেহ করতে পারবে না। শিশিতে থাকবে মাত্র একটি বিষ ক্যাপসুল, অতএব অন্য ক্যাপসুলগুলি পরীক্ষা করেও বিষ পাওয়া যাবে না। পুলিশ পরীক্ষা করে তা পায়ওনি। ক্যাপসুলটি উপরের দিকে রাখা হলে ক্যাপসুলের শিশির সিল ভেঙে প্রথম ক্যাপসুলটিই ব্যবহার করার কথা, এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। রহস্যটা ওখানেই আটকে ছিল। সকলেই যখন সন্দেহ করছে বাড়ির মধ্যে যাদের যাতায়াত ছিল, ঘনিষ্ঠতা ছিল তাদেরই একজন ওই কর্মটি করেছে তখন আসল অপরাধী মাদ্রাজে বসে আছে আর উত্তেজিত হয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। তার উপর কারু সন্দেহ হওয়ারই কথা নয়। সন্দেহ একটু হলেও ব্যাপারটাই অসম্ভব বলেই সেই সন্দেহটা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আর তাঁর মন অন্যমনস্ক এবং উত্তেজিত হয়ে ছিল বলেই তিনি কারখানার মধ্যে গাড়ির ধাক্কা

খান। এখন তাঁর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। বাঘাকাকা পুলিশকে খবর দেননি, বলেছেন কয়েকদিন পর খবর দেবেন। অসুস্থ বিশ্বলালবাবুকে পুলিশ টানা-হেঁচড়া করতে পারে—সেটা ঠিক নয়। মিহির আশা করে আছে সত্যটা সরকারিভাবে প্রকাশিত হবে না। সে বার বার আফজলকে বলেছে, দাদা, খবরের কাগজে আর ফাঁস করে দিও না—আমার তা হলে বারোটা বেজে যাবে।

বাঘাকাকা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বাড়িভর্তি লোক। সুপ্রিয়াপিসি নানারকম খাদ্য সাজিয়ে রাখছেন। তিনি আজ দুরকম নতুন রান্না করেছেন, তাই একটু বাঘাকাকার দিকে আড়চোখে চাইছেন। মজা পাচ্ছেন। বাঘাকাকার রান্নার বেশি সুখ্যাতি তিনি শুনতে ভারী কষ্ট পান, সেজন্য আজ তিনি উঠে পড়ে লেগেছেন যেন!

বাঘাকাকা ঘড়ি দেখছেন। বলছেন, নাঃ ওঁরা বোধহয় এলেন না। কারা এলেন না? কিট্টু প্রশ্ন করল। সাধু এবং সাধনী। বলে বাঘাকাকা বাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিছু বুঝতে না পেরে কিট্টু বলল, সুপ্রিয়াপিসি, সাধু আর সাধনী কারা সুপ্রিয়াপিসি? সুপ্রিয়াপিসি বললেন, কে জানে রে বাবা তারা কে? তবে তোর বাঘাকাকা বলেছেন ওঁদের উনি নেমন্তন্ন করেছেন। অবশ্য আমার অনুমতি নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু জানি না শুনি না কারা আমার বাড়িতে আসবেন, সেটায় মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। যায় না, তুই বলত কিট্টু? আরও একটা ব্যাপার, তোর বাঘাকাকা এমন একটা ভান করছেন যেন ক্রেডিটটা ওঁরই। বিশ্বলালবাবুই যে খুন করেছে সেটা নাকি আর কারু পক্ষেই বার করা সম্ভব হত না।

কিট্টু বলল, বাঘাকাকা তো অমন লোক নন।
উনি তো ক্রেডিট কিছু নিতেই চান না।

—সে তোদের কাছে ভালমানুষ সেজে থাকেন।

—কিন্তু তোমাকে কি বলেছেন বাঘাকাকা? তিনি বলেছেন তিনি ছাড়া আর কারু পক্ষেই বিশ্বলালবাবুকে খুনি বলে ধরা সম্ভব হত না?

—ঠিক তা বলেননি। তবে আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন ঠিকই।

—কি বলেছেন তোমাকে বাঘাকাকা?

সুপ্রিয়াপিসি বললেন, উনি বলেছেন উনি মাদ্রাজে না গেলে ব্যাপারটা তিনি অনুমানও করতে পারতেন না। উনি বলেছেন অভিনববাবুর জন্য ওষুধ কিনতে না গেলে তিনি অন্ধকারেই পড়ে থাকতেন—ধরতেই পারতেন না কাডাইলাম ওষুধটা ডি এইচ না কি কম্পানির। আর সেখানেই নাকি বিশ্বলাল কাজ করত।

কিট্টু বুঝল বাঘাকাকা এমন কিছু বলেননি যাতে মনে হতে পারে তিনি এই ব্যাপারে বড়াই করেছেন। তিনি ঠিক কথাই বলেছেন—কিন্তু বাঘাকাকার উপর সুপ্রিয়া পিসির রাগ আছে, রাগের কারণ বাঘাকাকা কিট্টুকে গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারে সাহায্য করেন যে কেবল তা নয়, তিনি নিজেই সব সমাধান করেন এবং বলেন, আমি আর কি করেছি। কিট্টুবাবু না থাকলে আমি কিছুই বার করতে

পারতাম না। কিট্টু সেটা বেশ ভাল করেই জানে। সে আরও জানে বাঘাকাকার রান্নার একটা সুনাম আছে সেটাও সুপ্রিয়াপিসির রাগের আর একটা কারণ।

কিন্তু সাধু এবং সাধ্বী ? এঁরা কারা—সেই ভুবনচরার উধাও হওয়া সাধু আর নার্স রাধাময়ী নয়তো ? ঠিক তাই। কিট্টু উত্তেজিত হয়ে উঠল। সাধু এবং সাধ্বীকে এখানে ডাকার মানেটা কি ?

কিট্টু সরাসরি প্রশ্ন করল বাঘাকাকাকেই। বলল, বাঘাকাকা, হালদার ডাক্তারকে, নার্স রাধাময়ীকে ডেকেছ এখানে ?

বাঘাকাকা একটু যেন গর্বের সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ ডেকেছি।

—কিন্তু কেন ?

—আহা! বাঘাকাকা বললেন, সাধু লোক। কলা মুলো খেয়ে খেয়ে জীবনটা গেছে তাই ভাবলাম সুপ্রিয়াপিসির রান্না একটু খাইয়ে দিই।

কিট্টু বুঝল ব্যাপারটা ঠিক অত সহজ নয়। তখন সে বলল, বল না বাঘাকাকা কি ব্যাপার ?

বাঘাকাকা বললেন, আমি তো ভেবেছিলাম এই অনুষ্ঠানে সবাই থাকবেন। ডাক্তার আদিত্য, রানিদি, বিদ্যাচরণ গুঁই, আচার্য পরিবারের সকলে। সাধু এবং সাধ্বী তো থাকবেনই।

—কিন্তু সুপ্রিয়াপিসির বাড়িতে ? কিট্টু বলল, ওঁকে না বলে··· ।

বাঘাকাকা ফিসফিস করে বললেন, আরে ভাই ওঁর কথাতেই তো আমি প্রত্যেককে বলেছি!

—ওঁর কথায় ?

বাঘাকাকা বললেন, সুপ্রিয়াপিসির ইচ্ছে ছিল ব্যাপারটা খুব নাটকীয়ভাবে আমি এই অনুষ্ঠানে প্রকাশ করি। কাউকে আগে বলব না কিচ্ছু না—কেবল সুপ্রিয়াপিসি জানবেন। তারপর গোয়েন্দা কাহিনীর মতো আস্তে আস্তে সমস্ত ঘটনাবলী এখানে একটু একটু করে উন্মোচিত হবে। বিশ্বলালবাবুই যে খুন করেছেন সেটা আমি যেন আর কাউকে না জানাই, এমনকি আচার্য পরিবারকেও নয়।

—আচ্ছা বাঘাকাকা, তুমি তো আমাকেও বলনি বিশ্বলালবাবু খুন করেছেন, কিন্তু তুমি সেটা কেমন করে বুঝলে ? অর্থাৎ কখন তোমার প্রথম মনে হল··· ।

বাঘাকাকা বললেন, খুবই সহজ ব্যাপার, প্রথমেই সেটা আমার বোঝা উচিত ছিল—কিন্তু ওই যে সহজ কথাটাই সহজে মনে আসে না। বিশ্বলালবাবু ডবল হেলথ-এ কাজ করতেন। ওঁরই কম্পানি তৈরি করে কাডাইলাম। বিশ্বলালবাবু ডবল হেলথের প্যাকিং-এই কাজ করতেন। অতএব তাঁর পক্ষে একটা ক্যাপসুলে বিষ ভরে সেটি একটি শিশিতে ভরার মত সহজ কাজ আর নেই। উনি তিন চার মাস আগে ভুবনচরায় এসে একটা ঝকঝকে নতুন শিশি বদলে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে মাদ্রাজে ফিরে গেলেন। মজাটা ওখানেই। তিনি একটা ক্যাপসুল নিয়ে সেটিকেই শিশিতে রেখে আসতে পারতেন, কিন্তু তা

হলে তাঁর উপর সন্দেহ হতে পারত। কিন্তু সদ্যভাঙা ঢাকনা খুলে সেই শিশির ক্যাপসুল খেলে অন্তত তাঁর উপর সন্দেহ হওয়ার কথা নয়। মিহিরবাবু ভাগ্যক্রমে বা দুর্ভাগ্যক্রমে সেই ঝড়ের রাতে নতুন শিশি খুলেছিলেন। আর যে ক্যাপসুলটি মাধবলালবাবুর জন্য প্লেটের উপর রেখেছিলেন সেটিতেই ছিল সেই মারাত্মক সায়নাইড। এটাই বিশ্বলালবাবু চেয়েছিলেন। নতুন শিশি সদ্য খুলে ক্যাপসুল খাওয়ার পর কারুই সন্দেহ হবে না তাঁর উপর। কিন্তু তিনি যে ডবল হেলথ-এ কাজ করেন এবং কার্ডাইলাম ওষুধটাও ওই কম্পানিরই এবং যে কেউ একটু বুদ্ধি থাকলেই দুই আর দুই যোগ করে চার করতে পারবে এ খেয়ালটা তাঁর ছিল না।

—কিন্তু, কিট্টু বলল, বিশ্বলালবাবুই যে শিশিটা এনেছিলেন তার প্রমাণ কোথায়?

বাঘাকাকা বললেন, এই প্রমাণ সরাসরি প্রমাণ নয়। —এটা হল গিয়ে যাকে বলে সারকমস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স। যেমন ধরো জঙ্গলের মধ্যে গুলির আওয়াজ হল। একজনকে দেখা গেল ধূমায়িত বন্দুক হাতে জঙ্গল থেকে বেরুচ্ছে, পরে জঙ্গলে একজনের বুলেটবিদ্ধ মৃতদেহ আবিষ্কার করা হল। কেউ কাউকে গুলি করতে দেখেনি, তবু ধরে নিতে হয় যে বন্দুক হাতে লোকটিই খুনটি করেছে। অবশ্য অন্য প্রমাণও দরকার হয়।

—এ ক্ষেত্রে অন্য প্রমাণ আর কিছু ছিল?

—ছিল না? বাবার প্রতি বিশ্বলালবাবুর ঘৃণা। বিশ্বলালবাবুকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হবে সেটা জেনে প্রতিহিংসাপরায়ণ হওয়া, বিশ্বলালবাবুর হুমকি—এগুলো সবই সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স।

হঠাৎ কিট্টুর মনে পড়ল শেয়ালের কথা। সেই ঝড়ের রাতের শেয়ালের ডাক যা কিনা মিহির শুনেছিল! কিন্তু সে চুপ করে রইল।

একটু ভেবে সে বলল, আর কোনও প্রমাণ ছিল না?

—ছিল। মোক্ষম আর একটা প্রমাণ পেলাম।

—মোক্ষম প্রমাণ?

—হ্যাঁ মোক্ষম প্রমাণ। মনে আছে আমি দেরি হয়ে যাবে দেরি হয়ে যাবে বলে ভুবনচরায় গিয়ে পুলিশের ফেরত দেওয়া ওষুধের শিশিগুলি না পেয়ে বারাসতে গিয়ে সেগুলিকে উদ্ধার করি?

—হ্যাঁ। কিট্টু বলল।

—সব সমেত তিনটি শিশির ব্যাপার। একটা খালি শিশি। সেটার উপর ওষুধের তৈরির তারিখ ছাপ মারা ছিল গত বছরের মে মাসের। আর একটা পুরো ভর্তি না-খোলা শিশি ছিল, সেটার তারিখ ছিল ওই মে মাসেরই। কিন্তু যে শিশিতে ছিল মাত্র চারটি ক্যাপসুল, অর্থাৎ সেই মারাত্মক শিশিটিতে কোনও তারিখই ছিল না। তৈরির তারিখও নয়, যে তারিখ পর্যন্ত ওষুধটি ব্যবহার করা যাবে সে তারিখও নয়। অথচ তিনটি শিশিই একসঙ্গে কেনা হয়েছিল।

—ও বুঝতে পেরেছি। কিট্টু বলল, বিশ্বলালবাবু ওষুধের কারখানা থেকে

খালি শিশির উপর লেবেল লাগিয়ে নিয়েছিলেন। যে লেবেলে তারিখ তখনও দেওয়া হয়নি।

—কেবল তারিখ দেওয়া হয়নি তা নয় কিটুবাবু! বাঘাকাকা বললেন, তাতেই আমার সন্দেহ হয়েছিল—না, সেটা ঠিক নয়, আমার সন্দেহ অবশ্য আগেই হয়েছিল। যখন দেখলাম তারিখটা নেই তখনই বুঝলাম এ কাজ একমাত্র বিশ্বলালবাবুর পক্ষেই সম্ভব। তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপার—ব্যাচ নম্বর। তুমি জানো নিশ্চয় যে প্রতিটি ওষুধের প্যাকিং-এ এবং লেবেলে ব্যাচ নম্বর থাকে। তাতে বোঝা যায় কোন ব্যাচের ওষুধ কোন রাজ্যে বা কোন পাইকারের কাছে সরবরাহ করা হয়েছিল। যে শিশি মিহিরবাবু খুলেছিলেন তার ব্যাচ নম্বর একটা দেওয়া ছিল, কিন্তু সেটা অন্য দুটি থেকে আলাদা। আমি ওই কারণেই শিশিগুলো খুঁজছিলাম অমন ব্যস্ত হয়ে।

—মানে তুমি আগেই জানতে শিশির নম্বর আলাদা হবে?

বাঘাকাকা যেন খুব অন্যায় হয়ে গেছে এমন মুখ করে বললেন, জানতাম বলাটা ঠিক হবে না, তবে মনে হয়েছিল যদি সত্যি সত্যি বিশ্বলালবাবু খুন করে থাকেন তা হলে শিশির নম্বর আলাদা হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

ওরা কথা বলছে এমন সময় সুপ্রিয়াপিসি এসে বললেন, তোরা এদিকে দাঁড়িয়ে কি সব গুজগুজ করছিস? ওই ঘরে যা। সব খাবার এসে গেছে। সদ্ব্যবহার কর? তা তোদের সেই সাধু আর সাধবী তো এলেন না?

এমন সময় দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল।

দরজা খুলে দিতেই প্রবেশ করলেন একজন সুট পরা ভদ্রলোক আর আধুনিক সাজের এক ভদ্রমহিলা।

বাঘাকাকা বললেন, আসুন আসুন ডাক্তার হালদার। আসুন রাধাদেবী! সকলেই অবাক হয়ে তাঁদের দিকে রইল। ইনিই তা হলে সেই ভুবনচরার সাধু? আর সঙ্গে যিনি তিনিই হলেন সেই নার্স রাধাময়ী।

বাঘাকাকা কিটুকে বললেন, ভেবেছিলাম আজ ওঁরা এলে ভাল হয় তাই ডেকে ছিলাম—

আর সুপ্রিয়াপিসি বললেন, ঠিকই করেছিলেন।

কিন্তু প্রকৃতি ফিসফিস করে কিটুকে বলল, অসম্ভব!

—কি অসম্ভব প্রকৃতি?

—ডাক্তার হালদার ইনি নন!

—কেন বলো তো?

প্রকৃতি বলল, হাতুড়ি নেই!

—হাতুড়ি নেই, মানে?

প্রকৃতি বলল, ডাক্তার হালদার যদি সাধু হন তা হলে সাধুর কপালে হাতুড়ির মতো একটা কাটা চিহ্ন থাকত না?

—তাই তো? কিটু ভাবল—ছদ্মবেশে অন্য কেউ এসেছেন নাকি? একটা দুশ্চিন্তার রেখা তার কপালে দেখা দিল। যাই হোক, সে এ নিয়ে কিছু বলল

না—কেননা বলার সুযোগই পেল না। চারদিকে বেশ জমে উঠেছে। চমৎকার সব খাদ্য পরিবেশিত হচ্ছে। সুপ্রিয়াপিসি হাসি মুখে সকলকে আপ্যায়ন করছেন। একবার তিনি বললেন, সাধু বাবা। আপনি আপনার চমৎকার জীবন কাহিনী একটু শোনান। মানে আপনার সঙ্গে রাধার রোমান্স কেমন করে হল ?

ডাক্তার হালদার ভারী রসিক মানুষ, বোঝা গেল। তিনি বললেন, কপালে ছিল তাই হয়ে গেল। মাধবলালবাবুর উপর আমার রাগ ছিল—তিনি একদা আমাকে গ্রাম ছাড়া করেছিলেন, ভেবেছিলাম প্রতিশোধ নেব। সাধু সেজে ভুবন-চরায় গেলাম। মাধবলালবাবুর উপর প্রতিশোধ নেব—তাঁকে জব্দ করব এইরকম একটা প্রতিজ্ঞাও করেছিলাম। সুযোগও জুটে গেল। অসুস্থ মানুষ তিনি। ডাক্তার আদিত্যের ওষুধে কাজ হচ্ছে না। তিনি দৈব ওষুধের শরণাপন্ন হলেন। ওই সময় আমি দু-একটা ওষুধ দিয়ে তাঁকে কিছুটা ভালর দিকে আনি। কিন্তু ওঁর সবচেয়ে বড় রোগ যেটা সেটা সারাব কেমন করে ? ওঁর সবচেয়ে বড় রোগ হল তাঁর বয়স! তাই আমার ওষুধও কাজে লাগল না। আমি ভাবলাম, ওঁকে সারানোর দরকারই বা কি ? দু-একটা বাজে ওষুধ দিয়ে মেরে ফেলি না কেন ? মারব তা ভেবেওছিলাম, কিন্তু মেরে ফেললে আমার ও বাড়িতে যাওয়া বন্ধ হয়ে যেত আর···। বলে ডাক্তার হালদার চুপ করলেন।

—বুঝেছি। সুপ্রিয়াপিসি বললেন, তা হলে রাধার সঙ্গে রোমান্সটা জমত না, তাই না ?

ডাক্তার হালদার লজ্জিতভাবে চুপ করে রইলেন। রাধাও মুখ নিচু করে রইলেন হঠাৎ প্রকৃতি বলে উঠল, না। না—উনি ডাক্তার হালদার নন। জালিয়াত, ঠগ, প্রতারক।

—এ আবার কি রকম কথাবার্তা ? সকলেই অবাক।

বাঘাকাকা বললেন, প্রকৃতিবাবু আপনি ভুল করছেন। আপনি ভাবছেন উনি সাধু হবেন তো কপালের কাটা দাগ কোথায় গেল, তাই তো ? আমি উত্তরটা বলে দিচ্ছি—কাটা দাগ মিলিয়ে গেছে। আধুনিক সার্জারির একটা বিভাগ হল প্লাস্টিক সার্জারি। ডাক্তার হালদার সম্প্রতি সেই অপারেশনটা করিয়েছেন, সেই কারণেই তাঁর হাতুড়িমার্কা কপাল সমান হয়ে গেছে!

ক্রমে ক্রমে বাড়িতে আরও অনেকে এলেন। মিহির গোমড়া মুখ করে কি একটা মিউজিক টেপে লাগিয়ে দিল। গমগম করতে লাগল জায়গাটা। আফজল বলল, তোমার এ কি ব্যবহার মিহির, একটু হাসছও না!

—হাসবার কি আছে আফজল। মিহির বলল, তোমরা মজা করছ—কিন্তু আমার মনে মজা কই, কেনই বা হবে মজা। আমার বারোটা বাজল—এ তো আনন্দ উৎসব নয়, আমার শ্রাদ্ধ। ছি ছি আফজল—সত্য চাপা থাকলে কার কি অসুবিধে হত ? এখন বিশ্বলালবাবুকে ধরে ফাঁসিতে লটকাবে পুলিশ। সে ভারী বিশ্রী ব্যাপার হবে। একজন না হয় খতম হয়েছিল, বুড়ো মানুষ—যাওয়াই উচিত। কিন্তু বিশ্বলালবাবু, তাকে মিছিমিছি···। আফজল বলতে যাচ্ছিল, খুন ব্যাপারটা অত সহজ নয়—কিন্তু হঠাৎ কলিং বেলটা বেশ জোর

বেজে উঠল, পর পর তিনবার। এবার কে এলেন ? দরজা খুলে দেখা গেল, রামমোহন ধর। কিট্টু বলল, ওঁকেও কি আসতে বলা হয়েছিল নাকি ?

বাঘাকাকা বললেন, না তো। তবে সুপ্রিয়াপিসি যদি··· ।

কিট্টু বলল, না না তা কেমন করে হবে—উনি বোধহয় অন্য কোনও কিছুর ব্যাপারে এসেছেন।

রামমোহনবাবু হাঁফাচ্ছিলেন। বললেন, একটু জল··· ।

পুরো এক গেলাস জল খেয়ে তিনি চুপ করেই রইলেন।

সুপ্রিয়াপিসি এর পর তাঁকে মাংসের দুটো সিঙাড়া আর একটা বড় সন্দেশ দিলেন।

রামমোহনবাবু খুব লোভীর মতো সেদিকে তাকিয়ে হাত বাড়ালেন, তারপর হাত গুটিয়ে নিলেন। বললেন, থাক। আদিত্য ডাক্তার শুনলে আমাকে মেরে ফেলবেন।

—কি শুনলে মেরে ফেলবেন ?

রামমোহনবাবু বললেন, আমার শরীরটা বিশেষ ভাল নয়। এমন অফিসে কাজ করি—সমস্ত সময়টা খাটিয়ে মারে। দেখুন আমার চেহারা হয়েছে বাদুড়ের মতো বিশ্রী। ডাক্তার আদিত্য আমাকে খাবার ব্যাপারে লোভ করতে বারণ করে দিয়েছেন। ঝাল বেশি খেতে মানা করেছেন, মিষ্টি বেশি খেতে মানা করেছেন, তেতো বেশি খেতে মানা করেছেন, অসময়ে খেতে মানা করেছেন—মানে এখন আমার খাওয়ার উপায়, নেই। তবে কিনা··· ।

—তবে কিনা মানে ?

—যদি ডাক্তার আদিত্যকে এই কথা না বলেন তা হলে অবশ্য।

সুপ্রিয়াপিসি হেসে ফেললেন, বললেন, না না, সে কে বলতে যাবে বলুন ?

রামমোহনবাবু সিঙাড়ায় কামড় দিলেন। দুটি সিঙাড়ার পর দুটি সন্দেশও উধাও হয়ে গেল। সুপ্রিয়াপিসি আরও দুটি সন্দেশ এনে দিলেন। রামমোহনবাবু বললেন, নাঃ থাক, পেট বেশ ভরে গেছে।

তারপর বললেন, না একটু বোধ হয় জায়গা আছে। বলে একটি সন্দেশে কামড় বসালেন।

এর পর রামমোহনবাবু উঠলেন। বললেন, যাই আজ অনেক রাত হয়ে গেল। ভারী ভাল লাগল এই সিঙাড়া আর সন্দেশ।

চলে যেতে যেতে বললেন, ও হো একটা কথা ভুলেই যাচ্ছিলাম। একটু আগেই ভুবনচরা থেকে ফিরেছি। ডাক্তার আদিত্য কিট্টুবাবুর জন্য একটা খবর পাঠিয়েছেন। ভারী জরুরি একটা খবর বলতে ভুলেই যাচ্ছিলাম, উঃ ভুলে গেলে ভারী মুশকিল হত।

কিট্টু বলল, জরুরি খবর ? কি জরুরি খবর ?

রামমোহনবাবু বললেন, দাঁড়ান মনে করে দেখি। এ হে একদম মনে পড়ছে না। কি মুশকিলের কথা বলুন তো ! তবে জরুরি খবর এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি তিন চার বার করে আমাকে বলে দিলেন।

একটু থেমে বললেন, জল…।

এক গেলাস জল খেয়ে তিনি বললেন, এখন যাই, কথাটা মনে পড়লেই এসে বলে যাব। আজ যাই। রাত হয়ে গেলে কাল সকালে উঠতে দেরি হয়ে গেলেই কেলেঙ্কারি! ওঃ যা অফিসটা হয়েছে আমার, দশ মিনিট দেরি করে গেলেই ঢেরা! দরজার দিকে ধীরে ধীরে যেতে যেতে হঠাৎ বললেন, ও হো, মনে পড়েছে —মনে পড়েছে—ডঃ আদিত্য বলেছেন ভুবনচরার কালো প্যাঁচা পাওয়া গেছে। সেটা মিহিরবাবুকে তিনি দান করতে চান।

সকলে স্তম্ভিত! ভুবনচরার কালোপ্যাঁচা পাওয়া গেছে? সেটা আবার তিনি মিহিরবাবুকে দান করতে চান?

রামমোহনবাবু চলে যাওয়ার পর এই নিয়ে নানা আলোচনা শুরু হল।

—ভারী অদ্ভুত। সুপ্রিয়াপিসি বললেন, ওই কালোপ্যাঁচার দাম কোটি কোটি টাকা, সেটা মিহিরকে দান করতে চান ডাক্তার আদিত্য? কেন? দুনিয়ায় কি আর লোক ছিল না? না মিহির তোকে ওই সব অভিশপ্ত জিনিস নিতে হবে না। ও সব জিনিস ভারী অপয়া হয় আমি বইতে পড়েছি।

ডাক্তার হালদার বললেন, ভারী অমূল্য জিনিস। ওটা অপয়া হবে কেন? তবে ডাক্তার আদিত্য সেটা দান করতে যাবেন কেন? দান করার তাঁর অধিকারই নেই। ওটি আচার্য পরিবারেরও সম্পত্তি নয়। ওটির মালিক এখন যদি কেউ হন তো ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ।

আফজল বলল, রামমোহনবাবু কি বলতে কি বলেছেন কে জানে? হয়তো সব ভুলে মেরে বসে আছেন।

একটু পর আবার দরজার বেল বাজল। দেখা গেল রামমোহনবাবু। তিনি হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, একটু জল…।

এক গেলাস জল পুরো খেয়ে বললেন, আরও একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল।

আফজল অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সকলের দিকে তাকাল। ভাবটা এই, কেমন, বলেছিলাম কিনা!

রামমোহনবাবু বললেন, আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল, আরও একটা কথা বলতে বলে দিয়েছেন ডাক্তার আদিত্য, সেটি হল বিশ্বলালবাবু মারা গেছেন, কাল খবর এসেছে। আর হ্যাঁ কাল সকালেই একবার ভুবনচরায় যেতে বলেছেন, কিটুবাবু আর মিহিরবাবুকে। বলে ঘড়ির দিকে তাকিয়েই বললেন, সর্বনাশ ভারী দেরি হয়ে যাচ্ছে—কাল সকালে আবার…।

বলেই অন্তর্ধান।

সুপ্রিয়াপিসি বললেন, যাক বাবা খুব ভাল হল। ফাঁসি-টাঁসির চেয়ে এটা অনেক ভাল। দেখা গেল সকলেরই সেই মত। মিহিরও ভারী খুশি হয়ে উঠল মামলা ফামলা হবে না এই ভেবে।

বাঘাকাকা বললেন, এটাই হল ভগবানের বিচার। এই বিচার থেকে কেউ পরিত্রাণ পায় না। বিশ্বলালবাবু যে মারা গেলেন সেটা কোনও আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়। লোকে হয়তো তাই বলবে। কিন্তু যে ছেলে বাবার মৃত্যুর জন্য

সায়ানাইডের ক্যাপসুল রেখে দেয় এবং বাবার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, তার মনই তখন এমন যে যে কোনও রকম দুর্ঘটনা তার ভাগ্যে ঘটবেই। গাড়ির ধাক্কা না হলে উনি অন্য কোনও দুর্ঘটনায় পড়তেন ঠিকই। ওঁর মনটাই হয়ে উঠেছিল ক্লান্ত এবং উদ্‌ভ্রান্ত। বিশ্বলালবাবু খুনি ছিলেন না। হঠাৎ কয়েক দিনের জন্য তাঁর, কি বলব মস্তিষ্ক ঠিকমতো কাজ করেনি, ঠিক পুরো-পুরি বিকার নয়—কোথায় একটা বেসামাল ভাব। যাক্ উনি গেছেন, অনেক দুঃখের হাত থেকে বেঁচে গেছেন।

সুপ্রিয়াপিসি মিহিরকে বললেন, তুই অত হাসছিস কেন রে? ভুবনচরার কালো প্যাঁচার লোভে তোর চোখ চক্ চক্ করছে বুঝতে পারছি। ওটি ছুঁবি না। কেউ দিলেও ছুঁবি না। ও সব অপয়া জিনিস কক্ষনো নিবি না। সরকার থেকে দিলেও নিবি না। আমরা হলাম গিয়ে ছা-পোষা মধ্যবিত্ত মানুষ, আমাদের অত লোভ করা উচিত নয়।

মিহির বলল, বা রে! আমাকে যদি কেউ ভালবেসে একটা প্যাঁচা দেন তা আমি নেব না? ওই টাকায় আমি কত কবিতার বই ছাপাতে পারব, একদিনও চাকরি করতে হবে না।

নানা কথায় রাত দশটা বেজে গেল। ঠিক হল পরদিন সকালেই কিটু মিহির আর আফজল ভুবনচরায় যাবে।

ডাক্তার আদিত্য ওদের অভ্যর্থনা করলেন। সেদিন সকালের রোগীরা সব চলে গিয়েছিল। ওঁর টেবিলের উপর একটা বড় কাগজ তার উপর একটা ব্লুপ্রিন্ট। হাসপাতাল বাড়ির নকসা!

ডাক্তার আদিত্য বললেন, এসো ভাই এসো। তা এত তাড়াতাড়ি না এলেও চলত। আমি রামমোহনকে বলে দিয়েছিলাম যে কোনও একদিন তোমরা এলে খুশি হতাম। তা ওর যেমন ভুলো মন কি বলেছে তোমাদের এই সকালেই আসতে? দেখ তো দেখি কি কাণ্ড! রানি দেখ কারা এসেছে। দুপুরে খাবে তো সব?

অনেক কথা হল। বিশ্বলালবাবুর ট্র্যাজিডির কথা। সেই খুনের রাতের কথা। তোমরা জানো কি না জানি না, আমি অভিনববাবুর কাছ থেকে জানতে পেরেছি সেই যে সেই খুনের রাতে শেয়াল ডেকেছিল সেটা ছিল ডাক্তার হাল-দারের সঙ্কেত। রাধাময়ীকে ওই ভাবেই ডেকেছিলেন তিনি।

দুপুরে খাওয়ার পরও ডাক্তার আদিত্য কালো প্যাঁচার কথা বললেন না। কিটু মিহিরকে আস্তে আস্তে বলল, রামমোহমবাবু কি না কি শুনেছেন, কালো-প্যাঁচা থাকলে ডাক্তার আদিত্য সে কথা নিশ্চয়ই বলতেন।

এ কথায় মিহির বেশ গম্ভীরই হয়ে গেল। তার কপালটাই খারাপ। সে ভাবল।

খাওয়ার ওর যেন হঠাৎই ডাক্তার আদিত্যের মনে পড়ল এমনভাবে বললেন, ও একটা কথা। ভুবনচরার কালো প্যাঁচা পাওয়া গেছে। ওই যে প্যাকেটটা

মাধবলালবাবু আমাকে দিয়েছিলেন, মনে আছে? কাল সেটা অভিনবব
বিদ্যাচরণবাবু এবং আরও কয়েকজনের সামনে খুলেছিলাম। ওর মধ্যেই
ভুবনচরার কালো প্যাঁচাটা।

ওরা সকলে উন্মুখ হয়ে উঠল।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, রানি, ওই শোওয়ার ঘরের তাক থেকে ভুবনচ
কালো প্যাঁচাটা নিয়ে এসো তো।

রানিদি একটা প্যাকেট এনে দিলেন।

একটা মোটা প্যাকেট। মনে হল তার মধ্যে বেশ কিছু কাগজ রয়েছে। ত
খুলে দেখল ঠিক তাই। প্রায় দুশো মোটা মোটা কাগজের পৃষ্ঠা ভর্তি
কবিতা। তার উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা ভুবনচরার কালো প্যাঁচা—মাধবল
আচার্য। আর একটা চিঠি। সেটি তারা পড়ল—ডাক্তার আদিত্য, আমার
অমূল্য সম্পদ আমি দেশবাসীকে দিতে চাই, সেটির ব্যবস্থা আপনি করিবে
আমি অসুস্থ মানুষ, তা ছাড়া আমার কাব্য আমি নিজে প্রচার করিব এ
বাসনা আমার নাই। এগুলি কেমন হইয়াছে তাহা বুঝিবারও ক্ষমতা আম
নাই।

যদি কোনও কবি, বিশেষ করিয়া তরুণ কোন কবির এই রচনা ভাল লা
তাহা হইলে এটি তাহাকে দান করিবেন। তিনি যদি এটি ছাপাইতে চান ত
হইলে আমার এস্টেট হইতে ছাপার খরচ নিতে পারেন। আমার এই মনের ই
করিয়াই উইলে উল্লেখ করিলাম না। যাহা ভাল বুঝিবেন করিবেন। ই
মাধবলাল আচার্য। সাক্ষী অক্ষয় বসু।

ডাক্তার আদিত্য বললেন, এই অমূল্য সম্পদ আমি কাছে রাখতে চাই ন
আমি এর উপযুক্ত সমঝদারের হাতেই দিতে চাই। তাই আমি ভুবনচরার কা
প্যাঁচা মিহিররঞ্জন মৈত্রকে সমর্পণ করলাম।

এই বলে ডাক্তার আদিত্য সেই প্যাকেটটি মিহিরের হাতে দিলেন। মি
অতি উদাসীনভাবে হাত বাড়াল, আর মনে মনে বলল, আমার ভাগ্য
খারাপ।

ঠিক সেই সময় একটা রিকশায় ছুঁচো ছাপা পড়ার আওয়াজ হতেই রানি
বললেন, এখন আবার কে এল? রানিদি দরজা খুলে হাসতে হাসতে বলে
দেখে যাও সব, দেখে যাও!

সকলে গিয়ে দেখে একটা রিকশা দূরে চলে যাচ্ছে, আর রাস্তায় একটা ছুঁ
ছটফট করছে!

—শেষ—